রাত্রির তপস্যা
সম্পূর্ণ গ্রন্থ

Ratrir Tapasya
A novel by
Gajendrakumar Mitra
Price Rs. 40/-

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৫৫

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ—কুইক প্রিণ্টিং সার্ভিস

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

চল্লিশ টাকা

উৎসর্গ

সুমথকে

ভূপেন্দ্র সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসের ছাত্র। সে রাশি রাশি কবিতা লেখে, কলেজ-ম্যাগাজিনে গরম-গরম প্রবন্ধ দেয়, ছাত্র ফেডারেশন লইয়া মাতামাতি করে, রাত জাগিয়া বিজয়লালের কবিতা মুখস্থ করে, খবরের কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়িয়া লাফাইতে থাকে এবং জওহরলালজীকে দেখিবার জন্য তিন ঘণ্টা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জ্বর ভোগ করে। অর্থাৎ এক কথায়, সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রের পক্ষে যাহা করা স্বাভাবিক তাহাই করে। এবং কেহ যদি তাহাকে সেই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দেয় ত চটিয়া আগুন হইয়া উঠে।

বন্ধু-বান্ধবদের উপর ভূপেনের অবজ্ঞার সীমা নাই। পৃথিবীতে এত আহাম্মক লোক আছে—আশ্চর্য! এই নির্বোধ লোকগুলির সঙ্গেই তাহাকে দিন রাতের বেশির ভাগ সময় কাটাইতে হয়, সেজন্য তাহার পরিতাপের সীমা থাকে না, অথচ সে যে এই নির্বোধ লোকগুলির কাছেই নিজের অদ্ভুত বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া অপরিসীম আত্মতৃপ্তি লাভ করে, ইহাও সত্য কথা। বাবাকে সে একটু করুণার চোখে দেখে। তিনি দরিদ্র এবং সেই হেতু অত্যন্ত নির্বোধ সন্দেহ নাই; তবে নাকি তাঁহার সামান্য উপার্জন দিয়াই তিনি প্রাণপণে তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন, এই প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট মনে করিয়া ভূপেন তাঁহাকে মার্জনা করে। নিজে একটা ট্যুইশনি করিয়া নিজের সাবান, সেন্ট, স্লিপার প্রভৃতির খরচা সংগ্রহ করে, আর তাহার একান্ত মূল্যবান সময়ের অনেকখানি এইভাবে নষ্ট হয় মনে করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

প্রায় সমস্ত কলেজের ছাত্রদের মতই ভূপেনের বিশ্বাস যে, তাহার চিন্তা ও জীবন-যাত্রায় সে অসাধারণ। এবং প্রায় সমস্ত আধুনিক বাঙালী ছাত্রদের মতই সে শেলী ও বার্ণার্ডশ-র অদ্ভুত একটা সংমিশ্রণের ফল। প্রেমকে সে বলে লিভারের অসুখ, রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বলে সেণ্টিমেণ্টাল রাবিশ, অথচ শরৎচন্দ্রের চমক-প্রদ প্রেমের কাহিনী পড়িয়া রাত্রে তাহার ঘুম হয় না এবং কলেজ ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতাংশ উদ্ধার করে। রোমাণ্টিক চিন্তায় ও কল্পনায় প্রায় দিন-রাতই ডুবিয়া থাকে, যদিচ মুখে আওড়ায় বার্ণার্ডশ!

খালি একটা ব্যাপারে তাহার কিছু অসাধারণত্ব সত্যই ছিল। তাহার স্কুল ও কলেজের অন্যান্য বন্ধুরা ইতিমধ্যেই মেয়েদের প্রেমে পড়িয়াছে, পড়িতেছে কিম্বা সম্প্রতি ক্লান্ত হইয়া ও-বস্তুটিকে ছাড়িয়া দিয়াছে—এই কথাটা সে নিত্য শোনে, কিন্তু তাহার নিজের এখনও সে সুযোগ ঘটে নাই। স্কুলে পড়িতে পড়িতেই যাহারা প্রণয়ের হাতে-খড়ি শুরু করিয়াছে, অপদার্থ-জ্ঞানে তাহাদের সে যেমন একটু ঘৃণা করে, তেমনি যে-সব ছেলে সম্প্রতি প্রেমে পড়িবার অত্যাশ্চর্য বিবরণ প্রত্যহই শোনাইতে থাকে, তাহাদের একটু হিংসা না করিয়াও পারে না। কারণ, যদিও মুখে সে বলে যে-কোন মেয়ের সঙ্গেই আধ ঘণ্টার বেশী আলাপ করা যায় না, সুতরাং প্রেমে পড়াটা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত ব্যাপার, আসলে কিন্তু তরুণী

মেয়েদের সহিত মিশিবার সুযোগ তাহার হয় নাই বলিয়া সে একটু দুঃখিতই।

দারিদ্র্যের জন্য আত্মীয়-স্বজনদের সহিত বহু দিন হইতেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, আর ঠিক সেই কারণেই বন্ধু-বান্ধবদের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পায় নাই। সুতরাং তরুণীদের সহিত তাহার যা-কিছু পরিচয়, তাহা শুধু বন্ধু-বান্ধবদের মুখে ও আধুনিক উপন্যাসে।

টাকার প্রয়োজন যেমন তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক, তেমনি টাকা উপার্জনের জন্য যাহারা ভূতের মত খাটে, ভূপেন্দ্র তাহাদেরই ঘৃণা করে সকলের চেয়ে বেশী। প্রায়ই সে বন্ধু-বান্ধবদের বলে, 'silly goat'-এর মত দিনরাত টাকার পেছনে ঘুরে বেড়ানোই কি মনুষ্য-জীবনের একান্ত সার্থকতা ? তার কি আর কোন কাজ নেই ? —অথচ ছেলে পড়ানোর টাকাটা একদিন পাইতে দেরি হইলেই যে কি 'সংকটজনক পরিস্থিতি'র মধ্যে তাহাকে পড়িতে হয়, তাহা ভূপেনের মত আর কে অনুভব করে ?

আমাদের বর্তমান গ্রন্থের নায়কের চরিত্রটা মোটামুটি ইহাই। এ-হেন ভূপেনের জীবনে সেদিন যে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া গেল, সেই কথাটা বলিয়াই আমরা আখ্যায়িকা শুরু করিব।

তিন দিন পর-পর ছুটি গিয়াছে, আজ চতুর্থ ও শেষ দিন। ঘণ্টা-তিনেক দিবানিদ্রা দিয়া উঠিয়া মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া ভূপেন সহসা অনুভব করিল যে তাহার বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেহ নাই। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে, আমরাও মধ্যে মধ্যে অনুভব করি, ইংরাজীতে যাহাকে বলে sudden realisation যে, আমাদের পরিচিত বহু লোক থাকিলেও বন্ধুর সংখ্যা খুব কম। এবং সেই বিশেষ বন্ধু, নাটকীয় ভাষায় যাহাকে 'আত্মার আত্মীয়' বলে, তাহার প্রয়োজন মানুষের এক-একটা মুহূর্তে বড় বেশি হইয়া পড়ে।

ভূপেনেরও সেদিন সেই অবস্থা। তাহার অনুরক্ত সহপাঠীর সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু মনে মনে তাহাদের চিরদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই কেহ কোনদিন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ আজ সে বোধ করি প্রথম বুঝিতে পারিল যে, অন্তরঙ্গ কাহাকেও তাহার দরকার—বিশেষ প্রয়োজন। সুরেশ বেশ হাসাইতে পারে, কিন্তু বড় বেশী রকমের ভাসা-ভাসা ; নিখিলের সঙ্গ আধ ঘণ্টার বেশী সহ্য করা যায় না, বঙ্কিম পড়াশুনা ঢের করিয়াছে, গল্প বলিতেও জানে, কিন্তু বিপদ হইতেছে এই যে, সে উত্তম-পুরুষ সংক্রান্ত গল্প ছাড়া একটি কথাও বলে না এবং যত কিছু কথা বলা সে একচেটে করিতে চায়। একমাত্র বিশু, বিশুর সহিত এই সময়টা কাটানো চলিত, কারণ, ভূপেনের কাছে বিশুর সবচেয়ে বড় গুণ, সে কথা বলে কম—কিন্তু, দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত ভূপেনের কথাটা মনে পড়িল, বিশু দেশে গিয়াছে। অর্থাৎ ঠিক এই মুহূর্তে যাহার কাছে যাওয়া যায়, একটিও বন্ধু-বান্ধব তাহার নাই।

কিন্তু 'এমন দিনে' ঘরে থাকাও অসহ্য, সুতরাং জামাটা গায়ে চড়াইয়া পথে বাহির হইয়া পড়া ছাড়া উপায় নাই। ভূপেনও বাহির হইয়া পড়িল। সিমলার

সংকীর্ণ গলি পার হইয়াই কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,কিন্তু সেদিন সে-পথও যেন জনহীন বলিয়া বোধ হইল। ভালো লাগিল না। তখন সে স্থির করিল, একা হাঁটিতে হাঁটিতে ইডেন গার্ডেনেই যাইবে।

চলিতে চলিতে তাহার ভালোই লাগিল। আকাশটা মেঘলা করিয়া আছে বলিয়া গরম যেন একটু বেশী, তবু সবটা জড়াইয়া মোটের উপর ঘরের চেয়ে অনেক ভালো। বৌবাজার পার হইয়া তাহার উৎসাহ যেন আরও বাড়িয়া গেল। সে বেশ জোরে জোরে চলিতে লাগিল এবং শীঘ্রই এক সময়ে ধর্মতলার মোড়ে আসিয়া পেঁৗছিল।

কিন্তু এতক্ষণ, বোধ করি উৎসাহের আতিশয্যেই, আকাশের দিকে সে একবারও চাহিয়া দেখে নাই, এখন হঠাৎ গড়ের মাঠের রাস্তায় পড়িতেই বড় বড় জলের ফোঁটা নামিতে শুরু করিল। তখন সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, সে এমন একটা জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে, যেখান হইতে যে-কোন আশ্রয়ে পেঁৗছিতে গেলেও অন্ততঃ দশ-পনের মিনিট পথ হাঁটিতে হইবে। এধারে জলও বেশ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন মাঠের পথ ধরিলেও চৌরঙ্গী পেঁৗছিবার পূর্বেই ভিজিয়া যাইবে। সুতরাং আর কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া একটা বড় গাছের তলাতেই আশ্রয় লইল এবং নিজেকে 'নির্বোধ' 'ইডিয়ট' বলিয়া গালি দিতে লাগিল। কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া যে সে আরও কত আহম্মকি করিল তাহা বোঝা গেল আর একটু পরেই। বৃষ্টির বেগ ত কমিলই না, ক্রমশঃ তাহা মুষলধারে পরিণত হইল। গাছের পত্রাচ্ছাদনে সে জল বাধা মানিল না, দেখিতে দেখিতে জামাকাপড় ভিজিয়া ঝড়ো-কাকের মত অবস্থা দাঁড়াইল তাহার। অথচ তখন সেটুকু আশ্রয়ও ছাড়া চলে না—জলের এমনই বেগ।

আরও মিনিট-কয়েক এইভাবে কাটিবার পর যখন ব্যাপারটা প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন পিছন হইতে সহসা একখানা প্রকান্ড গাড়ি হুস্ করিয়া আসিয়া ঠিক তাহারই সামনে সশব্দে ব্রেক কষিল। ভূপেন বিস্মিত হইল। মোটরধারী কোন লোকের সহিত তাহার পরিচয় নাই, থাকিবার কথাও নয়। সে অবাক হইয়া গাড়িটার দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় একটা গবাক্ষের কাচ একটু নামিয়া গেল এবং বছর দশ-বারোর একটি ফুটফুটে মেয়ে মুখ বাড়াইয়া কহিল—ও মশাই, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন? আসুন আসুন, গাড়ির মধ্যে এসে উঠুন।

ভূপেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল। মেয়েটি আবার কহিল—চলে আসুন না চট্ ক'রে। আমি সুদ্ধ ভিজে গেলুম যে। কি জ্বালা!

ভূপেনের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই, তবু সে কহিল—কিন্তু আমি যে ভীষণ ভিজে গেছি খুকী, গাড়িতে উঠলে গাড়িময় জল হয়ে যাবে যে।

মেয়েটি জবাব দিল, তা হোক্, আমাদের চামড়ার গদি, কিচ্ছু হবে না। চলে আসুন।

সে দুয়ারটা ফাঁকা করিয়া ধরিল। অগত্যা ভূপেন গাছতলা ছাড়িয়া কোন মতে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মেয়েটিও দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া জানালার

কাচ তুলিয়া দিল।

গাড়ি ততক্ষণে চলিতে শুরু করিয়াছে। ভূপেন পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ ও মাথা মুছিতে মুছিতে একবার গাড়ির মধ্যে চোখ বুলাইয়া লইল। সেই মেয়েটি ছাড়া গাড়িতে আর কোন আরোহী নাই, থাকিবার মধ্যে আছে এক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী শোফেয়র। মস্ত বড় গাড়ি এবং শোফেয়রের উর্দি মালিকের ধনাঢ্যতার পরিচয় দেয়—যদিচ মেয়েটির বেশভূষা নিতান্তই সাধারণ, সাদা আদ্দির ফ্রক ও হাতে একগাছি করিয়া চুড়ি। না আছে অলংকারের প্রাচুর্য আর না আছে রেশমের বাহার।

জামা হইতে জল গড়াইয়া চামড়ার গদীর খাঁজে ততক্ষণে পুকুর সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, ভূপেন সেদিকে একবার কুণ্ঠিত ভাবে চাহিল, কিন্তু কি করা কর্তব্য বুঝিতে পারিল না। মেয়েটি তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া জলের দিকে চাহিয়া কহিল, জামাটা খুলে বসুন না, না হ'লে আপনার অসুখ করতে পারে। যা জল, বাব্বা!

জামাটা খুলিতে বোধ হয় ভূপেনের লজ্জা করিতেছিল, কিন্তু আর কোন উপায় নাই দেখিয়া জামা খুলিয়া সামনের চকচকে লোহার আলনায় ঝুলাইয়া রাখিল। তাহার পর অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া বসিতে তাহার হুঁশ হইল যে, গাড়ি কোথায় যাইতেছে তাহা জানা দরকার এবং সে নিজেও কোথায় যাইতে চায় তাহাও জানানো দরকার। একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, তোমরা এখন কোন্ দিকে যাবে খুকী?

খুকী তাহার ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাহাকেই দেখিতেছিল, কহিল—আমার নাম সন্ধ্যা। তবে আমার দাদু খুকী বলেও ডাকেন। আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি।

ভূপেন প্রশ্ন করিল—কোথায় বাড়ি তোমাদের?

—এই যে, চোরবাগানে। ঐখানে আমরা নামব। আপনি ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে, ওখান থেকে চা খেয়ে তারপর বাড়ি যাবেন, কেমন?

এইটুকু মেয়ের এতখানি সৌজন্যে ভূপেন বিস্মিত হইল। কিন্তু কহিল—না, আর জামা-কাপড় ছাড়বার দরকার হবে না, আমার বাড়ি ঐ কাছেই। আমি সিমলেয় থাকি। চোরবাগান থেকে আর কতটুকু। চট্ ক'রে চলে যাব এখন।

সন্ধ্যা তাহার নিবিড় অথচ খাটো চুলের গুচ্ছ দুলাইয়া কহিল—পাগল নাকি! এত ভিজে কাপড় পরে থাকলে আপনার অসুখ করবে যে। সে আপনি কিছু ভাববেন না, আমার দাদুর একটা ফর্সা কাপড় আর একটা গেঞ্জি দিয়ে দেবো'খন, তাই পরে বাড়ি চলে যাবেন, তারপর সময়মত একদিন ফিরিয়ে দিলেই চলবে।

ভূপেনের কৌতুক বোধ হইল। সে কহিল, দাদুর কাপড় দিয়ে দেবে, দাদু যদি রাগ করেন?

—ইস্!

সন্ধ্যা করুণার দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। কহিল—দাদুর বাড়ির গিন্নীই ত আমি। দাদুর কখানা কাপড়-জামা, দাদু কি কিছু খবর রাখে না কি? যা করি সবই ত আমি।

সগর্বে সে আর একবার মাথাটা দুলাইল।

গাড়ি ততক্ষণে চোরবাগানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত-কয়েক পরেই বিরাট একটা বাড়ির ফটকের মধ্য দিয়া গাড়ি-বারান্দার ভিতর প্রবেশ করিল।

সাবেককালের বাড়ি। এখন কিছু হয়ত মলিন, কিন্তু অন্যান্য সাবেকী বাড়ির মত হতশ্রী নয়। বাড়িওয়ালার ঐশ্বর্য যে শুধু এখন বাড়ির ইট কখানাতেই পর্যবসিত হয় নাই, একবার চাহিলেই তাহা বোঝা যায়।

গাড়ি থামিতেই এক দারোয়ান আসিয়া দরজা খুলিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যা অটল গাম্ভীর্যের সহিত ঈষৎ মাথা হেলাইয়া সেলামটা গ্রহণ করিল, তাহার পর গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া কহিল—আসুন আসুন, চট্ ক'রে নেমে আসুন।

কিন্তু বাড়ি ও দারোয়ানের পোশাক দেখিবার পর ভূপেনের সেখানে প্রবেশ করিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, বিশেষতঃ সেই অবস্থায়। সে নামিল বটে, কিন্তু জামাটা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিত ভাবে কহিল—থাক, এটুকু আমি হেঁটেই চলে যাই। জল ত কমে এসেছে।

সন্ধ্যা কিন্তু তাহার কথায় কান দিল না। কহিল—কিছু জল কমে নি। আপনি আসুন ভিতরে, তারপর দেখা যাবে।

অগত্যা ভূপেনকে ভিতরে আসিতে হইল। লজ্জায় তাহার দুই কান আগুন হইয়া উঠিয়াছিল, কোন মতে ঘাড় গুঁজিয়া সে সন্ধ্যার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, চারিদিকে ভৃত্যের দল কৌতূহলী, হয়ত বা পরিহাসের দৃষ্টি মেলিয়াই চাহিয়া আছে।

একটা দালান পার হইয়া ভিতরের একটা ঘরে লইয়া গিয়া সন্ধ্যা হুকুমের স্বরে কহিল—এইখানে দাঁড়ান লক্ষ্মী ছেলের মত—আমি কাপড়-জামা নিয়ে আসছি।

সে চলিয়া গেল।

ভূপেন অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইল। মাঝারি সাইজের ঘর, একপাশে দেওয়ালের দিকে গুটি-দুই আলমারিতে কতকগুলি আইনের বই এবং বাঁধানো মাসিকপত্র পাশাপাশি সাজানো রহিয়াছে। মধ্যে একটা টেবিল, তাহাতে ছেঁড়াখোঁড়া কয়েকখানা বই-খাতা ছড়ানো এবং খান দুই চেয়ার। আর কোন সরঞ্জামই নজরে পড়ে না। বোধ হয় এই ঘরে বসিয়াই মেয়েটি লেখা-পড়া করে।

মিনিট-খানেক পরেই সন্ধ্যা ঘরে ঢুকিল, হাতে একখানা ধোপদস্ত কাপড়, একটা তোয়ালে, আর ধোয়া গেঞ্জি। কাপড়-জামাগুলো হাতে দিয়া কহিল—নিন, পরে ফেলুন। ইস্, কি ভেজাই ভিজেছেন।

সত্যই ভূপেনের তখন কষ্ট হইতেছিল। বহুক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকিবার ফলে শীত করিতেছিল রীতিমত। সে আর কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া ভিজা কাপড়-জামাগুলা ছাড়িয়া ফেলিল এবং তোয়ালে দিয়া মাথাটা মুছিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল।

নিজেই সে ভিজা কাপড়-জামাগুলো তুলিয়া লইতেছিল, বাধা দিয়া সন্ধ্যা

কহিল—ও থাক। ও আমি কাচিয়ে কাগজে জড়িয়ে দিচ্ছি ঠিক ক'রে। আপনি এখন ও ঘরে চলুন, চা আনতে বলেছি।

তাহার পাকা গৃহিণীর মত চালচলন দেখিয়া ভূপেন না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিয়া কহিল—আবার চা-ও খাওয়াবে। চলো, তাতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার দাদু কোথায়? তোমার বাবা-মা?

তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে গম্ভীর ভাবে সন্ধ্যা জবাব দিল, বাবা-মা আমার কেউ নেই। ভাই-বোনও নেই—শুধু আমি আর দাদু।

কথাটা সে বেশ সহজ ভাবেই কহিল, কিন্তু ভূপেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। একটু যেন অপ্রস্তুতও হইল। তাড়াতাড়ি কহিল, তোমার দাদু বাড়ি আছেন ত?

—না, তিনি এখনও আদালতে। আমাদের যে গাড়ি পেঁৗছে দিল, সেই গাড়িই গেছে তাঁকে আনতে।

এবার তাহারা যে ঘরটিতে আসিল সেটি বৈঠকখানাই। মহার্ঘ আসবাবপত্র এবং কোচ-কেদারায় পরিপূর্ণ। একটা গদী-আঁটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া সন্ধ্যা নিজে একটা সেটীতে বসিয়া পড়িয়া কহিল—আপনি কি করেন?

প্রশ্নটা ঐটুকু মেয়ের মুখে একেবারেই মানায় না। কিন্তু তবু তাহার প্রশ্ন করিবার ভঙ্গীতে এমন সারল্য ছিল যে, ভূপেন বিরক্তি বোধ করিল না, বরং প্রসন্ন মুখেই জবাব দিল, কলেজে পড়ি।

—আর কি করেন?

—আর?—হাসিয়া ভূপেন জবাব দিল,—আর ছেলে পড়াই।

এতক্ষণে বোধ হয় সন্ধ্যার একটু সম্ভ্রম বোধ হইল। সে কিছুক্ষণ তাহার ডাগর চোখ মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—কি পড়ান তাদের?

—সব। অঙ্ক, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, আরও কত কি।

—ও!

ইহার পর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। ইতিমধ্যে চা আসিয়া পেঁৗছিল। একটা ডিসে দুটি সন্দেশ, দুখানি নিমকি এবং সুন্দর একটি কাপে এক কাপ চা।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, তুমি চা খাবে না?

সন্ধ্যা জবাব দিল, দাদু না খেলে আমি খাই না। আপনি খান।

ভূপেন কহিল, কিন্তু সে যে বড় খারাপ দেখাবে খুকী।

সন্ধ্যা মাথা দুলাইয়া কহিল, কিচ্ছু খারাপ দেখাবে না। আপনি ভিজে এসেছেন ভীষণ, আমি ত আর ভিজি নি।

অগত্যা ভূপেন খাবারের ডিসে মন দিল। খাবার শেষ করিয়া চায়ে সবে চুমুক দিয়াছে, এমন সময় সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, একটা কাজ করবেন?

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, কি কাজ?

—আপনি আমাকে পড়াবেন? পড়ান না।

ভূপেন সহসা কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না। কহিল, কেন, যিনি তোমাকে পড়াচ্ছেন, তাঁর কি হলো?

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া কহিল, তিনি দিন পনেরোর উপর হলো দেশে চলে

গেছেন। সেখানকার ইস্কুলে তিনি কাজ পেয়েছেন, তাই আর ফিরবেন না।

তবু ভূপেন কোন জবাব দিতে পারিল না। এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে কি-ই বা জবাব দেওয়া যায়! সে নীরবে চা পান করিতে লাগিল। সন্ধ্যা কিন্তু তাহার মৌন ভাবকে সম্মতির লক্ষণ বলিয়াই ধরিয়া লইল। খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, তা'হলে ঐ কথাই রইলো, কাল থেকে পড়াবেন আপনি, কেমন? বাঃ, এই বেশ হলো!

ভূপেন হাসিয়া কহিল, তুমি ত দিব্যি সব ঠিক ক'রে ফেললে, কিন্তু তোমার দাদু যদি রাজী না হন?

সন্ধ্যা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, আপনি বড় বোকা মাস্টার-মশাই। আমি পড়ব, দাদু রাজী হবেন না কেন? আচ্ছা, বেশ, ঐ ত দাদু এসে গেছেন, এখনই ওঁকে জিজ্ঞেস করছি।

সত্যই গাড়ি তখন ফটক পার হইতেছে। এক প্রিয়দর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক সাহেবী পোশাক পরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া সরাসরি তাহাদের ঘরেই প্রবেশ করিলেন। টুপিটা চাকরের হাতে দিয়া সহাস্য বদনে প্রশ্ন করিলেন, গিন্নী কখন এলে গো?

সন্ধ্যা জবাব দিল, আমাকে পৌঁছেই গাড়ি গিয়েছিল তোমাকে আনতে।

সন্ধ্যার দাদুর নাম মোহিত রায়; মোহিতবাবুর এতক্ষণে চোখ পড়িল ভূপেনের দিকে। তিনি সস্মিত-জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ভূপেন ঘামিয়া উঠিল, কিন্তু সন্ধ্যা বেশ সপ্রতিভ, সে জবাব দিল, উনি আমার নতুন মাস্টারমশাই।

—নতুন মাস্টারমশাই?—বিস্মিত হইয়া মোহিতবাবু প্রশ্ন করিলেন।

সন্ধ্যা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল—হ্যাঁ। আজ যখন পিসিমার ওখান থেকে ফিরছি, দেখি উনি গড়ের মাঠের এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছেন। সঙ্গে ক'রে তাই এনেছি, কাল থেকে উনিই আমাকে পড়াবেন। সে সব কথা ঠিক ক'রে ফেলেছি।

ইহার উত্তরে কিছু তিরস্কারই ভূপেন আশা করিয়াছিল, কিন্তু মোহিতবাবু একটু হাসিলেন। কহিলেন, ঠিক ক'রে ফেলেছ একেবারে? বেশ ত!—তাহার পর একটা সোফায় বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, তোমার নামটি কি বাবা?

ভূপেন এতক্ষণে একটু হাঁফ ছাড়িল। সে মোহিতবাবুর প্রশ্নের উত্তরে নাম-ধাম-পেশা সবই খুলিয়া বলিল। সব শুনিয়া মোহিতবাবু কহিলেন, তুমি সত্যিই ওকে পড়াতে পারবে বাবা?

ভূপেন মাথা নিচু করিয়া জবাব দিল, আপনি যদি আদেশ করেন ত চেষ্টা করি।

মোহিতবাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, না, না, আদেশ-টাদেশ করার কথাই নয়। আমার ও গিন্নী আবার এক-রকমের মানুষ। মাস্টার ওঁর সহজে পছন্দ হয় না, আর পছন্দ না হলে পড়তে চান না একটি বর্ণও। অথচ যাঁকে ভালো লাগে তাঁর কাছে একেবারে ভেরি গুড্ গার্ল। তুমি যদি পার ত আমি বেঁচে যাই। কদিন

ধরেই ভাবছি যে আবার কে আসবে।

ভূপেন কহিল, কোন্ ক্লাসে পড়ে ও?

—উঁহু, ক্লাসে-ট্লাসে নয়! ইস্কুলে দেওয়ার পক্ষপাতী নই আমি। মেয়েদের ইস্কুলে লেখাপড়া যা শেখানো হয় তা আমি জানি। মেয়ে-মাস্টারনীও ঠিক সেই কারণে আমি রাখি না। দু'-একজনকে চেষ্টা ক'রে দেখেছি—লেখা-পড়া ওরা কিছু জানে না। আর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যে সব মেয়ে ইস্কুলে যায় তাদেরও ত দেখি—ইস্কুলে গিয়ে শেখে নানারকম ক'রে প্রসাধন করতে, সুর ক'রে কথা বলতে, কতকগুলো মুদ্রাদোষ অভ্যাস করতে এবং—থাক্, তুমি ছেলেমানুষ।

ভূপেন একটু হাসিল শুধু।

—তোমার ও হাসি জানি বাবা, অর্থাৎ আমার এটা বাড়াবাড়ি, এই ত? তা হোক্—আমি সেকেলে মানুষ, আমার মত অত সহজে বদলায় না। ইস্কুলে দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। বাড়িতেই পড়ে। তবে স্ট্যাণ্ডার্ড একটা ঠিক আছে বৈকি। বোধ হয় ক্লাস সিক্স-এর মত হবে। এখনও অ্যালজেব্রায় হাত দেয় নি।

ভূপেন কহিল, আচ্ছা, সে আমি দেখে নেবো'খন।

তাহার পরের কথাটা সে লজ্জায় উত্থাপন করিতে পারিল না। তাহার এই অল্প-বয়সের অভিজ্ঞতাতেই এটা জানিতে পারিয়াছিল যে যাহারা 'বড়লোক' নয় শুধু ধনী, তাহাদের সহিত দরদস্তুর করিয়া না লইলে পরে ঠকিতে হয়। কিন্তু মোহিতবাবুকে ঠিক কোন্ পর্যায়ে ফেলা উচিত, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

মোহিতবাবু নিজেই কিন্তু কথাটা পাড়িলেন। সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, গিন্নী একটু ওঘরে যাও ত।—হ্যাঁ বাবা, কাজের কথাটা বলে নিই। সকালে বিকেলে যখন খুশি তুমি পড়িও, সময়ের হিসেবও আমি নেবো না। দরকার মত দু ঘণ্টাও পড়াবে আবার উভয় পক্ষের সুবিধামতো দশ মিনিট পড়িয়েও চলে যেতে পারো—দুদিন কামাই করলেও কিছু বলব না। কারণ, আমি জানি এটা বাজারের কেনা-বেচা নয়, কাঁটায় তৌল করতে গেলে ঠকতে হয়। বিশেষ আমি ছাত্র-ছাত্রীর সামনে মাস্টারদের বেতনের কথাটা তুলতেই চাই না, তাতে অশ্রদ্ধার সঞ্চার হ'তে পারে। কিন্তু একটা কথা, আমি ওকে ইস্কুলে দিই নি কি কারণে তা ত শুনলে, আমি চাই ওকে সত্যিকারের লেখাপড়া শেখাতে। ওরও জ্ঞানপিপাসা আছে খুব, তা আমি জানি। ওকে বাইরের বই পড়াতে চাই, তোমাকেও পড়ে তৈরি হ'তে হবে। দরকার হ'লে ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে যাবে, অসুবিধা হয় বই কিনবে, আমি দমে দেবো। কিন্তু ও যেন সব প্রশ্নের জবাব পায়। তুমিই ওর জন্যে গল্পের বই বেছে দেবে—লিস্ট ক'রে সরকারকে দিলে, সে কিনে আনবে। এতে রাজী আছ ত?

ভূপেন ঘাড় হেঁট করিয়া কহিল, তাতে আর আপত্তির কি আছে বলুন? পড়ার ইচ্ছা জানবার ইচ্ছা আমারও কম নয়। তবে—

—তবের ব্যবস্থা করব বই কি বাবা। আগের মাস্টারমশাইকে আমি ত্রিশ

টাকা দিতুম। কিন্তু তার চেয়ে বেশী দিতেও আপত্তি নেই। তুমি খুশী হয়ে আমাকে খুশী করবে, এই আমি চাই।

ত্রিশ টাকা। ভূপেনের মনে পড়িল বর্তমান টিউশনির কথা, দু ঘণ্টা পড়াইয়া আট টাকা পায় মোটে। সে মাথা নাড়িয়া কহিল—ত্রিশ টাকাই যথেষ্ট। বেশ, কাল থেকেই আমি আসব, তবে সন্ধ্যের সময়—?

—হ্যাঁ, সন্ধ্যের সময়ই ভালো।

ভূপেন উঠিয়া দাঁড়াইল। মোহিতবাবু সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ডাক দিলেন—গিন্নী কোথায় গো ? তোমার মাস্টারমশাই বাড়ি যাচ্ছেন যে।

সন্ধ্যা কাছেই কোথায় ছিল, সে একটা খবরের কাগজের পুলিন্দা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল।

—এই নিন আপনার ভিজে কাপড়-জামা।

মোহিতবাবু কহিলেন—তাহলে উনি কাল থেকেই আসবেন। বুঝলে, তৈরি থেকো। এখন ওঁকে প্রণাম করো। উনিই তোমার মাস্টারমশাই হলেন।

ভূপেন বিব্রত হইয়া কোন বাধা দিবার পূর্বেই সন্ধ্যা হেঁট হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া একেবারে পায়ের ধূলো লইল।

মোহিতবাবু ভূপেনের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন—না, না বাবা। আমি এখানে অন্য কোন সামাজিক নিয়ম মানি না। গুরু আর ছাত্রের সম্পর্ক যতটা সম্ভব শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ভালো, তাতে শুধু যে ছাত্রের ভালো হয় তাই নয়, গুরুকে সতর্ক থাকতে হয়। ফল পাওয়া যায় ভালো।

ভূপেন তাঁহাকে যথারীতি নমস্কার করিয়া বাড়ির পথ ধরিল।

॥ ২ ॥

বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে চিন্তা করিয়া ভূপেনের হাসি পাইতে লাগিল। ঘটনাটা যদি কোন বন্ধুকে আগাগোড়া শোনানো যায় তাহা হইলে সে রীতিমত ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিবে হয়ত—অবশ্য মেয়েটির বয়স বাদ দিয়া বলিলে। নাটকীয় রোমান্সের কিছুই বাকি নাই, শুধু ঐ একটা বড় রকমের ফাঁক, নায়িকা নিতান্ত বালিকা। রোমান্সের সাধ তাহার মনে ইদানীং দেখা দিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সাধ লইয়া ভগবান যে এমন পরিহাস করিবেন, তাহা কে জানিত!

তা হোক্—তবু ত্রিশ টাকা অনেক টাকা। বহুদিনের শখ একটা টেবিল-ল্যাম্পের। প্রথম মাসের মাহিনা পাইলেই কেনা যাইতে পারে। খান-দুই ভালো চেয়ারেরও বড় অভাব। সব চেয়ে বড় অভাব যেটা, একটা স্বতন্ত্র ঘরের। সকলে মিলিয়া দুখানা ঘরের মধ্যে গুঁতাগুঁতি করিলে আর যাহাই হউক, পড়া হয় না। বাড়িওয়ালাকে বলিয়া বর্তমান ভাড়ার উপর গোটা চার-পাঁচ টাকা বাড়াইলে হয়ত তিনতলায় টালির ঘরটা পাওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়—নিচেকার কোন গোলমাল সেখানে পেঁছায় না।

পুরাতন টিউশনিটা অবশ্য ছাড়িয়া দিতে হইবে, কিন্তু এখন নয়। ভূপেন্দ্র টাকাকড়ির ব্যাপারে যতই ঔদাসীন্য দেখাক, অভাবের সংসারে কতকগুলো সাধারণ জ্ঞান তাহার হইয়াছিল। এ টিউশনিটা টেঁকে কিনা, তাহার ঠিক কি? এখন বলিয়া কহিয়া দিন দশেকের ছুটি লইবে। দিন দশেকের মধ্যে কি আর মোহিত-বাবুদের চেনা যাইবে না? তখন হয় মোহিতবাবু, নয় পুরানো মক্কেল—যাহাকে হউক জবাব দিলেই চলিবে।

কিন্তু আজও টিউশনি আছে। আজিকার দিনটা অন্ততঃ সারিয়া আসা দরকার নহিলে অভদ্রতা হয়। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া ভিজাকাপড়-জামাগুলি বোনের হাতে দিয়া চা তৈরি করিতে বলিল। দুটি অনূঢ়া বোন তাহার, কিন্তু তার জন্য ভূপেনের দুঃখ ছিল না। বোন থাকায় অসুবিধা যেমন আছে, সুবিধাও কম নাই। অহরহ হুকুম করা যায়, এবং তাহারাও কলেজীদাদার ফরমাশ খাটাকেই জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করে।

বোন শান্তি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, এ কাপড়-জামা কোথা থেকে এল আবার?

—ও আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে বদলে এসেছি, কাল ফেরত দিলেই চলবে। ভূপেন সংক্ষেপে জবাব দিল। তাহার বাবাকে সে চেনে, বেশী মাহিনার টিউশনির সংবাদ কানে গেলে আর রক্ষা থাকিবে না, তৎক্ষণাৎ তিনি সংসার-খরচের জন্য কিছু দাবি করিয়া বসিবেন। এমনিতেই বলেন, মাসে মাসে আটটা ক'রে টাকা পাস, কি করিস? কলেজের মাইনে, বইয়ের দাম সবই ত আমি দিই, তোর এত খরচ কিসের?

ভূপেন খাবার ও চা খাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল, তখন সন্ধ্যার দেরি নাই। বাগবাজারে তাঁহাদের ওখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে সাড়ে সাতটা বাজিয়া যাইবে—বাড়ি ফিরিতে দশটা। কোন মতে জামাটা কাঁধে গলাইতে গলাইতে সে দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিতে লাগিল।

সদরের কাছে নিচের তলার ভাড়াটে অবিনাশবাবুর সহিত দেখা। রোগা একহারা চেহারা, পান-দোক্তার কষ দুই চোয়ালে সর্বদাই লাগিয়া থাকে; ফলে দাঁত ও মুখ-গহ্বর চির-রক্তবর্ণ। সেদিকে চাহিলে যেন ভয় করে—হাতে একটা আধ-খাওয়া বিড়ি এবং ময়লা হাফ-শার্ট—যখনই দেখা হয়, এই চেহারাই ভূপেনের নজরে পড়ে। আজও তাহার অন্যথা হইল না, পাকা উচ্ছের বীচির মত দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন—কি বাবাজী, দেশলাইটা দেবে একবার?

ভূপেনের কাছে তিনি পূর্বেও বারকয়েক এ চেষ্টা করিয়াছেন। সে অসহিষ্ণু-ভাবে কহিল, আপনাকে আর কতবার এ জবাব দেব কাকাবাবু, যে আমি বিড়ি-সিগারেট খাই না।

মুখে এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করিয়া অবিনাশ কহিলেন, কি রকম যে কলেজে পড়ো, বুঝি না। কলেজের ছেলে সিগারেট খায় না, এ শুনিনি কখনও। আমরাও এককালে কলেজে ভর্তি হয়েছিলুম হে, তখন সিগারেট খেলে মাথা ঘুরত, তবু জোর ক'রে খেতুম, পাছে অন্য ছেলেরা ঠাট্টা করে। যাক্ বাবা, **better late**

than never, ওটা ধরে ফেলো—আমাদের একটু অসুবিধে হয়।

রাগে ভূপেনের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে জবাব দিল—ধরতে ত বলছেন, শেষে আপনার মত অবস্থা হবে ত, এর-ওর কাছে ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে হবে। খরচ দেবে কে?

—আহা বাবাজী, তোমরা খালি মাথা গরম করতেই পারো, সুবিধেগুলো ভেবে দেখো না। ঐ তোমাদের দোষ। বলি তবে টিউশানি করো কি করতে? যেখানে যাবে আগে ছাত্রটিকে ঐ নেশা ধরিয়ে দেবে। ব্যস—তারপর আর কোন গোলমাল নেই! সে বেটা বাপের পকেট মেরে দামী সিগারেট কিনবে আর তুমি তার মাথায় হাত বুলোবে। ও ভারি সুবিধে। আমি ত টিউশানি করেছি ঢের, যেখানে যেতুম, আগেই ঐ নেশাটি ধরিয়ে দিতুম। ওতে কোন পাপ নেই বাবাজী। ধরবেই ত, দুদিন আগে আর দুদিন পিছে—

তাঁহার নির্লজ্জতায় ভূপেন নির্বাক হইয়া গেল। বয়স্ক লোক, ইহার পর জবাব দিতে গেলে মারামারি করিতে হয়। সে এক রকম তাঁহাকে ধাক্কা দিয়াই সরাইয়া বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু পথে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাগুলো মনে করিয়া তাহার মন বিষাক্ত হইয়া রহিল।

তাহার পুরাতন ছাত্রদের বাড়ি বাগবাজারের একটা গলির ভিতর। ছোট বাড়ি। একটি মাত্র বাহিরের ঘর, তাহারই মাঝে একটা মোটা চটের পর্দা ঝুলাইয়া দু ভাগ করা হইয়াছে, একদিকে কর্তা সন্ধ্যার পর বন্ধু-বান্ধব লইয়া তাস খেলিতে বসেন, আর একদিকে ছেলেরা পড়ে। ফল হয় এই যে, তাঁহাদের পাশবিক চিৎকারে ছেলেরা পড়ায় মন দিতে পারে না, বার বার অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। তা ছাড়া অধিকাংশ সময়েই রসনাকে ভদ্র ভাষার গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না, খেলায় হারিবার মাথায় এমন সব কথা বাহির হইতে থাকে যাহা কোন মতেই শিক্ষক-ছাত্র একত্র বসিয়া শোনা যায় না। আগে আগে ভূপেন এ সম্বন্ধে অনুযোগ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কর্তা বলিয়াছেন —তা বাপু, নিজের বাড়ি থাকতে কি ফুটপাথে বসে তাস খেলব? তা ছাড়া এ ত তাস খেলা, কোন বদখেয়ালী ত করি না। তাস ত বাপ-ছেলেতে বসে খেলা যায়।

আর একদিন বলিয়াছিলেন, সত্যি কথা বলতে কি অমনি মাস্টারদের ওপর নজর রাখাও হয়। মাস্টারদের ত জানি, ফাঁকি দিতে পারলে আর কিছু চায় না। দু ঘণ্টা পড়ানো—তাও যেন বাঘ মনে হয় তাদের কাছে।

ভূপেন আর কিছু বলিবার চেষ্টা করে নাই। পড়ানো বলিতে ইঁহারা ঘণ্টাটাই বোঝেন। তাস খেলায় যতই উন্মত্ত থাকুন না কেন, প্রতিদিন ভূপেনের বাড়ি ফিরিবার সময় ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখেন যে দুই ঘণ্টা পুরা হইল কিনা।

সেদিনও সে যখন গেল, তখন তাঁহাদের তাসের আড্ডা বসিয়া গিয়াছে। ভূপেনকে দেখিয়া একবার ঘড়িটার দিকে চাহিয়া কহিলেন—কি মাস্টার, এত দেরি যে? আমি ভাবলুম, আজ আর এলেই না। এই ভীম, ওরে ভীমে—মাস্টারমশাই এসেছেন যে। হারামজাদা নাম্ না নিচে তাড়াতাড়ি।

ভূপেন কোন কথা না বলিয়া পর্দার ওপারে গিয়া পড়াইতে বসিল। এ টিউশনি ছাড়িয়া দিতে পারিলে বাঁচা যায়; দুটি ছেলে, একটি একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়ে, আর একটির ক্লাস ফাইভ। ছোটটি বরং ভাল কিন্তু বড়টি যেমন নির্বোধ তেমনি ফাঁকিবাজ, আর তেমনি অসভ্য। কোন মতে দুটি ঘণ্টা কাটাইতে ভূপেনের প্রত্যহ প্রাণান্ত হয়।

আজও অংক কষিতে কষিতে বড়টি মুখ তুলিয়া কহিল, স্যার চন্ডীদাস ছবি দেখেছেন? খুব নাকি ভাল হয়েছে?

ভূপেন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, আবার বায়োস্কোপের কথা। একদিন বারণ ক'রে দিয়েছি না?

ছাত্র হি-হি করিয়া হাসিয়া জবাব দিল, আপনি ত দেখেছেন স্যার, বলুন না কেমন হয়েছে।...দেখব আমি নিশ্চয়ই, বাবা পয়সা না দেয়, মায়ের কাছ থেকে আদায় করবো—হি হি।

সজোরে তাহার কানটা মলিয়া দিয়া ভূপেন কহিল,—অংকে মন দাও, বাঁদর কোথাকার।

এবারে সে ক্রুদ্ধ হইল, ঘাড় হেঁট করিয়া আঁক কষিবার ভান করিতে করিতে দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল—উনি দেখতে পারেন, বাবা নিজে তিনবার দেখতে পারেন, আর আমি বললেই বাঁদর হলুম। দেখবই আমি।

ভূপেন ছোটটির দিকে মনোযোগ দিল। সে একটা লজেঞ্চস্ মুখে পুরিয়া নামতা মুখস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল; ভূপেন কহিল—ও কি হচ্ছে? ওটা হয় ফেলে দাও, নয় গিলে ফেলো। লজেঞ্চস্ মুখে পুরে পড়া হয় না।

সে লজেঞ্চস্ কড়মড় করিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিল,—দাদা আজ দুপুর-বেলা আপনাকে কি বলছিল জানেন স্যার? বলে দিই দাদা?

দাদা সহসা যেন ক্ষেপিয়া গিয়া ঠাস্-ঠাস্ করিয়া তাহাকে ঘা-কতক চড়াইয়া দিল, স্টুপিড কমনেকার। মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব।

ছোটটি কাঁদিল না। সে শিক্ষাই নাই তাহার। সে মুখ-চোখের চেহারা ভীষণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর পাগলের মত দাদার ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কিল-চড়-ঘুষি বর্ষণ করিতে লাগিল। সে এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! টেবিলটা উল্টাইয়া যাইবার উপক্রম, ছাড়াইতে গিয়া ভূপেনের উপরও দুই-এক ঘা পড়িল।

অবশেষে যখন উভয় পক্ষই শান্ত হইল, তখন ছোটটির ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে এবং বড়টির জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সে সরিয়া বসিয়া গজ্‌রাইতে লাগিল—দেখে নেব তোমাকে, শুয়োর কোথাকার। চামড়া কেটে তাতে নুন ছিটিয়ে দেব। শুয়োর। শুয়োর।

ছোটটি মুখের রক্ত জামার হাতায় মুছিয়া ফেলিয়া শুধু জবাব দিল—যা। যা।

ইহাও প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। অথচ পর্দার আড়ালে তাস খেলার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। একদিন ভূপেন নালিশ করিতে গিয়াছিল, কোন ফল হয় নাই; কর্তা বরং অপ্রসন্ন মুখে কহিয়াছিলেন—তুমি থাকতে ওরা মারামারি করে কেন?

শাসন করতে পারো না? সেইজন্যেই ত তোমাকে এক গাদা টাকা খরচ করে রাখা।

আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলে ভূপেন আসল কথাটা পাড়িল, বলিল—দ্যাখো, আমি বোধ হয় দিন আষ্টেক-দশ আসতে পারবো না।

বড় ছেলেটির মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল—বাবাকে বলেছেন? না আমি বলব?

কিন্তু বোধ হয় কথাটা মনে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার চেহারাটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—কহিল, বাবা কি অত দিন ছাড়বে ভেবেছেন আপনাকে? দূ্যৎ?

—কিন্তু ছাড়তেই হবে আমাকে। আমার বিশেষ কাজ আছে। আমি আসতে পারবো না।

—অন্য মাস্টার দেখবে তাহ'লে। বাবা যা, লেখাপড়াটা যদি আমাদের গিলিয়ে দিতে পারতো ত ভাল হতো।

দেখা গেল ছেলেটি এধারে যতই নির্বোধ হউক, বাবাকে ভালই চেনে। পড়ানো শেষ করিয়া ভূপেন গিয়া কথাটা পাড়িতেই তিনি কহিলেন—আট-দশ দিন? সে কি! আমার ছেলেরা এমনিই কিছু করে না, তার ওপর আট-দশ দিন কামাই করলে আবার ক-খ থেকে শুরু করাতে হবে। সে আমি পারবো না।

শান্ত দৃঢ়স্বরে ভূপেন কহিল—কিন্তু আমার বিশেষ কাজ আছে, আমি আসতে পারবো না।

ঠিক সেই সুরেই কর্তা জবাব দিলেন—তাহ'লে অন্য মাস্টার দেখতে হবে। ছেলেদের ত আমি উচ্ছন্নয় দিতে পারি না।

রাগে ভূপেনের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে কোনমতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল—বেশ, তাহ'লে তাই দেখবেন। আমার টাকাটা মিটিয়ে দিন।

—এখন টাকা? ক্ষেপেছ নাকি? মাসের শেষে তুমি হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দেবে বলে আমি তোমার জন্যে টাকা নিয়ে বসে থাকব, তা ত আর হয় না। সেই মাস-কাবারে চুকিয়ে নিয়ে যেও। এমনিই ত নোটিসের জন্যে পনের দিনের টাকা কাটা উচিত।

ভূপেনের একবার মনে হইল বলে যে, ও টাকাটা আপনিই রেখে দেবেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের সহস্র প্রয়োজনের কথা মনে পড়িতেই উদ্গত বাক্যটা দমন করিয়া লইল। বলিল—তাই হবে।

কোনমতে একটা শুষ্ক নমস্কার করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। পর্দার ওপার হইতে তখন তাহার ছাত্রদের একটা চাপা উল্লাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। এখন অন্ততঃ তিনটা দিনের জন্য তাহারা নিশ্চিন্ত!

॥ ৩ ॥

পরের দিন যথাসম্ভব প্রস্তুত হইয়া সে সন্ধ্যাদের বাড়ি গেল। সংবাদপত্র সে নিয়মিত পড়ে; সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে অনেক কিছুই বেশী জানা ছিল তাহার, তবু ভয়ে-ভয়েই পড়াইতে গেল। কাল মোহিতবাবুর কথা শুনিয়া বুঝিয়াছে যে,

আর যাহাই হউক—ফাঁকি সেখানে চলিবে না। আর মোহিতবাবুকে তুষ্ট করা ছাড়া তখন আর কোন উপায়ও ছিল না, সামান্য আট টাকা মাহিনার টিউশনি, তাহাও ত গেল।

তাহার হাতে ছিল আগের দিনের কাপড়-গেঞ্জির পুলিন্দা। ভয়ে ভয়ে ফটক পার হইতেই দারোয়ান সেলাম করিয়া তাহার হাত হইতে পুলিন্দাটা চাহিয়া লইল, তাহার পর পথ দেখাইয়া সন্ধ্যার সেই পড়ার ঘরটিতে লইয়া গেল। আজ ঘরটিকে কিছু পরিষ্কার করা হইয়াছে। বই-খাতাগুলি টেবিলের একধারে গোছানো, দোয়াত-কলমেও নূতন কালি ও নিবের আভাস পাওয়া যাইতেছে—এক কথায় সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত। বইগুলি সে খুলিয়া দেখিল। মোহিতবাবু ঠিকই বলিয়াছেন, বইগুলি সবই ক্লাস সিক্স-এর। একটু পরে চাকর আসিয়া এক পেয়ালা চা ও এক প্লেট খাবার দিয়া গেল—লুচি, আলুভাজা ও রসগোল্লা। এই সৌজন্যে ভূপেন বিস্মিত হইল। তাহার গত দুই বৎসরের টিউশনির অভিজ্ঞতায় এমনটি একদিনও ঘটে নাই। সে চা খাইয়া আসিয়াছিল, তবু সুদৃশ্য কাপ ও সুগন্ধি চায়ের লোভ সামলাইতে পারল না—দুই-এক চুমুক পান করিল।

এইবার আসিল সন্ধ্যা। আগের দিনের মতোই সাদা এক ফ্রক পরনে, কোথাও কোন আড়ম্বর নাই, প্রসাধনের চেষ্টা পর্যন্ত দেখা যায় না। আসিয়াই প্রশ্ন করিল —কাল অত ভিজে আপনার অসুখ করে নি ত মাস্টারমশাই ? সর্দি ?

—না। বাড়ি গিয়েই আদা দিয়ে গরম চা এক কাপ খেয়ে ফেললুম, ব্যস সব ঠিক হয়ে গেল।

—তাহ'লেই ভালো। আমি ভাবলুম, নিশ্চয় আপনার অসুখ করবে। যা কাঁপছিলেন আপনি ঠাণ্ডায় !

ইহার পর পড়াশুনা শুরু হইল। একটু পরীক্ষা করিবার পরই ভূপেন বুঝিতে পারিল, সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই ঠিক। দুনিয়ার খবর সন্ধ্যা রীতিমতোই রাখে। ইহাতে যেমন তাহার পরিশ্রমের আশঙ্কা বাড়িল, তেমনি আর একটি তথ্য লক্ষ্য করিয়া খুশীও হইল। দেখিল সন্ধ্যার পড়াশুনায় মনোযোগ আছে, তাহাকে বোঝানোও সহজ। এক কথা বার বার বলিতে হয় না, শ্রদ্ধাসহকারে শোনে এবং বুঝিবার চেষ্টা করে। যেটুকু প্রশ্ন করে, তাহাতেও তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু অঙ্কে একটু কাঁচা, তাও এমন কিছু নয়।

শেষের দিকে মোহিতবাবু আসিয়া বসিলেন। পড়ানো শেষ হইলে সন্ধ্যা ভিতরে চলিয়া গেল। তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন—কেমন দেখলে বাবা ?

সোৎসাহে ভূপেন জবাব দিল—খুব ভালো। এতটা আমি আশা করি নি। এমন স্টুডেণ্টকে পড়িয়ে সুখ আছে।

মোহিতবাবু কহিলেন—তোমার পড়ানোর পদ্ধতিটিও ভালো। আমি ও-ঘর থেকে কিছু কিছু শুনতে পেয়েছি। বিশেষ করে ডিকেন্সের ঐ গল্পটি শোনানোতে আমি ভারি খুশী হয়েছি। এই ত চাই, পড়া বলতে শুধু নীরস পাঠ্য পুস্তক পড়া বোঝাবে কেন ? গল্পও যে পড়া হ'তে পারে আমাদের দেশের অনেকে তা জানে না। তোমার দেখছি সাহিত্যে বেশ অনুরাগ আছে। যদি দেরি হবার

ভয় না থাকে ত চলো, তোমাকে আমার লাইব্রেরী দেখিয়ে আনি।

দোতলার এক প্রকাণ্ড ঘরে মোহিতবাবুর লাইব্রেরী। গোটা তিন-চার আলমারিতে শুধু আইনের বই ঠাসা, বাকি সব কয়টি, অন্ততঃ বারোটার কম নয়, সাহিত্যের বই ভর্তি। ইংরাজী-বাংলা-সংস্কৃত, কাব্য-প্রবন্ধ-উপন্যাস কিছুরই অভাব নাই। দামী অভিধান এবং অন্যান্য রেফারেন্স-বইও প্রচুর। দেখিতে দেখিতে ভূপেনের চক্ষু লোলুপ হইয়া উঠিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মোহিতবাবু বলিলেন—আলমারির চাবি খুকীর কাছেই থাকে। তোমার যখন যেটা পড়তে ইচ্ছে হবে, ওকে বলো, বার ক'রে দেবে খন।

সে দিনের মত বিদায় লইয়া ভূপেন বাড়ি ফিরিল। তাহার মাথাটা অপরাহ্ণের কিছু পূর্ব হইতেই একটু একটু ধরিয়াছিল, কিন্তু নূতন অভিজ্ঞতার উত্তেজনায় অতটা গ্রাহ্য করে নাই। এখন পথে বাহির হইয়া সেই সামান্য যন্ত্রণাই প্রবল হইয়া দেখা দিল। বাড়ি ফিরিয়া আর এক মিনিট দাঁড়াইতে বা বসিতে পারিল না, একেবারে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। মা ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, কহিলেন—কি হয়েছে রে?

—মাথাটা বড্ড ধরেছে মা।

মা গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া কহিলেন—যা ভেবেছি, তাই। এই যে, গা-ও দিব্যি গরম হয়েছে দেখছি। যা ভেজা, জ্বর হবার আর অপরাধ কি!

—আজকেই জ্বর হ'লো—তাই তো!

এইটাই ভূপেনের সর্বপ্রথম চিন্তা। নূতন টিউশনি এবং বহুদিনের বাঞ্ছিত টিউশনি—দ্বিতীয় দিনেই কামাই হইলে কি থাকিবে? সে সাধ্যমত সতর্ক হইল, কিন্তু তখন আর সতর্ক হইবার সময় ছিল না, জ্বর ক্রমে বাড়িতে লাগিল, একশ চারে উঠিল। বাবা আসিয়া অভ্যাসমত বকাবকি শুরু করিলেন। এটা তাঁহার অভ্যাস। ছেলে-মেয়েদের অসুখ করিলে তিনি খানিকটা বিলাপ এবং খানিকটা বকুনি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। খানিকটা শুনিয়া অসহ্য বোধ হইলে ভূপেনের মা তাঁহাকে ধমক দিয়া উঠিলেন। তাহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোটখাট বিবাদ বাধিল—খানিকটা চেঁচামেচি, তারপর আবার চুপচাপ।

এমনি প্রত্যহ হয়। ভূপেনের সে-দিকে কান ছিল না, মন ত নয়ই। সে শুধু ভাবিতেছিল মোহিতবাবুদের কথা। দুশ্চিন্তায় মাথার যন্ত্রণা আরও খানিকটা বাড়িয়া গেল। এ-রোগটা তাহার বহুকালের, এবং সেইজন্যই বোধ হয় কতকটা গা-সওয়া হইয়াছে। অনেকদিন আগে বাবা একবার ডাক্তার দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার বলিয়াছিল, পুষ্টিকর খাদ্য এবং ব্যায়াম প্রয়োজন! দুইটার কোনটাই অবশ্য হয় নাই, চিকিৎসার অপর কোন চেষ্টাও সম্ভব ছিল না। তাহার জ্বর প্রায়ই হয়। জ্বর হইলে রাত্রিটা উপবাস দিয়া পরের দিন আবার যথারীতি স্নান, আহার, কলেজ ইত্যাদি চলে। আজও তাহার তেমনি আশা ছিল—কিন্তু ভগবান যেন ইচ্ছা করিয়াই বাদ সাধিলেন। পরের দিন সকালেও দেখা গেল, মাথার যন্ত্রণা বা জ্বর

কোনটাই কমে নাই। সেদিন ভালো ছেলের মত শুধু জল-সাগু খাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, তবু অপরাহ্ণে দেখা গেল জ্বর তখনও তেমনি আছে, মাথার যন্ত্রণাও তথৈবচ।

তাহার দুর্ভাবনার সীমা রহিল না। উঠিবার মত অবস্থা নয়, অন্যদিন হইলে উঠিবার কল্পনাও করিতে পারিত না, কিন্তু আজ না উঠিলে চলে কি করিয়া? একেবারে দ্বিতীয় দিনে কামাই? তাঁহারা কি মনে করিবেন? এই সব কথা ভাবিয়া শেষ পর্যন্ত উঠিয়া পড়িল। মা হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন—তোর মাথা খারাপ হ'লো নাকি?

অগত্যা পারিশ্রমিকের অংক চাপিয়া নূতন টিউশানির কথা বলিতে হইল। পুরাতনটি গিয়াছে, কাল হইতে নূতন টিউশানি ধরিয়াছে—আজ সবে দ্বিতীয় দিন।

মা তবু বকাবকি করিতে লাগিলেন,—অসুখ-বিসুখ হ'লে মানুষ যায় কি ক'রে? তোর যে দেখছি সাহেবের চাকরির বাড়া হ'লো!

ভূপেন সে-দিকে কান না দিয়া কতকটা মরীয়া হইয়াই বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু বাহিরে আসিয়া বুঝিল, হাঁটা অসম্ভব। মাথা খাড়া রাখা যাইতেছে না, পা টলিতেছে। তখন বোধ হয় জ্বর একশ চার। অগত্যা একটা রিক্সা লইল এবং সন্ধ্যাদের বাড়ি পেঁাছিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের অবস্থা চাকর দারোয়ানদের কাছে গোপন করিয়া ভিতরে গিয়া বসিল।

সেদিনও আগের মত চা-জলখাবার আসিল। ভূপেন সাগ্রহে চা-টা টানিয়া লইল। এত দুর্বল—সেই মুহূর্তে মনে হইতেছিল বুঝি অজ্ঞান হইয়া যাইবে।

একটু পরেই ঘরে ঢুকিল সন্ধ্যা। ভূপেন খাবারের থালা স্পর্শ না করিয়াই চা খাইতেছে দেখিয়া একটা কড়া রকমের ভর্ৎসনা করিতে গিয়া সহসা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে থামিয়া গেল। স্ফীত থমথমে মুখ, রক্তবর্ণ চক্ষু—চাহিলে ভয় করে!

—এ কি মাস্টারমশাই, আপনার জ্বর হয়েছে?

কাছে আসিয়া পাকা গৃহিণীর মত তাহার কপালে হাত দিয়া জ্বরটা অনুভব করিল, তাহার পর কহিল—ইস, এ-যে একেবারে গা পুড়ে যাচ্ছে! আমি দাদুকে ডেকে আনছি।

ভূপেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল—না, না সন্ধ্যা, যেয়ো না। এ কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে এখুনি। যেয়ো না মিছিমিছি।

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে। সন্ধ্যা ততক্ষণে ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। মিনিট দুই পরে সে মোহিতবাবুকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। মোহিতবাবু তাহার ললাটে হাত দিয়া বললেন—সত্যিই তো ভীষণ জ্বর দেখছি। তুমি এই জ্বর নিয়ে এলে কি করতে বাবা? কাজটা ভালো হয় নি, জ্বর অন্ততঃ তিন!

কোন উত্তর যেন ভূপেনের মাথায় আসিল না। আসল কথাটা কি করিয়াই বা বলা যায়! কিন্তু মোহিতবাবু নিজেই তাহা অনুমান করিয়া লইলেন। বলিলেন—একদিন পরেই অসুখের অজুহাত দিলে আমরা কি মনে করবো, এই কথা ভেবে-

ছিলে, না ? একেই বলে ছেলেমানুষ। এখন যাও, আর এক মিনিট দেরি নয়। লক্ষ্মী ছেলের মত বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়গে।

ভূপেন যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কোনমতে সে বলিয়া ফেলিল—এ রকম আমার প্রায়ই হয়। অবশ্য এতটা হয় না।

—কিন্তু আজ ত এতটা হয়েছে, আজ বেরুলে কি বলে ? তুমি মনে সংকোচ ক'রো না, জ্বর একেবারে ভালো না হ'লে আসবার দরকার নেই। তুমি বরং বসো, আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি, বাড়ি গিয়ে সেটা খেয়ে ফেলো।

তিনি শুধু ঔষধই দিলেন না, নিজের গাড়ির ব্যবস্থা করিলেন। ভূপেন সংকোচে ঘামিয়া উঠিতেছিল, বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন কথা তিনি শুনিলেন না। অগত্যা তাঁহার মোটরে চাপিয়া ভূপেন বাড়ি ফিরিয়া আসিল এবং টিউশানিটা যাইবার আশু কোন আশংকা নাই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

॥ ৪ ॥

ইহার পর হইতে সে যথানিয়মে পড়াইতে লাগিল। আগে পড়াইতে যাইবার নামে তাহার গায়ে জ্বর আসিত, এখন ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ছুটির দিনগুলিই বরং বিশ্রী লাগে। বাস্তবিক, পড়ানো যে এত আনন্দের তাহা আগে কল্পনার অতীত ছিল।

ইহার জন্য দায়ী অবশ্য তাহার ছাত্রীই। সন্ধ্যার এমন কিছু অসাধারণ মেধা নয়, কিন্তু প্রখর সহজ বুদ্ধিতে সে অভাবটুকু ঢাকিয়া যাইত। তবু এইটাই বড় কথা নয়—পাঠে তাহার ঐকান্তিক মনোযোগ ও শ্রদ্ধা দেখিয়াই ভূপেন খুশী হয় বেশী, তাহার কাজও সহজ এবং প্রীতিকর হইয়া ওঠে। সে যাহা বুঝায় তাহা সন্ধ্যা প্রাণপণে বুঝিবার চেষ্টা করে এবং একবার মাথায় গেলে সহজে ভোলে না। জ্ঞান-পিপাসা তাহার অপরিসীম—ঐটুকু মেয়ের জানিবার মত এত কথা থাকিতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন-বর্ষণে সন্ধ্যা ভূপেনকে জর্জরিত করে, কিন্তু তাহাতে সে বিরক্তি বোধ করে না একটুও। কারণ, এ প্রশ্নের মধ্যে শিক্ষককে অপ্রতিভ করার চেষ্টা নাই ; আছে শুধু জানিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ।

ভূপেন আগে হইতেই তাহার প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত থাকে, তবু সব সময়ে তাহার বিদ্যায় কুলাইয়া ওঠে না। অবশ্য এজন্য অপ্রস্তুত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ, তাহাদের গুরু-শিষ্যার সম্পর্কটা অনেক সহজ হইয়া আসিয়াছে। ভূপেন বই দেখিয়া সেই সব প্রশ্নের জবাব দেয়। বইয়ের অভাব আর নাই, মোহিতবাবুর লাইব্রেরীতে সমস্ত রকম বই-ই আছে—সেগুলি সে যথেচ্ছ নাড়াচাড়া করে। শুধু তাহাই নয়, কোন বই—যা তাঁহার আলমারিতে নাই—সে পড়িতে চায় শুনিলেই তিনি সেই বই কেনেন। ভূপেনের এক-আধখানা পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল, তিনি তাহাও কিনিয়া দিয়াছেন।

পড়াশুনার মধ্যে গল্পই চলে বেশী। ইতিহাস পড়াইতে বসিয়া ভূপেন সেই

ছোট পাঠ্যপুস্তকখানি হইতে বহু দূরে চলিয়া যায়। ইতিহাস ও সাহিত্যে তাহার অনুরাগ ছিল খুব বেশী, ইতিহাসের অনেক বই-ই সে পড়িয়াছে, সেই সব বই হইতে সে গল্প করে—পৃথিবীর নানা দেশের উত্থান-পতনের কাহিনী। এ দেশেরও যে সব ইতিহাস ছোট পাঠ্যপুস্তকে লেখা থাকে না, তাহারও গল্প বলে সে। আর গল্প বলে সাহিত্যের। বড় বড় ইংরেজী বই-এর আখ্যানভাগ সে এক একদিন বলিয়া যায় আর সন্ধ্যা মর্মর-মূর্তির মত বসিয়া শোনে। এ বিষয়ে মোহিতবাবুরও উৎসাহ অসাধারণ, সময় পাইলে তিনিও সেই গল্পের মজলিসে আসিয়া বসেন।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। ভূপেন বেশ ভালোভাবে ইন্টার-মিডিয়েট পাশ করিল, যদিও খুব নাম করিবার মত কিছু করিতে পারিল না। তাহার কারণ কতকটা মোহিতবাবুর লাইব্রেরী! লাইব্রেরীটি তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিলেও পাশের পড়ায় কিছু ব্যাঘাত ঘটাইত। যাহা হউক—ভূপেন বি-এ ক্লাসে ভর্তি হইল, মোহিতবাবুর পরামর্শ মত ইংরেজীতে অনার্স লইল। মোহিতবাবু কহিলেন—তোমার সাহিত্য যা পড়া আছে, অনার্সের জন্যে বেশী খাটতে হবে না।

অনার্স লইয়া বি-এ পড়িবে, ভূপেনের বহুদিনের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন অবশেষে সার্থক হইল—তবু ভূপেন কিন্তু এ পড়ায় কোন সুখ পায় না। ছেলেবেলা হইতে সে কলেজে-পড়ার আশায় দিন গণিত, মনে হইত, তাহার চেয়ে গৌরব আর কিছু নাই! একখানি বই আর একখানি খাতা কিংবা শুধু একখানি খাতা লইয়া যখন পাড়ার ছেলেরা কলেজে যাইত, তখন সে সসম্ভ্রম ঈর্ষায় চাহিয়া থাকিত আর হিসাব করিত তাহার স্কুলের পর্ব শেষ হইবার আর দেরি কত! কিন্তু কলেজে উঠিয়া দেখিল, স্কুল ঢের ভালো ছিল। শিক্ষকদের সহিত স্নেহের সম্পর্ক ছিল, বন্ধুদের সহিত ছিল প্রীতির বন্ধন। ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর তাহারা কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল, সে যে কলেজে ঢুকিল, সেখানে পড়িল সে একা।

এ যেন অরণ্য! অধ্যাপকরা এক-একজন এক এক রকমের। কোন বাঙলার অধ্যাপক হয়তো রবীন্দ্রনাথের কাব্যাংশ পড়াইতে পড়াইতে কাঁদিয়া ফেলেন, কেহ বা আসিয়াই শুরু করেন তাঁহাকে গালি দিতে। এক ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, জাদুবিদ্যার খেলা দেখান, অর্থপুস্তক লেখেন এবং মক্কেল পাইলে ওকালতি করিতে ছোটেন। খান দুই উপন্যাস লিখিয়া অর্থব্যয় করিয়া ছাপিয়াছেনও, যদিও সেগুলি বিক্রয় হয় না, ফাঁক পাইলে ছাত্রমহলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেও ছাড়েন না। এক কথায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছাড়া আর সবই করেন। আর এক অধ্যাপক ক্লাসে ছাত্রদের পড়াইবার সময়টুকু যে অপব্যয় হয়, তাহা ছাত্রদের কাছেই স্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, এমন অধ্যাপকও আছেন, যিনি অধ্যাপকদের ঘরে বসিয়া এমন সরবে অশ্লীল রসিকতা করেন যে, বাহিরে তাহা ছাত্রদের কানে [illegible] কোন অসুবিধাই হয় না।

তবু যখন ইণ্টারমিডিয়েট পড়িতে [illegible] যে ইঁহারা ছোট দরের অধ্যাপক, বি-এ পড়িবার সময় [illegible] অধ্যাপকদের কাছে এ দুঃখ ঘুচিবে। কিন্তু থার্ড ইয়ারে উঠিয়া সে স্বপ্ন [illegible] ভাঙ্গিল। নাম-করা অধ্যাপক দু-একজন পাওয়া
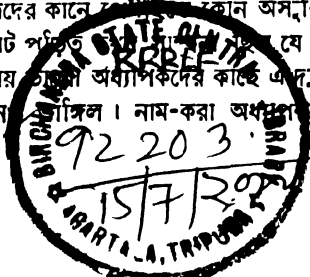
গেল, কিন্তু তাঁহারা এতই ব্যস্ত যে, না পাওয়া যায় তাঁহাদের সান্নিধ্য, না পাওয়া যায় তাঁহাদের উপদেশ। যদিও তাঁহারা মাহিনা বেশি পান, তবু অর্থলোভ আর যায় না তাঁহাদের। পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া, নোট লিখিয়া, অসংখ্য টিউশনি করিয়া নিজেদের এমন জখম করিয়া রাখেন যে ক্লাসে যখন আসেন তখন দেখা যায় তাঁহারা যেমন ক্লান্ত তেমনই অন্যমনস্ক। কেহ কেহ অবসর সময় সংবাদপত্রের অফিসে সম্পাদনার কাজ করেন, কেহ আবার করেন ওকালতি। দু-একজনের ব্যবসাও আছে। যখন ভালো অধ্যাপক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তখনকার অভ্যাসটা মাত্র আছে হয়ত, মুখস্থ বলিবার মত বলিয়া যান, তাহার বেশী আর পেঁছানো যায় না। যদি বা দু-একজন ছাত্রদের সঙ্গে একটু সহজ হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা আবার ক্লাসে আসিয়া পড়ানো বন্ধ করিয়া ধরেন রাজনীতির চর্চা, ফলে অধ্যয়ন যে তপস্যা, তাহা ছাত্ররাও ভুলিয়াছে, অধ্যাপকরাও ভুলিতে বসিয়াছেন।

অবশ্য ইহার মধ্যে দুই-চারিজন যে ধারালো অধ্যাপক নাই, এমন নহে, কিন্তু ভূপেন তাঁহাদের কাছে ঘেঁষিতে পারে না। তাছাড়া চারিপাশের আবহাওয়ায় তাঁহারাও এমন বিরক্ত যে, অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের আবরণে আত্মরক্ষা ছাড়া তাঁহাদের আর কোন উপায় থাকে না। তবু এইসব অধ্যাপকের কাছে প্রশ্ন করিয়া ভালো রকম উত্তর পাওয়া যায়, বাকি অধিকাংশ অধ্যাপকেরই দৌড় সেই বিশেষ পাঠ্যাংশের বিশেষ পাঠ্য-পুস্তকটি পর্যন্ত। তাহার বাহিরে কোন প্রশ্ন করিতে গেলে হয় বিরক্ত হইয়া ধমক দেন, নয় কথাটা কোনমতে এড়াইয়া যান। যেটুকু পড়াইবার কথা, সেইটুকুই তৈরী করিয়া আসেন বা দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে তাহা তৈরীই থাকে, সেটার অধিক কিছু পড়িবার সময়ও নাই, ইচ্ছাও নাই তাঁহাদের। নিজেদের বিষয়বস্তুর বাহিরে তাঁহাদের জ্ঞান এমন সংকীর্ণ যে, এক-একদিন দৈবাৎ তাহা আবিষ্কার করিয়া ভূপেনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আবার এমন অধ্যাপকও আছেন, যাঁহারা সত্য সত্যই দিনরাত অধ্যয়নে ডুবিয়া থাকেন, যাঁহাদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই, অথচ তাঁহারা একেবারেই পড়াইতে পারেন না। ছাত্ররা বিরক্ত হয়, গোলমাল করে, ক্লাসে সে বিষয়টাই মাটি হইতে থাকে। কর্তৃপক্ষ এই ব্যর্থতাকে ছাত্রদেরই দুর্বিনয় এবং দুর্ভাগ্যের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, মধ্যে মধ্যে গালিও দেন।

কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্মিত হয় ভূপেন ছাত্রদের দেখিয়া। বাল্যকালে শিক্ষকদের কাছে এবং পরে মোহিতবাবুর কাছে সে বারবার শুনিয়াছে, অধ্যয়ন ছাত্রদের কাছে তপস্যা। কিন্তু এ কি তপস্যা? ছেলেগুলি কলেজে আসে যেন পড়াশুনা ছাড়া আর সব কিছুর জন্য। একটি কি দুটি ছেলে ছাড়া আর কেহই বোধ হয় অধ্যয়নকে শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করে নাই। প্রথম প্রথম ভূপেন কলেজে গিয়া হাঁপাইয়া উঠিত। শিক্ষালয় নয়, এ যেন বাজার। এত হল্লা, এত গোলমাল যে কোন শিক্ষায়তনে হইতে পারে, তাহা ছিল ভূপেনের স্বপ্নেরও অগোচর। প্রীতির সামান্য সূত্র কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—আছে রেষারেষি দলাদলি। তাহারা ছাত্রসঙ্ঘ করে, সেখানেও দুই-তিনটি দল—ইনস্টিট্যুটে যায় দলাদলি করিতে। ভোট-গ্রহণ, ঝগড়া, দলাদলি এমন কি মারামারিতে পেঁছিতেও বাধা

নাই। অতি সামান্য কারণেই কলেজে ধর্মঘট হয়, কলেজেরই উঠানে দাঁড়াইয়া রাজনীতি সংক্রান্ত গরম-গরম বক্তৃতা চলে এবং সভা ভাঙ্গিলে চাঙ্গোয়ায় কিংবা সিনেমায় যাইতে এতটুকু সঙ্কোচ থাকে না। অধ্যাপকরা কোনমতে নিজেদের সম্মান বাঁচাইয়া চুপ করিয়া থাকেন।

গোড়ার দিকে ভূপেন চুপ করিয়া থাকিত। কিন্তু শেষে এক সময় অসহ্য হইয়া উঠিল। দেখিত, তাহার যে সব বন্ধু পৃথিবীতে অচিরে সাম্যবাদ স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং নিপীড়িত, নির্যাতিত, দরিদ্র, বুভুক্ষু ভারতবাসীর জন্য যাহাদের দুঃখ ও বিক্ষোভের সীমা নাই—তাহারাই গোঁফ-কামানো মুখে মেয়েদের মত প্রচুর স্নো ও পাউডার মাখিয়া সবচেয়ে পাতলা আদ্দি কিংবা রেশমের জামা গায়ে দিয়া কলেজে আসে, মুহুর্মুহু বিলাতি সিগারেট খায়, চৌরঙ্গি-পাড়ার হোটেলে জলযোগ করে এবং এক-একখানা বাংলা ছবি তিন-চার বার দেখে। তাহাতেও ভূপেনের আপত্তি ছিল না। ইহাদের বক্তৃতায় যখন দেশপূজ্য নেতারা পর্যন্ত কুৎসিতভাবে লাঞ্ছিত হইতেন, তখন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। শ্রদ্ধা কথাটার সঙ্গেই যেন ইহাদের পরিচয় নাই। রাজনীতি করে করুক, কিন্তু নিজেরা কিছু ভাবে না, ভাবিবার চেষ্টাও করে না, তাহাতেই ভূপেনের আপত্তি। কতকগুলি বিদেশী বাঁধা বুলি আওড়ায় মাত্র। বক্তৃতা করে রুশীয় সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদের তর্জমা পড়িয়া—বিপ্লবের বুলি আওড়ায় উর্দু ভাষায়, শ্লোগানটা পর্যন্ত নিজেরা তৈয়ারী করিতে পারে না। প্রথম কলেজ-জীবনে সেও যে ইহাদেরই একজন ছিল, ভাবিয়া ভূপেন আজ লজ্জা পায়।

মোহিতবাবুর সহিত এ বিষয়ে তাহার প্রায়ই আলোচনা হইত। ভূপেনের উত্তাপের পরিবর্তে তিনি হাসিয়া বলিতেন—ওদের ওপর রাগ ক'রো না বাবা, ওদের জন্য দুঃখ করো। ওরা নিজেরাই জানে না যে ওদের বক্তব্য কি, ওরা কি চায়। এখন যেমন দেশের দুর্গতদের শ্রমিকদের প্রপীড়িতদের দুঃখে গভীর উত্তেজনায় বক্তৃতা করে, বক্তৃতায় অশ্রুমোচন করার পরেই বিলাতী স্নো, বিলাতী খানা ও বিলাতী সিনেমার মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে, তেমনি একদিন ওদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই অনায়াসে পাশের বাড়ির বা কুটুম্বদের কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়বে, অবশ্য, যদি না ইতিমধ্যেই পড়ে থাকে। তারপর অর্থ-প্রাপ্তির আশায় বা দৈহিক প্রয়োজনে নিঃশব্দে বাপ-মার বেছে-দেওয়া মেয়েকে বিবাহ করবে এবং যেখানে হোক একটা চাকরি যোগাড় করে শান্তিতে ঘর-সংসার করবে। তখন আবার এরাই তখনকার দিনের তরুণদের কষে গালাগাল দেবে। এখন এরা যেমন জানে না জীবনের উদ্দেশ্য কি, কি ওদের প্রয়োজন, তখনও জানবে না। এদের ওপর কি রাগ করতে আছে।

কিন্তু মোহিতবাবু যত সহজে কথাটা উড়াইয়া দিতেন, ভূপেন তত সহজে উড়াইতে পারিত না। সে তর্ক করিতে যাইত, যুক্তি দিয়া তাহাদের ভুল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু ফল হইত বিপরীত। যে-সব ছেলে স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া ঘন ঘন স্ট্রাইক ও মুহুর্মুহু বক্তৃতা করে, তাহারাই বিন্দু-মাত্র প্রতিবাদে অসহিষ্ণু হইয়া ওঠে, অপর পক্ষকে কিছুতেই কথা কহিতে দেয় না।

অথচ, ইহার মধ্যে সব চেয়ে মজার কথা এই যে, তাহার সহপাঠীরা তাহাকে সম্পূর্ণ অবহেলাও করিতে পারিত না। তাহার কারণ, একমাত্র সে-ই ক্লাসে অধ্যাপকদের নানারূপ প্রশ্ন করিত, তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করিত এবং তাঁহারা কোন প্রশ্ন করিলে এমন জবাব দিত, যাহাতে তাহার সত্যকারের লেখাপড়ার আগ্রহ ও চেষ্টা প্রকাশ পাইত। ভালো ছেলে বলিয়া এই সামান্য সুনাম রটনাতেই তাহাকে দলে পাইবার জন্য সমস্ত দলেরই আগ্রহ ছিল প্রচুর।

অবশ্য তাহার এই ছাত্রজীবনের মধ্যে যে একেবারে কোথাও এতটুকু আলো ছিল না এমন নয়। কতকগুলি ছাত্র সব কলেজের সব ক্লাসেই থাকে, যাহারা সত্যই বিদ্যানুরাগ লইয়া আসে—তাহারা নিজেদের প্রচার করে না, খুঁজিয়া তাহাদিগকে বাহির করিতে হয়। ভূপেন এই শ্রেণীর ছাত্রদের সন্ধান পাইয়া যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ইহাদের সহিত লেখাপড়ার চর্চা করিয়া সত্যই শিক্ষায় আগ্রহ ও অনুরাগ বাড়ে। ইহারাও রাজনীতির চর্চা করে এবং দেখিয়া অবাক হইয়া গেল যে, রাজনীতি ইহারা অনেকের চেয়েই ভালো বোঝে। তাছাড়া অধ্যাপকরাও ইহাদের ভাল করিয়া পড়াইতে চান, খোলাখুলিভাবে, সহজভাবে মেশেন। এক কথায় এই বিশেষ দলটির আওতায় আসিয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

প্রথম দিকে একদিন সে মোহিতবাবুর কাছে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল যে—সামান্য বেশী খরচার জন্য কোন বড় কলেজে ভর্তি হলুম না, এখন আফসোস হচ্ছে।

উত্তরে মোহিতবাবু সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—সব কলেজেই ভালো অধ্যাপক আর ভালো ছাত্র আছেন বাবা, খুঁজে নিতে হয়।

সে কথার সত্যতা ভূপেন ক্রমে বুঝিতে পারিল।

এই সমস্ত তিক্ততার মধ্যে তাহার গভীর সান্ত্বনা ও শান্তি ছিল সন্ধ্যাদের বাড়ি। এ সময়টায় সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। তাহার এ টিউশানি শুধু অর্থের প্রয়োজনে নয়, আত্মার প্রয়োজনেও।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার পড়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ভূপেনকে ঠিক ক্লাসের পাঠ্য-তালিকা ধরিয়া পড়াইতে হয় নাই বলিয়া সে সহজে এক-একটা স্তর পার হইয়া গিয়াছে। ভূপেন যখন ফোর্থ ইয়ারে, সন্ধ্যা তখন ম্যাট্রিকের পুঁথিতে হাত দিয়াছে। ভূপেন মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া বলিত—তুমি যে ভাবে এগিয়ে যাচ্ছ সন্ধ্যা, তাতে কিছুদিনের মধ্যেই আমার চাকরিটি খাবে দেখছি।

সন্ধ্যা হাসিয়া জবাব দিত—আপনিও ছুটুন আমার আগে আগে, তাহলে আমার গরজে আপনি একদিন তবু বিদ্যাসাগর হতে পারবেন।

সন্ধ্যা কিছুতেই ভাবিতে পারিত না যে, ভূপেনের বিদ্যার স্তরে সেও একদিন পেঁছাইতে পারিবে। তাহার কিশোর-মনে ভূপেনের স্থান এমনি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল।

এখন সে তর্জমা ছাড়িয়া সোজাসুজি ইংরেজী বই-ই ধরিয়াছে। ভূপেন তাহাকে সহজ অথচ কাহিনী-প্রধান বইগুলি বাছিয়া দিত। প্রথমেই দিয়াছিল ডুমার 'কাউন্ট অফ মণ্টিক্রিস্টো'। এ বইটির গল্পাংশ সন্ধ্যা বার দুই-তিন ভূপেনের মুখে শুনিয়াছিল—গল্পটা তাহার এত ভাল লাগিত। সে-বইটি শেষ করিবার পর

ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট'। এমনি করিয়া সন্ধ্যার লেখাপড়াতে যেমন দ্রুত অগ্রগতি হইতে লাগিল, সাহিত্যেও তেমনি পাইল ডবল প্রমোশন। মোহিতবাবু প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ছোট ছোট ইংরাজী বই কিনিয়া দিবার, কিন্তু ভূপেন আপত্তি তুলিয়াছিল। মোহিতবাবু আর কিছু বলেন নাই।

ক্রমে ভূপেনের বি-এ পরীক্ষার সময় আসিল। মোহিতবাবু একদিন ডাকিয়া বলিলেন—বাবা ভূপেন, এবার তুমি কদিন পড়ানো বন্ধ করো।

ভূপেন অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন ?

মোহিতবাবু জবাব দিলেন—তোমার পরীক্ষার তো মোটে আর একুশ দিন বাকি। এখন অতটা করে সময় নষ্ট করা কি উচিত ? এ একটা মাস ও নিজে নিজেই পড়তে পারবে'খন।

ভূপেন কিন্তু সরবে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—না, না, এতে আর আমার কতটুকু সময় বা যায়। তা ছাড়া দিন-রাত বাড়িতে বসে পড়া—সে আমার ধাতে সয় না। খানিকটা ত বেড়াতেই হতো—সেই সময়টা না হয় ওকে পড়াই।

মোহিতবাবু কহিলেন—কিন্তু এমনি ঠাণ্ডা বাতাসে বেড়ানো আর মস্তিষ্ক-চালনা ক'রে বকা এক জিনিস নয়।

ভূপেন মাথা নাড়িয়া কহিল—না, না, সন্ধ্যাকে পড়ানোই একটা রিক্রিয়েশন। ওর সঙ্গে মোটে বকতে হয় না।

মোহিতবাবু হাসিয়া জবাব দিলেন--তোমার যদি ক্ষতি না হয়, তুমি এসো—so much the better.

॥ ৫ ॥

ভূপেন সসম্মানে বি-এ পাশ করিল। শুধু যে ফার্স্টক্লাস অনার্স পাইল তাহা নয়, তালিকায় তাহার নামটা গোড়ার দিকেই ছাপা হইল।

এ সম্বন্ধে তাহার মনের মধ্যে একটু ভয়ই ছিল। সে পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত ত পড়াইতে গিয়াছেও, পরীক্ষার মধ্যেও কামাই করে নাই। মোহিতবাবু নিষেধ করা সত্ত্বেও সে শোনে নাই। ফল বাহির হইতে সে তাড়াতাড়ি মোহিত-বাবুকে সংবাদটা দিয়া প্রণাম করিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন—ঐ সময়টা বেশী পড়লে ফার্স্ট হতে পারতে।

ভূপেনও হাসিয়া জবাব দিল—বলা যায় না। এখানে না এলে হয়ত সিনেমায় যেতুম। তাতে ফল আরও খারাপ হতো।

পরীক্ষা দিবার পর তাহার এক মাসিমা লক্ষ্ণৌ হইতে চিঠি দিয়াছিলেন সেখানে বেড়াইতে যাইবার জন্য। খরচা তিনিই দিবেন এমন প্রতিশ্রুতিও ছিল চিঠির মধ্যে, তবু ভূপেন যায় নাই। সে কোথাও না-যাওয়াতে তাহার বন্ধু-বান্ধবরা একটু বিস্মিতই হইল। অবশ্য সে ক্ষতি তাহার পূর্ণ করিয়া দিলেন মোহিতবাবুই। তিনি দিন পনেরোর জন্য দার্জিলিং গেলেন, সঙ্গে সন্ধ্যা ও ভূপেন দুজনকেই লইয়া গেলেন। ভূপেন একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহার সংকোচে বাধিতেছিল কিন্তু সন্ধ্যা দুই ধমক দিয়া সেটা দূর করিল ; কহিল,

আমার সঙ্গে যাবেন তাতেও বুঝি আপনার আত্মসম্মানে বাধছে? তার মানে এখনও আমাদের আপনি পর ভাবেন।

মোহিতবাবুও খুব পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। সে ত যাইতেই চায়, দার্জিলিং ও কাঞ্চনজঙ্ঘা—কত দিনের আশা তাহার। তাহার উপর মোহিতবাবুর সঙ্গ, একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ যাহাকে বলে। সে রাজী হইয়া গেল। বন্ধু বিশুর বাড়ি হইতে দুই-একটা গরম জামা ও নিজের পৈতৃক শাল সংগ্রহ করিয়া বন্ধুবান্ধব সকলকেই প্রায় সংবাদটা পেঁাছাইয়া দিয়া সে একদিন দার্জিলিং মেলে চড়িয়া বসিল। সেকেণ্ড ক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করিয়া কোনদিন সে দার্জিলিং যাইতে পারিবে, এ ছিল তাহার কল্পনার অতীত। শুধু এই যাওয়াটাই তাহার জীবনে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আর দার্জিলিং! পৃথিবীতে এত সুন্দর স্থান যে আছে তাহা সে কোনদিন ভাবিতেও পারে নাই। মেঘ ও কুয়াশার সহিত আলোকের সেখানে নিত্য লুকোচুরি চলে, মনে হয় তাহারা আছে মেঘলোকের ঊর্ধ্বে, বাকি সমস্ত পৃথিবীটা পড়িয়া আছে অনেক নিচে তাহাদের পায়ের তলায়। ফুলের মেলা চারিদিকে, ঘাস-ফুলের মতই অজস্র গোলাপ ফুটিয়া আছে। সাধারণ একটা বনফুলের সৌন্দর্য দেখিয়া সে দিশাহারা হইয়া যাইত এক-একদিন। তাহার মনে হইত, এই যদি স্বর্গরাজ্য না হয় ত স্বর্গ ইহার চেয়ে খারাপ জায়গা নিশ্চয়ই।

মোহিতবাবু সন্ধ্যাকে পাঠ্যপুস্তক কিছুই লইতে দেন নাই। সে শুধু একখানা 'সঞ্চয়িতা' লইয়াছিল; মোহিতবাবু ভূপেনকে বলিয়াছিলেন অবসর সময়ে দুই-একটি কবিতা বুঝাইয়া দিবার জন্য। এক একদিন তাহারা বই হাতে করিয়াই বাহির হইয়া পড়িত। হয়ত জলা-পাহাড়ে উঠিবার পথে কোন একটা বেঞ্চের উপর, কিম্বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘাসের উপর বসিয়া চলিত তাহাদের কাব্যচর্চা। তাহাকে চর্চা বলিলে ভুল হইবে, সন্ধ্যা এক একটি কবিতা বাছিয়া দিত, ভূপেন সেই কবিতাটি একবার আবৃত্তি করিয়া লইবার পর বুঝাইতে শুরু করিত। তাহার সৌভাগ্যক্রমে দু-একজন নাম-করা অধ্যাপকের সঙ্গ পাওয়াতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সে অনেকটা বুঝিতে শিখিয়াছিল—কিন্তু তবু ভালভাবে হয়ত তাহার নিজে নিজে কোন দিনই বোঝা সম্ভব হইত না, সেটাও অনেক সময়ে সন্ধ্যার প্রশ্নে যেন তাহার মানসচক্ষুর সামনে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইয়া যাইত। এই মেয়েটির কাছে কোন ব্যাপারেই ফাঁকি চলিত না, সেইজন্য কি পাঠ্য, কি কবিতা পড়াইতে বসিয়া সর্বদা নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ-সতর্ক রাখিতে হইত।...এমনি করিয়া সেই চিরতুষারাবৃত মৌন হিমাদ্রি-শিখরের সামনে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চলিত তাহাদের কাব্যপাঠ—ভূপেন আপন মনে বলিয়া যাইত আর সন্ধ্যা তাহার শ্রদ্ধাপূর্ণ শান্ত চোখ দুটি মেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত। যেদিন মোহিত-বাবু তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন, সেদিন ভূপেন কিছুতেই পড়িতে চাহিত না, কারণ, তাঁহার সম্বন্ধে সম্ভ্রমের সঙ্গে একটা ভয়ও ছিল তাহার মনে। মোহিতবাবু নিজেই দুই-একটা কবিতা আবৃত্তি করিয়া শোনাইতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল মিষ্ট এবং বাচনভঙ্গী অত্যন্ত স্পষ্ট ও অর্থবোধক—ভূপেন তাঁহার আবৃত্তি হইতেই অনেক

জিনিস বুঝিতে পারিত, যা এতদিন বার-বার পড়িয়াও নিজে বুঝিতে পারে নাই।

এমনি করিয়া দিন-কুড়ি কাটিয়া গেল। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় ঘনাইয়া আসিল তখন ভূপেন প্রথম আবিষ্কার করিল যে, তাহারা তিন সপ্তাহ হইল এখানে আসিয়াছে। সে খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া করুণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আমাদের তাহ'লে কালই যেতে হবে।

মোহিতবাবু হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, কালই নামতে হবে। পরশু আমার একটা জরুরী কেস আছে, না গেলে তারা অত্যন্ত বিপদে পড়বে, তা ছাড়া আমারও কথার খেলাপ হবে।

অগত্যা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভূপেন সেই 'স্বর্গ হইতে বিদায়ের' জন্য প্রস্তুত হইল। সেদিন দুপুর বেলায় একাই খানিকটা ঘুরিয়া আসিল সে। দুপুরবেলা দার্জিলিংয়ের নির্জন রাস্তার কেমন একটা মায়া আছে। যাহারা সে সন্ধান পাইয়াছে তাহারা এমনি করিয়াই বাহির হইয়া পড়ে। অনেকখানি ঘুরিয়া ক্লান্তদেহে যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা অনুযোগের সুরে কহিল, বাঃ রে, আপনি ত বেশ লোক মাস্টারমশাই, দিব্যি একা-একা ঘুরে এলেন। আজই ত শেষ দিন, আমি বুঝি আর বেরোব না?

অপ্রতিভভাবে ভূপেন জবাব দিল—বেশ ত চলো না, আর খানিকটা ঘুরে আসি—

সন্ধ্যা কহিল—হ্যাঁ, তাই বই কি। আপনি কত ঘুরে এলেন, এখনও হাঁপাচ্ছেন—আবার এখনই বেরোলে আপনার কষ্ট হবে।

ভূপেন জিদ ধরিয়া কহিল, কিচ্ছু কষ্ট হবে না। আর তা ছাড়া আজই ত শেষ, কষ্ট একটু হ'লই না হয়, তবু যতটা বেড়িয়ে নিতে পারি।

—তবে একটু দাঁড়ান, আপনার জন্যে এক পেয়ালা চা ক'রে আনি।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কি, এখনও ত তিনটেই বাজে নি, এরই মধ্যে চা?

সন্ধ্যা জবাব দিল, হ'লই বা এরই মধ্যে। এক কাপ না হয় বেশিই খেলেন। কি রকম পরিশ্রমটা হয়েছে, তা ত আপনি বুঝছেন না—এই শীতে এখনও ঘামছেন।

কথাটা বলিতে বলিতেই সে চলিয়া গেল, উত্তরের অপেক্ষাও করিল না। খানিক পরে নিজেই এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিয়া কহিল, নিন চট্ ক'রে খেয়ে নিয়ে চলুন ঘুরে আসি। দাদুকে বলে এসেছি—পাঁচটা নাগাদ ফিরে এসে চা খেয়ে আবার বেরোব সবাই মিলে।

ভূপেন 'চলো' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বই নিলে না?

সন্ধ্যা কহিল, আজ বই থাক মাস্টারমশাই—আজ শুধু দেখব।

অনেকক্ষণ দুজনে নিঃশব্দে হাঁটিবার পর বার্চ হিলের রাস্তায় পড়িয়া সন্ধ্যা অনুতপ্ত সুরে কহিল—না, আপনাকে টেনে আনা অন্যায় হয়েছে, আপনি দস্তুরমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন!···আর গিয়ে দরকার নেই, এইখানটাতেই একটু বসি, আসুন—

ভূপেন সত্যই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে প্রতিবাদ-মাত্র না করিয়া পথের ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। দুইজনে কিছুক্ষণ পাশাপাশি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর সন্ধ্যাই আবার কথা কহিল, মাস্টারমশাই, বি-এ ত পাশ করলেন এবার নিশ্চয়ই এম-এ পড়বেন। তার পর কি করবেন ?

ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তার পর যে কি করব এখনও বুঝতে পারছি না। বাবার ইচ্ছে আমি তাঁর অফিসে ঢুকি। এম-এ পড়ার কোন অর্থ নেই তাঁর কাছে—তিনি এই পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত করতে বলছিলেন। এ যাত্রা কোন রকমে ফাঁড়া কাটিয়েছে।

সন্ধ্যা যেন একটা রূঢ় আঘাত পাইল, কহিল, আপনি অপিসে চাকরি করবেন ?

ভূপেন হাসিয়া জবাব দিল, করবই যে তা এখনও ঠিক হয় নি—তবে করবারই ত কথা।···আমার মত অবস্থার শতকরা সাড়ে নিরেনব্বই জন ছেলেরই ত ঐ গতি।

সন্ধ্যা যেন একটু শিহরিয়া উঠিল। কহিল, না মাস্টারমশাই, আপনি কেরানী-গিরি করবেন, এ আমি ভাবতেই পারি না।

ভূপেন কহিল, তোমার দাদু বলছিলেন যে, এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনটা পড়ে ফেলতে, তাহ'লে উনি আমার পসারের একটা উপায় ক'রে দিতে পারবেন অনায়াসে। কিন্তু মুশকিল এই—ওকালতীও আমার ভাল লাগে না।

বয়স্কা অভিভাবিকার মতই ঘাড় নাড়িয়া সন্ধ্যা কহিল, না, না, ওতে বড় মিথ্যে কথা বলতে হয়, তাছাড়া ও সংসর্গটাই খারাপ। আমি বলব, আপনি কি হবেন ?

—বলো।···ভূপেন সকৌতুক দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, আপনি অধ্যাপক হবেন কোন কলেজে। আপনি পড়ানো ছাড়া অন্য কিছু কাজ করছেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।

ভূপেন মাথা নিচু করিযা একটা ঘাস ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিল, অধ্যাপকের কাজ পেলে আমিও আর কিছু চাই না, কিন্তু সে কি আর হবে ? কত এম-এ পাশ ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রোফেসারের চাকরি আর কটা। তা ছাড়া, আমার তেমন কেউ জানাশুনো লোকও নেই যে, তদ্বির ক'রে কোন কলেজে ঢুকিয়ে দেবে।

সন্ধ্যা আশ্বাস দিয়া কহিল, সে আপনি কিছু ভাববেন না মাস্টারমশাই, যাহোক ক'রে একটা উপায় হয়েই যাবে। না হয় আর একটা এম-এ পাশ দিয়ে নেবেন। ডবল এম-এ হ'লে অনেকটা জোর হবে না ?

ভূপেন তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীতে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, দেখা যাক।

সন্ধ্যা ঘাড় ন্যাড়িযা কহিল, না, না, ঐ কথাই ঠিক রইল ; অধ্যাপক আপনাকে হ'তেই হবে। আর কোন কাজ আমি করতে দেবো না।

ভূপেন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমরা বড় গরিব, সন্ধ্যা! বাংলা দেশে আমাদের মত গরিব, অথচ ভদ্রঘরের ছেলেরা যে কত অসহায় তা তুমি শুধু আজ নয়, কোনদিনই বুঝতে পারবে না। ইচ্ছে করলেই আমরা কিছু হ'তে পারি না। সমস্তটাই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

কথাটা তাহার বুঝিবার কথা নয়, তবু ভূপেনের কণ্ঠস্বরে সন্ধ্যা স্তব্ধ হইয়া গেল, আর জবাব দিতে পারিল না।

ভূপেনের ঐ কথাটা যে কি মর্মান্তিক সত্য, তাহা বোধ হয় বলিবার সময় নিজেও ঠিক বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে পারিল আরও মাস-কয়েক পরে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই একদিন।

দার্জিলিং হইতে নামিয়া যথারীতি সে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হইয়াছিল। ইদানীং মোহিতবাবু তাহাকে চল্লিশ টাকা বেতন দিতেন—একটা কেরানীর বেতন—সুতরাং বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভর্তি হইতে তাহার বাধে নাই। নিজের সব খরচ সে নিজেই চালায়, উপরন্তু সংসারেও কিছু দেয় বলিয়া তাহার বাবা আজকাল তাহাকে একটু সমীহ করিয়াই চলিতেন। কিন্তু মাস-কয়েক কাটিয়া যাইবার পর সহসা একদিন মোহিতবাবু তাহাকে নিজের অফিস-ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কহিলেন, দেখ বাবা, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আজ আলোচনা করব।

ভূপেন চুপ করিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কি কথা তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই, শুধু মোহিতবাবুর কণ্ঠস্বরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

মোহিতবাবু মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কথা দিতে হবে বাবা। হঠাৎ তুমি কোন জবাব দিও না, বা মন স্থির ক'রো না। আমি যা বলব মন দিয়ে শুনবে আর তার সব অর্থটা বোঝবার চেষ্টা করবে—এই আমার অনুরোধ। অর্থাৎ আমায় ভুল বুঝো না।…ঠিক ত?

ভূপেন একটু হাসিয়া জবাব দিল, আপনার অতি তুচ্ছ কথাও আমি মন দিয়ে শুনি, সুতরাং সেদিক দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ওটা আমার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে।

মোহিতবাবু তবুও যেন খানিকটা ইতস্তত করিয়া কহিলেন, কথাটা সন্ধ্যাকে নিয়েই। সন্ধ্যা পনেরো পূর্ণ হয়ে ষোলয় পড়েছে—এই গত আশ্বিন মাসে। ঠিক অতটা বয়স ওর দেখায় না বটে, কিন্তু আমাদের দেশের হিসেবে ওটা বিবেচনা-যোগ্য বয়স।…তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে মেয়েদের মন এই বয়সেই পরিণতির দিকে বা পরিণত ধারণার দিকে মোড় ফেরে—সুতরাং এই সময় থেকেই সাবধান হওয়া উচিত।

এই পর্যন্ত বলিয়া মোহিতবাবু আরও একবার চুপ করিলেন। তাঁহার বক্তব্যটা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভূপেনের বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সেও কথা কহিতে পারিল না।

মোহিতবাবু আবার শুরু করিলেন, সন্ধ্যা তোমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে তা আমি জানি, অত শ্রদ্ধা সে এখন আমাকেও করে কিনা সন্দেহ। সে শ্রদ্ধার সঙ্গে আছে স্নেহ মেশানো। যাক্—কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি যে আরও কিছু দিন গেলে সেটা অন্য দিকেও মোড় ফিরতে পারে। এবং সেটা আমি চাই না।

এই সংবাদ, এই আশঙ্কাটা ভূপেনের কাছে এতই অভাবনীয় যে, সে রীতিমত

একটা প্রবল বিস্ময়ের আঘাত অনুভব করিল। সন্ধ্যাকে অত অল্প বয়স হইতে দেখিয়াছে এবং তাহাদের সম্পর্কটা প্রথম হইতেই এমন একটা মধুর যে, সেখানে অন্য কোন গভীরতর সম্পর্কের সম্ভাবনাই তাহার কোন দিন মনে পড়ে নাই। সে কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করিল না, কেমন একটা আচ্ছন্নভাবে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মোহিতবাবু বলিয়াই চলিলেন, এই না-চাওয়ার একটা ইতিহাস আছে বাবা। তোমাকে আমি ভাল ছেলে বলেই জানি, তোমার উপর আমার অনেক আশা আছে। যদিও তোমরা ঠিক আমাদের পাল্‌টি ঘর নও, তবুও সে রকম প্রয়োজন হ'লে আমি তোমার হাতে তাকে তুলে দিতে একটুও ইতস্তত করতুম না, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। ওর মাকে আমি একটি সৎপাত্র দেখে গরিবের ঘরে দিয়েছিলুম—বোধ হয় সে কিছু দুঃখ পেয়েছিল তার ফলে।··· যাই হোক্, মরবার সময় আমাকে দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে তার মেয়েকে আমি যেন কখনও গরিবের ঘরে না দিই। এ কথাটা আমার কাছে অত্যন্ত লজ্জার—আমার সমস্ত ফিলজফীর বিরোধী এটা—কিন্তু তবু আমি তার কথাটাও ঠেলতে পারব না বাবা, বিশেষ ক'রে সে একটা কথা আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেছে—'আপনার মেয়েকে আপনি যেখানে খুশি দিয়েছিলেন, আমার মেয়েকে আমি তা দিতে দেবো না।'

মোহিতবাবু এই পর্যন্ত বলিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ করি কন্যার মৃত্যুশয্যার ছবিটাই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত করিয়া দিল।···মিনিট তিন-চার পরে যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলেন, আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেছো বাবা ?

এতক্ষণ পরে ভূপেন কথা কহিল, কিন্তু এ সম্ভাবনা যে একটুও আছে, তাই যে আমার মনে হয় না—

—সম্ভাবনা আছে কিনা জানি নে বাবা, আশংকা আছে। আর সেটা যখন আছে তখন আগে থাকতে সাবধান হওয়া ভাল নয়কি ? আজ যেটা অসম্ভব মনে হচ্ছে, কাল যদি সেটা সম্ভব হয়ে পড়ে, তখন ত আর ফেরাব পথ থাকবে না।

ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বেশ, আপনিই তাহ'লে বলুন কি করা উচিত ?

মোহিতবাবু বলিলেন, সন্ধ্যা যা পড়াশুনো করেছে তাতে এখন থেকে ও নিজেই পড়তে পারবে বলে মনে হয়—ও বলছিল, পরীক্ষাগুলো একে একে দিয়ে রাখতে চায়—কিন্তু সে ও নিজে নিজেই দিতে পারবে।···তবে একটা কথা, তোমার পরীক্ষাটাও দেওয়া দরকার। তোমার কথা তুমি সবই আমাকে বলেছ, সেই জন্যই সাহস ক'রে একটা অনুরোধ করছি—আর স্নেহেরও একটা অধিকার আছে, তোমার এম-এ পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত তোমার খরচ আমার কাছ থেকেই নিতে হবে।···তোমার উপর অনেক আশা আমার, মিথ্যা অভিমানের বশে নিজের কোন ক্ষতি ক'রো না, এই অনুরোধ।

মোহিতবাবুর কথা বলার ধরনে প্রথম হইতেই ভূপেন একটা বড় রকমের

আশঙ্কা করিতেছিল বটে, তবু আঘাতটার আকস্মিকতা তাহাকে কিছুকালের জন্য যেন জড় অনড় করিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে, প্রাণপণ চেষ্টায় কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক করিয়া কহিল, কিন্তু সেটা কি সম্ভব? আপনি এ অবস্থায় পড়লে কি এ ভিক্ষা নিতে পারতেন?

মোহিতবাবু মাথা নিচু করিয়া জবাব দিলেন, তুমি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছ বলে এত বড় কথাটা বললে বাবা, কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে, আমাদের ঠিক এতটা দূরত্ব আর নেই। বেশ, তুমি এই টাকাটা ঋণ বলেই নাও, এর পরে তোমার সময়মত শোধ দিও। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎটা মাটি ক'রো না।

শেষের কথাগুলি মোহিতবাবু কতকটা মিনতির সুরেই বলিলেন। ভূপেন ততক্ষণে নিজের রূঢ়তায় নিজেই একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সন্ধ্যাকে বলেছেন এ কথা?

মোহিতবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না। তাকে পরে বলব। সে আঘাত পাবে নিশ্চয়—কিন্তু আমার উপর তার বিশ্বাস আছে, সে আমাকে ভুল বুঝবে না।

ভূপেন হেঁট হয়ে তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, আমাকে মাপ করবেন। এ সমস্ত কথাগুলোই এত আকস্মিক আর অভাবনীয় যে আমি এখন কিছু ঠিক ক'রে ভাবতেই পারছি না।

মোহিতবাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি ভূপেনের মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, এই ভয়টাই এতদিন আমাকে পীড়া দিচ্ছিল যে তুমি আমাকে ভুল না বোঝো। তুমি এখন বাড়ি যাও, ভাল ক'রে সব ভেবে দ্যাখোগে! শুধু এইটে মনে রেখো যে, এখন যদি তুমি পড়াশুনো ছেড়ে দাও তাহ'লে আমার আত্মীয়বিয়োগের মতই তা প্রাণে লাগবে।

ভূপেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি সব কথা আর একবার আগাগোড়া না ভেবে আপনাকে কিছুই বলতে পারছি না।

সে আর অপেক্ষা করিল না। তাহার মানসিক জড়তা এখনও কাটে নাই বলিয়া আঘাতের তীব্রতাটা সে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই; কিন্তু একটা অপরিসীম দৈহিক দুর্বলতাতে পা দুইটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কোনমতে সিঁড়িটা পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়া সামনেই যে রিক্সাটা দেখিতে পাইল সেইটাতেই চড়িয়া বসিল। একটা ভয় ছিল, পাছে এই অবস্থাতে সন্ধ্যার সামনে পড়িতে হয় —কোন প্রকারের জবাবদিহি এবং পীড়াপীড়ির কথা তখন সে ভাবিতেই পারিতেছিল না,—কিন্তু দৈবক্রমে সে পরীক্ষায় আর তাহাকে পড়িতে হইল না।

॥ ৬ ॥

কোন্‌টা যে তাহার বড় আঘাত, সেইটা বুঝিতেই ভূপেনের অনেকক্ষণ সময় লাগিল। আর্থিক ক্ষতিটাও তাহার বর্তমান অবস্থাতে অনেকখানি সন্দেহ নাই এবং হয়ত সেজন্য তাহাকে, এই অসময়েই, ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন রূঢ়ভাবে ভাঙ্গিয়া দিয়া উন্নতির প্রথম অধ্যায়েই পূর্ণচ্ছেদ টানিতে হইবে। কারণ মোহিত-বাবু যত আত্মীয়তার দাবিই করুন, যেটা তিনি দিতে চাহিতেছেন সেটা দয়া ছাড়া

আর কিছু নয়, সে দান কোন অবস্থাতে, কোন বিবেচনাতেই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্ত তাহার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি সেই মুহূর্তে তাহার মনে হইতেছিল সন্ধ্যাকে হারানোটা। তাহার এই ছাত্রীটি নিঃশব্দে কখন যে ছাত্রীর পদ হইতে বন্ধুর আসনে চলিয়া আসিয়াছিল তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই, কিন্তু তাহাকে উপলক্ষ করিয়াই যে ভূপেন এতদিন নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছিল, এই-বার সেটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া গেল। মোহিতবাবু যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন, সেটা ভূপেনের কাছে অবিশ্বাস্য—সুদূর কল্পনারও অতীত! সন্ধ্যা বালিকা কি কিশোরী, সে কথা লইয়া মাথা ঘামানো দূরে থাক ভূপেন নিজের মনে বার বার শুধু এই কথাটাই অনুপস্থিত মোহিতবাবুকে বুঝাইতে চাহিল—সে পুরুষ কি নারী সেই তথ্যটাই সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল যে। সব চেয়ে—সে কেমন দেখিতে, ফর্সা না কালো, সুন্দরী না কুরূপা, এটাও ভূপেন কোনদিন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। সন্ধ্যা শুধু সন্ধ্যাই—সে তাহার ছাত্রী। তাহার কথা মনে হইলে শুধু তাহার সশ্রদ্ধ, একাগ্র চোখ দুটির কথা, শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার অসীম কৌতূহল ও একান্ত নিষ্ঠার কথাই মনে পড়ে। সন্ধ্যা সেই ছাত্রী, যাহার শ্রদ্ধা হারাইবার ভয়ে নিজেকে অনেক যত্নে প্রস্তুত করিতে হয়, রাত জাগিয়া মোটা মোটা বই পড়িতে হয়। যাহার অন্তরের মাধুর্য ও তপস্যা পবিত্র দীপশিখার মত জ্বলিয়া পুরুষের অন্তরকে সুদ্ধ দীপ্ত করিয়া তোলে।

ক্ষতির পরিমাণটা উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূপেন মোহিতবাবু সম্বন্ধে একটা প্রবল অভিমান ও ক্ষোভ অনুভব করিতে লাগিল। মোহিতবাবুকে সে শ্রদ্ধা ত করিতই, ভালও বাসিত। সেইজন্যই অভিমানটা তাহার এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাছাড়া, মানুষের যখন স্বার্থে আঘাত লাগে তখন অপর দিকটা সে কিছুতেই বিবেচনা করিতে পারে না! ভূপেনও, মোহিতবাবুর কথার মধ্যে যত যুক্তি যত আন্তরিকতাই থাক, তিনি যে নিতান্ত অকারণে তাহার প্রতি একটা গুরুতর অবিচার করিলেন, এ কথাটা না ভাবিয়া পারিল না।

তবে একট প্রতিজ্ঞা সে ইতিমধ্যেই মনে মনে করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার বেদনাবোধের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত মোহিতবাবুকে সে কোন উত্তর দিবে না। ···কিন্তু সেটা কমিতেও অনেকখানি সময় লাগিল। সে-রাত্রে ত সে ঘুমাইতে পারিলই না, পরের দিনও সমস্ত সকালটা পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইল; মনে মনে কেমন একটা অপরিসীম শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল সে—কি যেন তাহার হারাইয়া গিয়াছে, মূল্যবান কিছু, যা আর কোনদিন ফিরিয়া পাইবে না। অনেকক্ষণ, প্রায় বারটা পর্যন্ত এইভাবে ঘুরিয়া আসিয়া অবশেষে যখন জোর করিয়া সে স্নানাহার সারিয়া, পড়ার টেবিলের কাছে বসিল তখন সে অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে—বরং নিজের এই অপরিসীম চিত্ত-ক্ষোভের জন্য নিজের কাছেই যেন সে একটু লজ্জিত।

মোহিতবাবু তাহাকে অবশ্য একেবারে বাড়ি যাইতে নিষেধ করেন নাই, আজ হইতেই যে পড়ানো বন্ধ করিতে হইবে এমন কথাও বলেন নাই, তবু আর ও-বাড়ি যাওয়া যায় না। মোহিতবাবুকে যাহা বলিবার চিঠি দিয়াই জানাইতে হইবে।

সন্ধ্যা হয়ত তাহাকে আশা করিবে, কিন্তু আজ সেখানে গেলে তাহার সহিত দেখা করিয়া বিদায় লইয়া আসিতে হয়, অথচ কী-ই বা বলিবে তাহাকে। আর মোহিত-বাবু যে আশঙ্কা করিতেছেন যদি আলোচনা-প্রসঙ্গে সে কথার আভাসমাত্র সন্ধ্যার কাছে প্রকাশ পায় ত সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। তাছাড়া, কোনরূপ নাটকীয় বিদায় লইবার সম্পর্ক ত তাহাদের নয়—কোন পক্ষেই কিছু বলিবার নাই। ক্ষতি যেটুকু সেটুকু একান্ত অন্তরের, তাহা মনেই থাক।

সে প্যাড ও কলম লইয়া মোহিতবাবুকে চিঠি লিখিতে বসিল। 'শ্রীচরণেষু' পাঠ পর্যন্ত লিখিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। চিঠিতে কোন দুঃখ, কোন আবেগ না প্রকাশ পায। অথচ যে ভাষা প্রথমেই বাহির হইয়া আসিতে চায়, তাহা সবই অভিমানের। অতি কষ্টে, কঠোর শাসনে মনকে সংযত করিয়া সে লিখিল—শ্রীচরণেষু—

বাড়িতে আসিয়া আপনার কথাগুলি ভাল করিয়াই ভাবিয়া দেখিলাম। আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আপনার আন্তরিক স্নেহ এবং মহত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু স্নেহ স্নেহই—সেটা যখন আর্থিক মূল্যে পরিণত হয়, তখন সেটাকে আমরা দান বলিয়া মনে না করিয়া পারি না এবং সে দান গ্রহণ করিলে আপনার চোখে আমি খানিকটা ছোট হইয়া যাইবই—অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। সুতরাং আপনার স্নেহ যদি আজ মাথা পাতিয়া না লইতে পারি ত তাহাকে অকৃতজ্ঞতা বা স্পর্ধা বলিয়া মনে করিবেন না। বরং আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি যেন সর্বতোভাবে আপনার স্নেহের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারি। আমার মনে হয়, আমি যদি নিজের চেষ্টাতেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারি, তবেই আপনাদের স্নেহ ও আশীর্বাদের মর্যাদা থাকিবে। আপনি ক্ষুন্ন হইবেন না—আপনার কাছে আমার প্রতিজ্ঞা রহিল—যে এম-এ পাশ করা পর্যন্ত আপনি আমাকে আর্থিক সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন সে এম-এ পরীক্ষা আমি দিবই। তাহার জন্য যদি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয় তাহাও করিব।

কাল যে কথা-বার্তা হইয়াছে তাহার পর আর আপনার বাড়ি যাওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ডাকেই চিঠি দিলাম। এই সঙ্গে সন্ধ্যাকে একখানি চিঠি দিলাম, যদি বাধা না থাকে, তাহাকে দিবেন। প্রণাম লইবেন। ইতি—

প্রণত ভূপেন্দ্র

সন্ধ্যাকে চিঠি লিখিল সে তিন ছন্দে—

কল্যাণীয়াসু—

কোন কারণে তোমাকে পড়াতে যাওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। কারণটা দাদুর কাছ থেকেই শুনো। মন দিযে পড়াশুনো ক'রো—আর কারুর সাহায্য লাগবে বলে মনে হয় না। আমি যেখানেই থাকি, আমার আশীর্বাদ ও কল্যাণ-কামনা তোমাকে নিরন্তর ঘিরে থাকবে। ইতি—

মাস্টারমশাই

চিঠিখানা খামে মুড়িবার আগে, 'কারণটা দাদুর কাছ থেকেই শুনো' লাইনটা কাটিয়া দিল। থাক—সন্ধ্যা যদি তাহাকে অকৃতজ্ঞ, স্নেহহীন ভাবে সে-ও ভাল,

তবু কোন কদর্য সংশয়ের কালি তাহাকে যেন স্পর্শ না করে।

চিঠি সে নিজেই ডাকে দিয়া আসিল।

মুক্তি!

যত বেদনাদায়কই হোক্—মুক্তির একটা আনন্দ আছেই। চিঠি ডাকে দিয়া কতকটা সেই আনন্দেই ভূপেন যেন নিজেকে অনেকখানি হাল্কা বোধ করিল। সে উদ্দেশ্যহীনভাবে কলিকাতার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল, যাক্—বাঁচিলাম! কাল হইতে যে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ মনকে ভারী করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার হাত হইতে ত অন্তত অব্যাহতি পাইলাম। তা ছাড়া কৃতজ্ঞতা ও স্নেহের সহিত কর্তব্য মিশিয়া ক্রমশই ওখানে একটা বন্ধন দৃঢ় হইতেছিল, সেটার হাত হইতেও অব্যাহতি পাইলাম। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। এ এক রকম ভালই হইল।

কিন্তু খানিকটা ঘুরিবার পরই কেমন একটা অবসাদে পা দুইটা ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। বাড়ি ফিরিতে ইচ্ছা করে না কিন্তু পথে থাকা আরও অসম্ভব। কোথায় যেন কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, কি যেন এক শোচনীয় দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত চারিদিকের আবহাওয়ায়।...অবশেষে কতকটা নিজের উপর বিরক্ত হইয়াই বাড়ি ফিরিল।

বাড়ি ঢুকিতেই প্রথম দেখা হইল অবিনাশবাবুর সঙ্গে। কানে একটা আধপোড়া বিড়ি এবং হাতে পানের বোঁটায় চুন—ব্যস্তভাবে কোথায় যাইতেছিলেন, ভূপেনকে দেখিয়াই কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া কহিলেন, কি বাবাজী, এমন সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরলে যে! তোমার সেই টিউশনি নেই? বড়লোকের মেয়ে, গেঁথেছ মন্দ নয়—এখন খেলিয়ে তুলতে পারলে হয়!

সাধারণতঃ অবিনাশবাবুর কথায় কান দিত না ভূপেন, লোকটির কথার ভঙ্গিতে সর্বদা এমন একটা নোংরামির ইঙ্গিত থাকে যে তাঁহাকে দেখিলেই তাহার গা ঘিন্ ঘিন্ করিত। কিন্তু সেদিন পাশ কাটাইতে গিয়াও তাহার মনে পড়িয়া গেল যে এই লোকটির হাতে ছোটখাটো বিস্তর টিউশনি থাকে—সে কোনমতে ঢোক গিলিয়া বলিয়া ফেলিল, সে টিউশনি ছেড়ে দিয়েছি—আমাকে—আমাকে আর একটা দেখে দিতে পারেন?

খানিকটা তাহার মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিবার পর অত্যন্ত অর্থপূর্ণ একটা হাসিতে অবিনাশবাবুর মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, ছেড়েছ না ছাড়িয়েছে? ও আমি আগেই জানতুম বাবাজী, বাঙালীর ছেলে মেয়েমানুষ দেখেছে কি অমনি এমন বাড়াবাড়ি শুরু ক'রে দেয়...যাক, দুঃখ ক'রো না, ও অমন হয়েই থাকে। মোদ্দা, এত দিন রা..স্ব ক'রে এসে এখন কি আমাদের এই আট-দশ টাকার টিউশনি করতে পারবে?

অবিনাশবাবু যতটা বলিলেন তাহার চেয়ে ঢের বেশী কদর্যতা প্রকাশ পাইল তাঁহার মুখভঙ্গীতে। সেদিকে চাহিয়া রাগে ভূপেনের সর্বদেহ জ্বলিয়া গেল, সে তাঁহার কথার উত্তর না দিয়াই উপরে উঠিতে শুরু করিল। কিন্তু অপরের সৌজন্যের অভাবে উৎসাহ কমিবে অবিনাশবাবু তেমন লোক নন—উপরে

পেঁাছিয়াও ভূপেনের কানে গেল অবিনাশবাবু বাঙালীর ছেলের নৈতিক চরিত্রের উপর বক্তৃতা করিতেছেন।

ঝোঁকের মাথায় কথাটা তাঁহাকে বলার জন্য ভূপেনের অনুতাপের সীমা রহিল না। সবচেয়ে বেশী ভয় তাহার বাবাকে, অবিনাশবাবু প্রথমেই তাঁহাকে সংবাদটা দিবেন। এবং টীকা-ভাষ্য সমেত দিবেন। অথচ আবার সেই অবিনাশবাবুর আট টাকার টিউশানি করা কি সত্যই সম্ভব? ভূপেন আপন মনেই মাথা নাড়িল, না, আর তা সম্ভব নয়।

সে যখন উপরে আসিল তখন মা রান্নাঘরে বিষম ব্যস্ত; কেন সে আজ পড়াইতে গেল না, সে কৈফিয়ত চাহিবার সময় সেটা নয়। আপাতত জবাবদিহির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। এটি তাহার নিজস্ব ঘর, মোহিতবাবুর কৃপায় এত বড় বিলাসও তাহার সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু এখন—

একটু পরেই বাবা ফিরিলেন। অফিস হইতে ফিরিবার সময় প্রত্যহই বাজার হইয়া আসেন—আজও সেই পুঁটলিটি হাতে ছিল কিন্তু আজ সোজা রান্নাঘরে না গিয়া তিনি পুঁটলি সমেত এ ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে, তোর টিউশানিটা নাকি গেছে?

অর্থাৎ অবিনাশবাবু ইতিমধ্যেই তাঁহার কাজ সারিয়াছেন। বাবার প্রশ্ন করিবার ধরনে ভূপেনের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, তবু কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, হ্যাঁ, আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—বেশ করেছ! কণ্ঠে তাঁহার বিরক্তি আর চাপা রহিল না।—আজকালের বাজারে অমন একটা টিউশানি পাওয়া কি সোজা কথা! এখন খরচ চলবে কিসে শুনি?

এতক্ষণের সঞ্চিত সমস্ত ক্ষোভ এখন বাবার উপরই গিয়া পড়িল, সে তিক্ত কণ্ঠে কহিল, সে ভাবনায় আপনার দরকার কি বাবা, এ টিউশানি কি আপনি যোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন?

উত্তরটাতে দমিয়া গেলেও উপেনবাবু হাল ছাড়িলেন না, গলার স্বর যতটা সম্ভব আহত শোনাইবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, একসঙ্গে থাকতে গেলেই দুটো একটা কথা কইতে হয়, তা ছেলের মেজাজ দেখ না। তবু যদি চার চালের ভার নিতে। সংসার করতে হয় না বলেই অত মেজাজ রাখতে পেরেছ, সংসারের ভার ঘাড়ে পড়লে বুঝতে!...ঐ মেজাজের জন্যই ত সব গেল—টিউশানি হ'ল চাকর-মনিব সম্পর্ক, চাকরি যেখানে করতে হবে—সেখানে কি মান-অভিমান রাখতে গেলে চলে, মন যুগিয়ে চলতেই হবে। ঐ যে কথায় বলে না—

ভূপেন বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া আবার জামাটা টানিয়া লইল। উপেন-বাবুকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি এখন সহজে থামিবেন না। অথচ তাহার বর্তমান মানসিক অবস্থায় ধৈর্য রাখাও কঠিন। সে জুতা পরিতেছে দেখিয়া উপেনবাবু রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াইলেন, কিন্তু বক্তৃতা তখনও তাঁহার থামে নাই, তিনি চলিতে চলিতেই বাড়িসুদ্ধ লোককে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, ঐ

জন্যেই তখন বলেছিলুম যে, বি-এ পাস করলি, এইবার চাকরিতে ঢুকে পড়্। তখনও গস্ সাহেব ছিল, অনায়াসে ঢোকানো যেত—চাই কি এতদিনে এক বছর হয়ে গিয়ে একটা ইন্‌ক্রিমেণ্ট পেতিস। সেই চাকরিই যখন করতে হবে, তখন মিছিমিছি এম-এ পাস ক'রে সময় নষ্ট করবার কি দরকার বুঝি নে—

ভূপেন দ্রুতগতিতে সিঁড়ি কটা পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু বাবার শেষ কথাগুলা তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল, তাহাদের জ্বালা হইতে সে অত সহজে অব্যাহতি পাইল না। 'চাকরিই যখন করতে হবে' —সত্যই ত, আর কি আশা তাহার আছে ? এম-এ পাস করিয়াই বা কি তাহার হাত-পা গজাইবে, কোন্ পথ তাহার সামনে খোলা পাইবে সে! এত দিন বড়লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করার ফলেই এই অনিষ্টটি হইয়াছে তাহার, নিজের অবস্থার কথা যেন ভুলিয়াই গিয়াছে। কোথা দিয়া কি করিয়া যেন ইদানীং তাহার একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, এম-এ পাস করিবার পরও শিক্ষার পথ তাহার কাছে বন্ধ হইয়া যাইবে না, সাধনা চলিবে অব্যাহত গতিতে। ···হায় রে!

ভূপেনের হাসি পাইল। কত আশা তাহার!···গরীব হইয়া নিজের অবস্থার কথা ভুলিয়া যাওয়ার মত অপরাধ আর নাই।···না, মোহ যখন তাহার ঘুচিয়াছেই, তখন আর বৃথা আশার পিছনে দৌড়াইয়া সময় নষ্ট করিবে না। ভূপেন যেন একবার নিজেকে একটু নাড়া দিয়া প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিল—এম-এ পড়া থাক, চাকরির চেষ্টা দেখাই ভাল।

সে ঘুরিতে ঘুরিতে হেদোতে আসিয়া অবসন্নভাবে একটি বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল। চাকরি করাই উচিত, কিন্তু তবু—সে আজই মোহিতবাবুকে কথা দিয়াছে যে সে এম-এ পাস করিবেই। তাছাড়া সন্ধ্যা—সন্ধ্যা বড় দুঃখ পাইবে। সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে শুনিলে তাহার দৃষ্টিতে যে বেদনা ফুটিয়া উঠিবে, কল্পনায় তাহার আভাসমাত্র পাইয়াই ভূপেন অস্থির হইয়া উঠিল। অথচ উপায়ই বা কি, বাবার যা আয় তাহাতে সংসারই চলে না, পড়ার খরচ সেখান হইতে আশা করা বৃথা। টিউশনি করিবে? ইতিপূর্বেকার ছোট ছোট টিউশনির যে তীব্র অভিজ্ঞতা ভূপেনের ছিল, মানসচক্ষে তাহার ছবিটা মনে করিবার চেষ্টা করিতেই সে শিহরিয়া উঠিল। না, তখন যাহা সম্ভব ছিল এখন আর তাহা নাই। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীই তাহার বদলাইয়া গিয়াছে—সে অপমান, শিক্ষার সে অমর্যাদা আর সহিতে পারিবে না।

কিন্তু চাকরিই বা কোথায়? কি কাজ পাইবে সে? বাবার সেই সওদাগরী অফিসে হয়ত এখনও একটা কেরানীগিরি মিলিতে পারে—হয়ত বাবা চেষ্টা করিলে সেটা যোগাড় করা এমন কিছু কঠিন হইবে না। কিন্তু এই জন্যই কি সে এত লেখাপড়া শিখিল? বছরের পর বছর সেই একই চেয়ারে বসিয়া ঘাড় গুঁজিয়া কাজ করিয়া যাওয়া, এবং বয়স ও সম্পর্ক-নির্বিশেষে অশ্লীল রসিকতা করা? পঁয়তাল্লিশ টাকা হইতে শুরু, মরিবার বয়সে একশ পনের টাকায় অব্যাহতি, সব ক্ষেত্রে তাও নয়। এই ত সে চাকরির মূল্য!

ভূপেন আর একবার শিহরিয়া উঠিল। তার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল।

মনে পড়িল সন্ধ্যার কথা, তাহার ইচ্ছা ছিল—ভূপেন অধ্যাপকের কাজ করে। দার্জিলিং-এর সেই নিভৃত বেঞ্চিতে বসিয়া বলা কথাগুলো যেন আজও কানে বাজিতেছিল, 'আপনি আর কিছু করছেন, এ আমি ভাবতেই পারি না !'

হতাশা ও ক্ষোভে ভূপেনের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল ; অধ্যাপকের পদ পাওয়ার কল্পনা পর্যন্ত তাহার কাছে হাস্যকর। প্রথমত এম-এ পাস করার সমস্যা, দ্বিতীয়ত শুধু এম-এ পাস করিয়া প্রোফেসারী করিতে ঢুকিবার আগে অনেকগুলি মুরুব্বির প্রয়োজন হয়। সে মুরুব্বি তাহার নাই। না, ও-সব কথা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।

ভূপেন জোর করিয়া উঠিয়া পড়িল। গরীব কেরানীর ছেলে সে—স্বপ্ন দেখার সময় নাই।…কিন্তু সে আজই মোহিতবাবুকে সদম্ভে চিঠি দিয়াছে, তাঁহার সাহায্য ছাড়াও সে এম-এ পরীক্ষা দিবে, সে কি এতই ভুয়া, একান্ত অন্তঃসার-শূন্য ?…একটা উপায় আছে প্রাইভেটে দেওয়া—কিন্তু সওদাগরী অফিসের চাকরির সহিত শিক্ষার সাধনা—এ কি সম্ভব !…তা ছাড়া, অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন ছাড়া আর কিছু করিতেছে, এ কথা আজ যেন সেও ভাবিতে পারে না।…টিউশনি ছাড়া অন্য কোন রকমে শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা যায় না।

অকস্মাৎ তাহার চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল। ঠিক ত—ইস্কুল মাস্টারী ত সে অনায়াসে করিতে পারে। তাহার অনার্স-এর এটুকু মূল্যও কি মিলিবে না ? বাংলা দেশের ইস্কুল-মাস্টারীর বেতন সামান্য—কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের খরচা ত চলিবে !…তা ছাড়া সেক্ষেত্রে এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অবসর বেশী, পড়াশুনার সময় পাওয়া যায়। তাতেও যদি সে নিজের উন্নতি করিতে না পারে ত সেটা তাহার নিজেরই অক্ষমতা।

ভূপেন বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে মন স্থির করিয়া ফেলিল—ইস্কুল মাস্টারীর চেষ্টাই দেখিবে সে, 'তাই হোক সন্ধ্যা—তোমার চোখে আমি কিছুতেই ছোট হবো না !'

পরের দিন সকালবেলাই সে পাড়ার লাইব্রেরীতে গিয়া ইংরেজী বাংলা সংবাদ-পত্রগুলির কর্মখালির পৃষ্ঠা খুলিয়া বসিল। ইস্কুল মাস্টারী খালি হওয়ার সময় সেটা নয়, সুতরাং বিজ্ঞাপন অল্পই থাকে। তবু সব কয়টা কাগজ খুঁজিয়া দশ-বারোটা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিল। এমনিভাবে প্রত্যহ ঘণ্টা-দুই বিজ্ঞাপন ঘাঁটিয়া তিন দিনে প্রায় গোটা-চল্লিশেক দরখাস্ত ছাড়িয়া সে কতকটা সুস্থ হইল। বলা বাহুল্য, ইহার সব কয়টিই মফস্বলের ইস্কুল। কলিকাতার কোন ইস্কুলের বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল না, পড়িলেও সে দরখাস্ত করিত না—কারণ, কলিকাতা সে ছাড়িতেই চায়। ছিল দুটো একটা শহরতলীর ইস্কুল, কিন্তু সেও সেই এক কথা। সেখানে মাস্টারী করিলে বাড়ি ছাড়ার কোন অজুহাত থাকিবে না, মিছামিছি ট্রামে-বাসে কতকগুলি বাড়তি পয়সা ও সময় নষ্ট হইবে।

না, কলিকাতায় থাকা তার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। এখানে সময় নষ্ট হইবার অজস্র ফাঁদ পাতা আছে চারিদিকে, চাকরি করিয়া নিজের পড়াশুনা করা প্রায়

দুঃসাধ্য। তাহার উপর বাড়ির আবহাওয়াও তাহার বর্তমান মানসিক অবস্থায় অসহ্য। ইস্কুল-কলেজ ছাড়া পড়িবার কথা তাহারা চিন্তা করিতে পারে না, সুতরাং এখন তাহার পড়াশুনার সময় যেটুকু সমীহ করে, তখন সেটুকু থাকিবে না। তাহার উপর এই স্কুল-মাস্টারীতে তাহার বাবা যে ঘোরতর আপত্তি করিবেন, এ বিষয়ে ভূপেনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না—প্রতিদিনই কানের কাছে শোনাইবেন যে, চাকরি যদি করিতেই হয় ত সাহেবের চাকরিই করা উচিত। তাঁহার কথা অমান্য করিয়া সে যে বড়লোকের ভরসায় এম-এ পড়িতে গিয়াছিল, সে অপরাধ তিনি কোন দিনই ক্ষমা করেন নাই—সুযোগ পাইয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপে এই কয় দিনেই তাহাকে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছেন। এখন তবু অনেকটা সময় সে বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া আসে কিন্তু বারো মাস ত আর সেটা সম্ভব নয়, আর তাহা হইলে পড়াশুনাই বা সে করিবে কখন ? তার চেয়ে যত দূর পল্লীগ্রামে চলিয়া যাইতে পারে ততই ভাল। এখানকার এই সব হৃদয়হীন বিরক্তিকর আক্রমণ সেখানে পেঁছিবে না—বড় জোর কয়েকদিন অন্তর দু-একটা চিঠি সেটা তত অসহ্য হইবে না।

দরখাস্ত পাঠাইয়া সে যেন প্রতিটি মুহূর্ত গণিতে লাগিল। চাকরির দরখাস্তের কি ফল হয় তাহা অনেকের মুখেই শুনিয়াছে, তবে এক্ষেত্রে ভরসা এই যে, মফস্বলের ইস্কুল-মাস্টারী নিতান্ত নিরুপায় না হইলে কেহ করিতে চায় না। চল্লিশ বিয়াল্লিশটা দরখাস্তের মধ্যে একটা অন্তত কোথাও লাগিয়া যাইবে—এ ভরসা তাহার ছিল। দিন যেন আর কাটে না, ইউনিভারসিটি যাওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে ; এম-এ পড়া যখন কিছুতেই সম্ভব হইবে না তখন শুধু মায়া বাড়াইয়া লাভ কি ? কি-ই বা বলিবে সে সহপাঠীদের ? তাহাদের সেই নিশ্চিন্ত কল-কোলাহলের মধ্যে তাহার আশাভঙ্গের বেদনা অধিকতর আঘাত পাইবে ; এই মাত্র। ও সংস্রব ত্যাগ করাই ভাল। দুই-একটি বন্ধু হয়ত খুঁজিবে, হয়ত তাহার এই আকস্মিক অন্তর্ধানে বিস্ময় প্রকাশ করিবে, তাহার পর একেবারে ভুলিয়া যাইবে—তাহার পরিণতি বা পরিণাম লইয়া কেহই বেশী মাথা ঘামাইবে না।··· সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আবার যদি কোন দিন ওদের যোগ্য হয়ে এসে দাঁড়াতে পারি তবেই দেখা দেব, নইলে এই ভাল। বড় জোর ভাববে আমি বকে গেছি কিংবা মরেই গেছি।

দীর্ঘ দিন এবং দীর্ঘ রাত্রি। সকালবেলা কাটে লাইব্রেরীতে, বাবা অফিসে চলিয়া গেলে বাড়ি ফেরে—তাহার পর লম্বা দিবা-নিদ্রা দিয়া আবার সন্ধ্যার পূর্বেই বাহির হইয়া পড়ে, রাত্রি গভীর হইবার আগে আর বাড়ি আসে না! কিন্তু সে-ও বিপদ কম নয়, কলেজ স্কোয়ার, ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি পরিচিত ও প্রিয় জায়গাগুলি তাহাকে এড়াইয়া চলিতে হয়, পাছে কোন চেনা লোক বা সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়। অপেক্ষাকৃত নির্জন এবং দূরে কোন একটা পার্কে চুপ করিয়া বসিয়াই বেশীর ভাগ সময় কাটায় সে। এ নিষ্ক্রিয়তা তাহার অসহ্য লাগে, অথচ কোন উপায়ও খুঁজিয়া পায় না।

সন্ধ্যার কথা তাহার প্রতি মুহূর্তেই মনে পড়ে। মনে হয় সে তাহার সহিত

সম্পর্ক ছিন্ন হইবার আগে যদি এমন কোন দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িত, তাহা হইলে বোধ হয় এতটা দুঃখ ভোগ করিতে হইত না—তাহার কাছে সান্ত্বনা মিলিত অতি সহজে। শুধু তাহার সাহচর্যই ত একটা মস্ত সান্ত্বনা। এই মুহূর্তে সে যদি সন্ধ্যার কাছে বসিয়া আবার আগেকার মত সাহিত্য বা অন্য লেখা-পড়ার কথা আলোচনা করিতে পাইত, তাহা হইলেই এই সমস্ত বেদনা, সমস্ত গ্লানির আর চিহ্নমাত্র থাকিত না তাহার মনে।

একটা কথা তাহার মনে হয় সব চেয়ে বেশী—একটা কৌতূহল। আচ্ছা, সন্ধ্যাও কি তাহার অভাব অনুভব করে? প্রশ্ন জাগে বার বার—বার বারই সে নিজের অন্তরের মধ্যে উত্তর খুঁজিয়া পায়। সন্ধ্যার সেই সশ্রদ্ধ জ্ঞানপিপাসু চোখ দুইটি—ভূপেনের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, উদ্বেগ এবং প্রীতি যেন সে দুইটি চোখে ভরিয়া থাকিত। না, সে এত সহজে ভূপেনকে ভুলিয়া যাইবে না। সেই আশ্বাস-বাক্যটিই তাহার এই অপরিসীম নৈরাশ্যের মধ্যে যেন তাহাকে বাঁচিবার পাথেয় যোগায়।

তৃতীয় দিন ডাকে দুইখানি চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। দুটি হস্তাক্ষরই তাহার পরিচিত। একটি সন্ধ্যার, আর একটি মোহিতবাবুর।

প্রথমেই সে সন্ধ্যার চিঠিটা খুলিল। সে লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,—

আপনার চিঠি পেলাম দাদুর হাতে। কেন যে আপনি সহসা আমাদের ত্যাগ করলেন তা বুঝতে পারলাম না। সেদিন দাদুর সঙ্গে কথা কইবার পর সেই যে আপনি চলে গেলেন আর এলেন না, তাতে শুধু এইটে অনুমান করতে পেরেছিলাম যে, সেই আলোচনার সঙ্গেই আপনার অনুপস্থিতির যোগাযোগ আছে। আজ দাদু আপনার চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, গিন্নিভাই, দোষ আমারই —ভূপেন খুব আঘাত পেয়েছে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো আমার অন্য উপায় ছিল না!—কি কারণ, কেন আপনি আঘাত পেলেন তা জানি না, জানবার অধিকারও হয়ত আমার নেই। তবে দাদু যে কখনও কারুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবেন না, এটা আমি জানি। অথচ আপনাকেও জানি, আপনিও অকারণে অভিমান করবেন কেন? এ সমস্যা আমার সাধ্যাতীত—তা নিয়ে মাথাও ঘামাবো না। কারণ যা-ই হোক—আপনাকে হারাতে হ'ল এইটাই আমার কাছে বড় কথা। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোন দিনই ঘুচে যাবার নয়—যেটুকু আজ জেনেছি, শিখেছি তা আপনারই জন্যে, এটা আপনিও কোন দিন ভুলতে পারবেন না; আর এইজন্যেই আমার ভরসা আছে যে আমার প্রতি আপনার স্নেহও কোন দিন যাবে না। যেখানেই থাকুন—আমি জানি আপনার স্নেহ ও আশীর্বাদ আমি পাবো। আপনি যখন খুব বড় হবেন, খুব বড় পণ্ডিত বলে দেশবিদেশে আপনার খ্যাতি যখন ছড়িয়ে পড়বে—তখন আর সব কথা ভুলে যান ক্ষতি নেই, শুধু এইটে মনে রাখবেন যে সেদিন আর কেউ-ই আমার চেয়ে বেশী খুশী হবে না। আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা মাস্টারমশাই, আমার সে আশা পূর্ণ হবে তাও আমি জানি।

আপনি দেখা আর না দিতে চান দেবেন না, কিন্তু চিঠি দেবেন ত ?
আমার শত কোটি প্রণাম নেবেন। ইতি—

আপনার সন্ধ্যা

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে ভূপেনের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল। সে নিজের মনকে বার বার এই বলিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল যে, আর তাহার কোন দুঃখ নাই, অন্তর ভরিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার এই শ্রদ্ধা এবং প্রীতিটুকুই তাহার সমস্ত বেদনাকে নিঃশেষে মুছিয়া লইয়াছে ; কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত একটা অপরিসীম ক্ষতিবোধই মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহার চক্ষুকে সজল করিয়া তুলিল।

মোহিতবাবু লিখিয়াছেন—

কল্যাণীয়বরেষু—

তোমার চিঠি পড়িয়া, তুমি যে আমাকে ভুল বুঝিয়াছ সেজন্য যেমন দুঃখিত হইলাম, তেমনি আমি যে তোমাকে ভুল বুঝি নাই এজন্য একটু গর্ব বোধ না করিয়াও পারিলাম না। তুমি যে আত্মসম্মান-বোধের পরিচয় দিয়াছ তাহা তোমারই উপযুক্ত হইয়াছে এবং এখন আর স্বীকার করিতে বাধা নাই, আমি তাহা তোমার কাছে আশাই করিয়াছিলাম। আশীর্বাদ করি, তুমি জয়ী হও, যশস্বী হও—তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হউক। তবে একটা অনুরোধ, যদি কখনও ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় তখন অন্তত যেন এই বৃদ্ধের কথা আগে মনে পড়ে। আর্থিক সাহায্য ছাড়াও অন্য কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে, তখন আমাকে ক্ষমা করিবার চেষ্টা করিও, তখন যদি অভিমান করিয়া দূরে রাখো তাহা হইলে ক্ষুণ্ণ হইব। মধ্যে মধ্যে পত্র দিও। ইতি—

আশীর্বাদক—তোমার দাদু

চিঠিখানা বার-দুই পড়িবার পর পুনরায় খামে মুড়িয়া রাখিয়া ভূপেন স্থির হইয়া বসিল। হয়ত সে মোহিতবাবুকে ভুলই বুঝিয়াছে কিন্তু তাঁহার দান প্রত্যাখ্যান করিয়া ভুল যে করে নাই, তাহারও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল।··· এই পরিবারটির প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং—যে স্নেহ স্নেহাস্পদের সম্বন্ধে অনেক আশা পোষণ করে—সেই সত্যকার স্নেহের পরিচয় সে বার বার পাইয়াছে, আজও একবার পাইল। বোধ হয় এই জন্যই ক্ষতিবোধ তাহার এত প্রবল, এই জন্যই তাহার বেদনার পরিমাণ এত বেশী। তবু এইটিই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হইয়া রহিল, জীবন-যুদ্ধের রহিল প্রধান অস্ত্র।

সন্ধ্যার খোলা চিঠিখানা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া আর একবার সে মনে মনে বলিয়া উঠিল, তাই হবে সন্ধ্যা, আমি তোমার জন্যই বড় হবো। নিশ্চয়ই বড় হবো, তুমি দেখে নিও।···

দিন পাঁচ-ছয় প্রতীক্ষা করার পর যখন চিত্ত তাহার ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে, যখন হতাশ হইবার আর খুব বেশী দেরি নাই, তখন হঠাৎ একদিন সকালে খান-দুই চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। একটি আসিয়াছে কোন্ এম-ই বা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে—ইঁহারা বিজ্ঞাপনে মাহিনার কথা জানান নাই, এখন তাহাকে ঐ পদে বহাল করিয়া জানাইয়াছেন যে, আপাতত কুড়ি টাকার বেশী

বেতন দিতে পারিবেন না। আর একটি—বীরভূম জেলার এক গ্রাম্য হাই স্কুল হইতে আসিয়াছে, তাহার নিয়োগপত্রে লেখা আছে মাসিক পঞ্চান্ন টাকা বেতনে তাহাকে চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইল : কিন্তু সেই খামের মধ্যেই এক ব্যক্তিগত চিঠিতে হেডমাস্টার মহাশয় জানাইয়াছেন যে, খাতায় কলমে পঞ্চান্ন টাকা থাকিলেও আসল মাহিনা তাহার তেতাল্লিশ টাকা আট আনা, সে যেন কোনরূপ ভুল বুঝিয়া না আসে। এখানে প্রাইভেট টিউশনিরও কোন সম্ভাবনা নাই—অপেক্ষাকৃত যাহাদের অবস্থা ভাল তাহাদের লইয়া একটি কোচিং ক্লাস মত আছে, কিন্তু সে-সবই পুরাতন শিক্ষকরা দখল করিয়া আছেন। সে যদি হোস্টেলেই থাকিতে চায় তাহা হইলে মাসিক চার টাকা খরচ পড়িবে থাকা এবং খাওয়ার। ইত্যাদি—

এদেশে মাস্টারীর মাহিনা খুবই কম—এ কথাটা আরও অনেকের মুখে ভূপেন শুনিয়াছিল ; সুতরাং তেতাল্লিশ টাকা আট আনাতে সে ভয় পাইল না। বরং সে হয়ত আরও কমই আশা করিয়াছিল। কিন্তু হোস্টেল চার্জ-এর পরিমাণ দেখিয়া সে বিস্মিত না হইয়া পারিল না। চার টাকায় খাওয়া ও থাকা ? সে কেমন দেশ !

সেই দিনই সে সেক্রেটারীর নামে ইংরেজীতে একখানি এবং হেডমাস্টার মহাশয়ের নামে বাংলায় একখানি চিঠি লিখিয়া ছাড়িয়া দিল। দুজনকেই জানাইল দিন-আষ্টেকের মধ্যে সে ওখানে পেঁছিবে।

বাড়িতে এতদিন সে কিছুই বলে নাই। কথাটা শুনিলেই একটা চেঁচামেচি, এমন কি কান্নাকাটি পড়িয়া যাইবে। সব চেয়ে বিপদ বাবাকে লইয়া, মুখে তিনি যাহাই বলুন, সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে স্নেহ তিনি যে তাহাকেই করেন তা ভূপেন জানে। আশা ভরসা সবই তাঁহার এই একমাত্র পুত্র-সন্তানটির উপর। এ ক্ষেত্রে কথাটা কি করিয়া পাড়া যায় সেইটাই হইল বড় সমস্যা। অনেকক্ষণ ভাবিবার পর সে সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়টাই বাছিয়া লইল। সন্ধ্যার পূর্বেই সংবাদটা মাকে জানাইয়া, তিনি প্রাথমিক স্তম্ভিত ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার আগেই বাহির হইয়া পড়িল এবং ফিরিল রাত্রি এগারোটার পরে।

কিন্তু বাড়িতে পা দিয়াই সে বুঝিল ঝড় তখনও কাটে নাই। বাবা তখনও চিৎকার করিতেছেন, নিচের তলার অবিনাশবাবুরা সকলে উপরে বসিয়া জটলা করিতেছেন আর মায়ের অবস্থা বর্ণনা না করাই ভাল। তাহাকে দেখিয়া বাবা গলাটা আর এক পর্দা চড়াইয়া দিলেন। সেই সুদূর বীরভূম, ম্যালেরিয়া-জলকষ্ট-মহামারীর দেশ, সেইখানে সে সামান্য কয়টা টাকার জন্য যাইতেছে ইস্কুল-মাস্টারী করিতে ? কেন, তিনি কি মরিয়া গিয়াছেন ? না হয় গস্ সাহেব নাই, তাই বলিয়া তাঁহার এতদিনের সার্ভিসের কি কোন মূল্য পাওয়া যাইবে না ? তিনি যে এখনও মরা-হাতী লাখ টাকা। নিজের ছেলে গিয়া দাঁড়াইলে বিশেষত যে ছেলে গ্র্যাজুয়েট, এখনও তিনি পঁয়তাল্লিশ টাকায় ঢুকাইয়া দিতে পারেন যে-কোনদিন। তারপর ইনক্রিমেণ্ট ? সে তো তাঁহাদেরই হাতে, তা-ছাড়া যদি দুইটা বৎসর তিনি বাঁচিয়া থাকেন, মাহিনা যা-ই বাড়ুক, বিল সেকশানে তিনি

যেমন করিয়াই হউক ঢুকাইয়া দিবেন তাহাকে—তারপর আর ভাবনা কি ? হাজার টাকার বিলে দশটা টাকা করিয়া লইলেও মাস গেলে যেমন করিয়া হউক উপরি দুশটি টাকা পকেটে আসিবে। ঐ করিয়া পুলিনদা' কলিকাতাতে দুইখানা বাড়িই কিনিলেন, মাহিনা ত পান মাত্র দেড়শ টাকা ! ইত্যাদি—

অনেকক্ষণ ধরিয়া এক নিঃশ্বাসে বকিয়া যাইবার পর, বোধ করি দম লইবার জন্যই উপেনবাবু চুপ করিলেন। বিরক্তিতে ভূপেনের মুখঅন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, একে সে নিজের অন্তরের দ্বন্দ্বে ক্লান্ত, তাহার উপর বাবার অফিসের এই মহিমা সে বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে। তবু সে নিজেকে সংযত রাখিয়াই কহিল, চাকরি আমার ভাল লাগে না বাবা, সে ত আপনি জানেন !

উপেনবাবু একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, তা ভাল লাগবে কেন ? ইস্কুল মাস্টারীটা চাকরি নয়—না ? ওরে হাজার হোক এ হ'ল সাহেবের চাকরি, এর কত সুবিধে। আর সে দেখবে হাজারটা মনিব। এই ত আমাদের অফিসের প্রাণকেষ্ট, এম-এ পাস করে মাস্টারী করতে ঢুকেছিল। বড় ইস্কুল, মাইনেও পাচ্ছিল ভাল—দুটি বছর যেতে না যেতে পালিয়ে আসতে পথ পেলে না। পাঁচ টাকা কম মাইনেতেই আমাদের অফিসে এসে ঢুকল। বলে, দাদা এ ঢের ভাল। সেখানে সেই সেক্রেটারী থেকে, ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার থেকে হেড মাস্টার এস্তক পঞ্চাশটা মনিব—সে সহ্য হয় না। তা ছাড়া, যদি মাস্টারীই করতে হয় ত এখানে চেষ্টা কর, সেই ধাপধাড়া গোবিন্দপুর না গেলে হয় না।

অবিনাশবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছিলেন, এইবার তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন, দ্যাখো বাবাজী, একটা কথা শুনে রাখো, আমার বয়স ঢের হয়েছে, অনেক দেখলুম—বিলেতের খবর জানি না অবিশ্যি, কিন্তু এখানে ইস্কুল-মাস্টারদের লোকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। মাস্টার শুনলেই সবাই মুখ টিপে হাসে—ঠাট্টা করে। আমাদের দেশে ফার্স্ট-ক্লাস লোক যারা তারা ব্যবসা করে কিংবা সিভিলিয়ান বা উকিল-ব্যারিস্টার হয়, সেকেন্ড-ক্লাস লোক হয় ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার, থার্ড-ক্লাস লোক চাকরি করে, ফোর্থ-ক্লাস লোক প্রফেসার হয় আর যাদের কিছু জোটে না তারাই যায় মাস্টারী করতে।...তুমি বাবাজী কোন্ দুঃখে মাস্টারী করতে যাবে ? তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার উন্নতির কত পথ খোলা।

এবার আর ভূপেন বিরক্তি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠেই কহিল,—আমি ত আর চিরকালের জন্য মাস্টারী করতে যাচ্ছি না—আপনারা এতই বা উতলা হচ্ছেন কেন ? চাকরিতে ঢুকলে আমার এম-এ পাস করার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না, লেখা-পড়ার আশা চিরকালের মত জলাঞ্জলি দিতে হবে। মাস্টারীতে অবসর বেশী, পড়ার সুবিধেও ঢের, সেই জন্যেই মাস্টারী করতে যাচ্ছি। আর সেই জন্যেই কলকাতাতে থাকবার আমার ইচ্ছে নেই।

উপেনবাবু কহিলেন, কেন কলকাতাতে থাকলে তোমার কি অসুবিধা হবে শুনি ? এখানে থেকে কেউ পাস করে না ? বাড়িতে থেকে পড়াশুনো হচ্ছিল না এত দিন ? তার পর—সেখানে গিয়ে যখন ম্যালেরিয়ায় কোঁ কোঁ ক'রে পড়বে—

তখন কে মুখে জল দেবে ? তখন ত আবার এই পাষণ্ড বাপ-মার কাছেই আসতে হবে। ওঃ, বাপ রে! বাপ-মা এত মন্দ যে পাছে বাড়ি থাকতে হয় বলে সেই নিবান্দা যমপুরে যাওয়া—

ভুপেন তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—কলকাতার ইস্কুলে মাস্টারী নিয়ে ত কেউ বসে নেই। আর সে শুধু দরখাস্ত করে পাওয়াও যায় না—ঢের ধর-পাকড় করতে হয়। যেখানে যাচ্ছি সে দেশেও মানুষ বাস করে নিশ্চয়, সবাই যদি ম্যালেরিয়ায় মরে যেত তাহ'লে ইস্কুলটাও চলত না। এ আমরা সহজ-বুদ্ধিতেই বুঝি—

সে আর তর্ক-বিতর্কের অবসর না দিয়া রান্না-ঘরে গিয়া কহিল, মা ভাত দাও।

মা তখন উনানের সামনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিতেছিলেন, ছেলেকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন,—আমি যে তোর ওপর অনেক আশা ক'রে বসে আছি বাবা—

ভুপেন ধমক দিয়া কহিল—হ্যাঁ, তা হয়েছে কি ? আমি কি মরে গেছি ? না মরতে যাচ্ছি ? যদি সবাই মিলে তোমরা অমন করো তাহ'লে আমি এই দণ্ডেই চলে যাবো বলে রাখছি।

ভয় দেখানোতে ভাল কাজ হইল। মা চোখের জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া দিলেন। ভুপেন ভাত খাইতে বসিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, তাহার বোনদেরও মুখ থমথম্ করিতেছে, যেন তাহার একটা মহা সর্বনাশ হইতে চলিয়াছে। ইহারা কিছুই বোঝে না, শুধু বাবার বিলাপ হইতে ধরিয়া লইয়াছে যে ভুপেন মফঃস্বলে ইস্কুলে মাস্টারী লইয়া তাহাদের সকলকার সমস্ত আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। ভুপেনের মনে মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল সেটুকুও চলিয়া গেল ; এ সংসর্গে কয়েকটা দিন থাকিলেই লেখাপড়ার সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়া তাহাকে চাকুরিতে ঢুকিতে হইবে।

তাহার খানিকটা খাওয়া হইয়া গেলে মা আবার ভরসা করিয়া মুখ খুলিলেন —তা এখন কি আর যাওয়াটা বন্ধ করার উপায় নেই, হ্যাঁ রে ?

ভুপেন গম্ভীরভাবে জবাব দিল, আমি তাঁদের কথা দিয়েছি। তাছাড়া বন্ধ করার কোন দরকারও ত দেখছি না।

আরও ভয়ে ভয়ে মা বলিলেন—ইস্কুল মাস্টারী ত খুব খারাপ কাজ শুনেছি বাবা।

—হ্যাঁ, চুরি-ডাকাতির অধম। এ সব কথা কে বুঝিয়েছে তোমাকে, বাবা বুঝি ? তাঁর অফিসে ঐ গস্ সাহেবকেও এক দিন ইস্কুল মাস্টারের কাছে লেখা-পড়া শিখতে হয়েছে, বাবাও যেটুকু শিখে চাকরি করছেন সেটুকুর জন্যও ঐ মাস্টারদের কাছেই তিনি ঋণী। আশু মুখুজ্জে, সি আর দাস, গান্ধী যে বড় সবাই জানে মা, কিন্তু তাঁদের বড় যারা করলে তারা কি এতই হেয় ? তুমি অমন করছ কেন ? অফিসে কেরানীগিরি করার থেকে ইস্কুল-মাস্টারী করা অনেক গৌরবের কাজ বলেই মনে করি আমি।

মা যে কতকটা ছেলের ধমকের ভয়েই চুপ করিয়া গেলেন তা তাঁহার মুখ দেখিয়াই ভূপেন বুঝিতে পারিল। কিন্তু তাহারও আর কথা বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না, কোনমতে আহার সারিয়া উঠিয়া পড়িল।

রান্না-ঘর হইতে বাহির হইয়া সে যখন নিজের ঘরে যাইতেছে, তখনও উপেনবাবুদের বৈঠক ভাঙে নাই। সে আর সেখানে দাঁড়াইল না বটে, কিন্তু অবিনাশবাবুর উৎসাহ তাহাতে কমিবার কথা নয়, তিনি তাহার উদ্দেশ্যে গলা চড়াইয়া কহিলেন,—কাজটা ভাল করলে না বাবাজী! আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে পাঁচ বছর কেরানীগিরি আর তিন বছর মাস্টারী করলে মানুষ গাধা হয়। তবু দুটো বছর সময় পেতে!

ভূপেন তাহার নূতন মনিবদের কাছে আটদিন সময় লইয়াছিল, কিন্তু এখন আর অত দিনও অপেক্ষা করিবার ইচ্ছা রহিল না। বাবা যতটুকু সময় বাড়ি থাকেন, বিলাপ করেন আর বক্তৃতা দেন ; মা নিঃশব্দে চোখ মোছেন এবং বোনেরা গম্ভীর মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। অথচ উপায়ই বা কি, সে নিজে আটদিন সময় লইয়াছে এখন আবার কি অছিলায় আগে যায় ?

তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন ইস্কুলের কর্তৃপক্ষই। ভূপেনের সম্মতিপত্র পাঠাইবার দ্বিতীয় দিনেই এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির হইল। তাহাতে লেখা আছে—'এখনই যোগ দিন—কবে যাত্রা করিবেন তার করিয়া জানান।' ভূপেন আর এক মুহূর্তও ইতস্তত করিল না, তখনই ডাকঘরে গিয়া তার পাঠাইয়া দিল—'কালই যাইতেছি।' তার পর বাড়ি ফিরিয়া যাত্রার আয়োজন শুরু করিয়া দিল। অবশ্য ঘটা করিয়া আয়োজন করিবার মত এমন কিছু ছিলও না—মোহিতবাবুর চেক ভাঙ্গাইয়া সে ইতিমধ্যেই আংশিক বাড়ি-ভাড়া প্রভৃতি তাহার যাহা দেয়, তাহা মিটাইয়া দিয়াছিল, বাকী টাকা যা, দুই একখানা কাপড় জামা, বিছানার একটা চাদর এবং ফাইবারের একটা সুটকেস কিনিতেই শেষ হইয়া গেল। মাস কয়েক আগে টাকা জমাইবার শুভবুদ্ধি মাথায় দেখা দিয়াছিল, সেই সময় পোস্ট অফিসে একটা হিসাবও খুলিয়াছিল। এখন খাতাটা খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে মাত্র আটটি টাকা পড়িয়া আছে। বিছানার দুই-একটা জিনিস কিনিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই আর্থিক অবস্থায় তাহা আর সম্ভব হইল না—অগত্যা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে তাহার পুরাতন বিছানার মধ্য হইতেই অপেক্ষাকৃত ভদ্র কিছু খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বোনগুলি মুখভার করিয়াই থাক বা গোপনে রোদনই করুক—শেষ পর্যন্ত তাহাদের সাহায্যেই সুটকেস ও বিছানা ঠিক করিয়া রাখিযা সন্ধ্যার মুখে আবার বাহির হইযা পড়িল। কতদিনের জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া যাত্রা করিতেছে কে জানে! দীর্ঘকাল, হয়ত বা জীবনের মতই—কিছুই বিচিত্র নয়। এই শেষ সন্ধ্যাটি সে একটু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে।

মন খারাপ হয় বৈকি! জন্ম হইতে সিমলার এই সংকীর্ণ গলি এবং কলিকাতার অতি-পরিচিত রাস্তাগুলি দেখিয়া আসিতেছে। এত দিন বোঝা

যায় নাই, কখন অজ্ঞাতসারে এই কদর্য পথগুলি তাহার মনে মায়া বিস্তার করিয়াছিল। যে ট্রাম-বাসের কোলাহল চিরকাল অসহ্য বোধ হইয়াছে, আজ যেন তাহাদের ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইতেছে।…মা কাঁদিতেছেন, বাবাও বাড়ি আসিয়া খবর পাইলে প্রকাশ্যে না হোক গোপনে চোখের জল ফেলিবেন। যে বোনগুলির স্বাচ্ছন্দ্যের কথা সে কখনও চিন্তা করে নাই, তাহাদেরও চোখ ছল ছল করিতেছে। এই সব স্নেহের বন্ধন তুচ্ছ করিয়া, চিরপরিচিত এবং প্রিয় আবেষ্টনী পিছনে ফেলিয়া সে সম্পূর্ণ অজানা কোন দেশে যাত্রা করিতেছে—কি সেখানে মিলিবে কে জানে! হয়ত এই কষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, বাবার উপদেশ শুনিয়া অফিসে চাকরি লইলে এক রকম করিয়া জীবন কাটিয়াই যাইত, সম্ভবত শান্তিতেই কাটিত। আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ছেলের যেমন করিয়া জীবন কাটে—চাকরি করিয়া, বিবাহ করিয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রতিপালন করিয়া—অভাবে ও দারিদ্র্যে—তাহার জীবনও না হয় তেমনি করিয়াই কাটিত, দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও আদর্শবাদী হইতে গিয়া হয়ত সে ভুলই করিল।

এই সব চিন্তার মধ্যে মন যখন অত্যন্ত ক্লিষ্ট, সহসা যেন দৃষ্টির সামনে সন্ধ্যার শান্ত একাগ্র চোখ ফুটিয়া উঠিল। সে চোখের চাহনি যেন আর একবার মনে করাইয়া দিল, 'আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা মাস্টারমশাই, আপনি কেরানীগিরি করছেন এ আমি ভাবতেই পারি না।' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুর্বলতা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নিজেকে কঠিন করিয়া লইল। পিছনের দিকে, আরামের পঙ্কশয্যার দিকে তাকাইলে চলিবে না। তাহাকে বড় হইতেই হইবে, ধনী নয়—শিক্ষিত হইতে হইবে।

তরুণ বয়স তাহার—জীবনের অন্ধকার দিকের ছায়া তাহার কল্পনাকে তখনও মলিন করিতে পারে নাই, পূর্বপুরুষদের দাসত্বের সংস্কার তখনও তাহার আশা ও আদর্শবাদকে সংকীর্ণ করিয়া তুলিতে পারে নাই—তাই সেদিন সন্ধ্যারই জয় হইল, সহজ জীবনযাত্রার প্রলোভন ফেলিয়া যশের জয়তিলকই জীবনের কাম্য বলিয়া বাছিয়া লইতে পারিল।

অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে চলিতে অভ্যস্ত পা কখন চোরবাগানে মোহিত-বাবুদের বাড়ির সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা ভূপেন বুঝিতেও পারে নাই। সহসা দূর হইতে পরিচিত দারোয়ানকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বহু দিনের জন্যই কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছে সে, দেখা করিবার অজুহাতের অভাব নাই। একবার ঢুকিয়া পড়িবে নাকি বাড়ির মধ্যে? চলিয়া যাইবার আগে আর একবার সন্ধ্যাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহার মনের অবচেতন অবস্থায় বরাবরই ছিল, এখন দুর্নিবার লোভে বুক দুলিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল, সন্ধ্যার ঘরে আলো জ্বলিতেছে, লাইব্রেরী ঘরেরও জানালা খোলা—সম্ভবত দুজনেই আছেন। কিন্তু—না, ছিঃ! মনে পড়িয়া গেল চিঠিতে মোহিতবাবু দেখা করার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। এ অবস্থায় গেলে মোহিতবাবুর চোখে ছোট হইয়া যাইতে

হইবে। কোন কারণে, অন্তরের কোন তাগিদেই সে তাঁহাদের কাছে ছোট হইতে পারিবে না।

সে জোর করিয়া নিজেকে ফিরাইয়া লইল। আর ঘুরিবারও ইচ্ছা নাই, এতক্ষণ হাঁটার ক্লান্তিতে এইবার যেন পা ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, সে বাড়ির দিকেই ফিরিল।...

পরের দিন সকাল দশটায় গাড়ি, মা-বাবা সারা রাতই ঘুমাইলেন না। মা শেষ-রাত্রে উঠিয়া রান্না করিতে গেলেন, বাবা তখনই তাহাকে ঘুম হইতে তুলিয়া নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। যাওয়া বন্ধ করার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া কাল হইতে আর সে-কথা তুলেন নাই। এখন শুধু স্নান আহার বিশ্রাম সম্বন্ধে উপদেশ। বীরভূম সাপের দেশ, সাদা করবীর ডাল বিছানার নিচে রাখিয়া দিলে সাপ আসে না, ঐ ডালেরই একটা ছড়ি করিয়া লইলে পথেও নিরাপদ থাকা যায়। জল সর্বদা গরম করিয়া খাইবে, হোস্টেলে সম্ভব না হইলে নিজেই যেন বন্দোবস্ত করিয়া লয়, স্নান বেশী না করাই ভাল, করিলেও গরম জল ব্যবহার করা উচিত। ধান ক্ষেত, নদীর ধার এবং জঙ্গল এই স্থানগুলি সর্বদা পরিত্যাজ্য ইত্যাদি।

ভূপেনের নিজের মানসিক অবস্থা এমনিতেই খারাপ ছিল, তাহার উপর এই সব অবান্তর উপদেশ অত্যন্ত বিরক্তিকর। তবু সে শান্তভাবেই সব শুনিয়া গেল, শেষ দিনে আর কোন আঘাত দিতে ইচ্ছা হইল না। আজ সে বুঝিল কেন হিন্দুস্থানীরা হাজার মাইল দূর হইতে এদেশে আসিয়া অর্থ উপার্জন করে এবং বাঙ্গালীরা ছেলেরা ঘর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে বলিয়াই ফেলিল, আমি ত মাত্র সওয়া-শ মাইল যাচ্ছি বাবা—তাইতেই আপনারা এমন করছেন, আপনার অফিসের সাহেবরা রোজগার করবার জন্যে কত দূরে এসেছে, আর কী দেশ ছেড়ে কী দেশে এসেছে ভেবে দেখুন দিকি।

বলা বাহুল্য, উপেনবাবুর উদ্বেগ তাহাতে কিছুমাত্র কমিল না, কোনমতে স্নানাহারের সময় হইয়াছে এই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়া সে অব্যাহতি পাইল এবং যথেষ্ট সময় হাতে থাকা সত্ত্বেও সাড়ে আটটার মধ্যেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

॥ ৮ ॥

প্যাসেঞ্জার ট্রেন মন্থর গতিতে চলিয়া যখন তাহার বিশেষ স্টেশনটিতে পেঁছিল তখন সন্ধ্যার কিছু দেরি থাকিলেও হেমন্তের সূর্য ম্লান হইয়া আসিয়াছে। ছোট স্টেশন, লোকজন ওঠা-নামা করে কম—সুতরাং ট্রেন পুরা এক মিনিটও বোধ হয় দাঁড়ায় না। ভূপেন আগে হইতেই কামরার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, প্ল্যাটফর্মে গাড়ি ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই 'কুলী'—'কুলী' করিয়া ডাকাডাকি শুরু করিল—কিন্তু কোথায় কুলী। কাছাকাছি কোথাও কুলী বা ঐ জাতীয় কাহারও চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। এধারে তখনই গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা দিয়া দিয়াছে, অগত্যা সে নিজেই সুটকেস ও ভারী বিছানার বাণ্ডিলটা লইয়া কোনমতে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল।

এইবার ভূপেন স্টেশনটার দিকে চোখ বুলাইবার অবকাশ পাইল। নিতান্তই ছোট স্টেশন—কাছাকাছি লোকালয়ও বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না। যে দিকে চোখ ফেরায় শুধু মাঠ ধু ধু করিতেছে। সেই দিগ্‌দিগন্ত জোড়া মাঠেরই মধ্য দিয়া দুইগাছি কালো সুতার মত কালো রেললাইন যেন একদিকের আকাশের কোল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অপর দিকের আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। স্টেশনের কাছাকাছি আসিলে সেটাকে লাইন বলিয়া বোঝা যায়—সেইখানে আরও গোটাকতক লাইন বাহির হইয়াছে। ওপাশে মাল নামাইবার একটা প্ল্যাটফর্ম আছে—এ ধারের যাত্রীবাহী প্ল্যাটফর্মটাও খুব ছোট নয় কিন্তু সে সবই ফাঁকা, জনহীন। অন্য সময় কখনও এ সবের প্রয়োজন হয় কিনা বোঝা কঠিন—এখন এগুলিকে নিতান্ত পরিহাস বলিয়াই মনে হইতেছে। টিনের ছোট স্টেশন ঘরটা না থাকিলে ইহাকে স্টেশন বলিয়া চেনাও মুশকিল হইত। স্টেশন বলিতে এতদিন যে সব ছবি ভূপেনের মনের মধ্যে ছিল, তাহার কোনটার সঙ্গেই যেন মেলে না—কুলীর গোলমাল নাই—খাবারওয়ালা এমন কি একটা পান-বিড়ি বিক্রেতা পর্যন্ত চোখে পড়ে না।

এই জনহীন স্টেশন-মরুতে 'কুলী' খুঁজিবার প্রবৃত্তি তাহার আর ছিল না, কিন্তু দুই দুইটা ভারী জিনিস বহন করিয়া কতদূরেই বা লইয়া যাইবে। কোন্ দিকে তার স্কুল তাও সে জানে না, কতটা পথ হাঁটিতে হইবে তাহারও ঠিক নাই। যাই হোক্ সে আর একবার ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতেই তাহার নজরে পড়িল একটি মধ্যবয়সী লোকের সঙ্গে গুটি-তিনেক ছেলে মাঠ ভাঙ্গিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশনের দিকে ছুটিতেছে এবং তাহার দিকে হাত নাড়িয়া কী ইঙ্গিত করিতেছে।

অগত্যা সে সেইখানেই অপেক্ষা করিতে লাগিল। ততক্ষণে স্টেশন-মাস্টার তাঁহার খোপে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। প্ল্যাটফর্মে আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই। একটু পরেই সেই দলটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হাজির হইল। লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু এই বয়সেই গায়ের চামড়া কুঁচ্‌কাইয়া গিয়াছে বৃদ্ধদের মত, গায়ের রংও হয়ত এককালে ফরসা ছিল, গলার খাঁজের দিকে চাহিলে সেটা বোঝা যায় কিন্তু মুখখানা যেন পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে। পরনে একটি খাটো কাপড়, গায়ে অত্যন্ত মলিন হাফশার্ট—পা খালি, একেবারে খালি নয়—হাঁটু পর্যন্ত ধুলায় ঢাকিয়া গিয়াছে। সঙ্গের ছেলেগুলির বেশভূষা আরও দীন—কাহারও গায়ে জামা নাই, শুধু গেঞ্জি ভরসা। বলা বাহুল্য, পা সকলকারই খালি।

ইহারা স্কুল হইতে আসিয়াছে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন, তবু ভূপেন তাহাদেরই দিকে জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিয়া রহিল। বয়স্ক লোকটি একটু দম লইয়া কহিল, আপনিই কি নতুন মাস্টারমশাই এলেন কলকাতা থেকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভূপেন জবাব দিল,—আবার নাম শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।

লোকটি আসিয়াই একবার ঘটা করিয়া ননস্কার করিয়াছিল, এখন আর একবার নমস্কার করিয়া কহিল, আমরা আপনাকেই নিতে এসেছি। আমার নাম শ্রীঅক্ষয়-চন্দ্র মণ্ডল, আমি এখানকার থার্ড মাস্টার।

তারপর, ভূপেনের স্তম্ভিত ভাব কাটিবার পূর্বেই, তিনি নিজে তাহার সুটকেসটা তুলিয়া লইয়া ছেলেদের কহিলেন, নে রে, তোরা কেউ বিছানাটা নে।

ভূপেন বিশেষ লজ্জিত হইয়া তাঁহার হাত হইতে সুটকেসটা ফিরাইতে লইতে গেল, ওটা আমাকে দিন, ছি-ছি আপনি কেন নিচ্ছেন—আমিই—

কিন্তু অক্ষয়বাবু ততক্ষণে চলিতে শুরু করিয়াছেন, তিনি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না না বাবু আপনাদের এসব অভ্যাস নাই, আপনারা কি পারেন বইতে ? তাছাড়া পথও ত কম নয়, প্রায় আধ ক্রোশ। অবিশ্যি আমাদের এ পথ কিছু লাগে না, আমরা রোজই ধরুন এখানে বেড়াতে আসি, কিন্তু আপনাদের কথা আলাদা। ট্রামে-বাসে চলা অভ্যাস আপনাদের—

তারপর সখেদে কহিলেন, এটা কি একটা দেশ নাকি ? না একটা গাড়িঘোড়া, না একটা কুলী। পয়সা দিয়েও ইচ্ছামত একটা খাবার পাবেন না। নিতান্ত পেটের দায়ে পড়ে থাকা।

তিনি সুটকেসটা হাতে করিয়া হাঁটিতে শুরু করিলেন। ছেলের দলও বিছানাটা তুলিয়া লইয়াছে ; অগত্যা ভূপেন বাধ্য হইয়াই অক্ষয়বাবুর অনুসরণ করিল। কিন্তু ব্যাপারটার গ্লানি ও লজ্জা তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগিল।

স্টেশনের সীমানা পার হইয়া রাস্তায় পড়িতেই ভূপেন বুঝিল কেন ইহারা সকলে খালি পায়ে আসিয়াছে। পথ পাকা নয়, তা না হউক, কিন্তু কাঁচা রাস্তা বলিতে ভূপেনের যে ধারণা ছিল তাহার সহিতও ইহার কিছুই মেলে না। অনেক দিন আগে সে কি একটা উপলক্ষে আঁদুল স্টেশনে নামিয়া ভিতরের দিকে অনেকটা গিয়াছিল। সেখানেও কাঁচা রাস্তা, তবে এ রাস্তার তুলনায় সে কিছুই নয়। সেখানে স্বচ্ছন্দে জুতা পায়ে ঘুরিয়া আসা গিয়াছিল, কিন্তু এখানে প্রথম পা দেওয়া মাত্র ময়দার মত ধুলায় তাহার পায়ের গোছ-সুদ্ধ ডুবিয়া গেল। হাত তিন-চার পথ যাইবার পরই তাহার নূতন জুতাটার যে অবস্থা হইল, তাহাতে জুতা বলিয়া চেনাই কঠিন। ভূপেনের একবার ইচ্ছা হইল জুতাটা খুলিয়া হাতে করে কিন্তু নিতান্ত চক্ষুলজ্জাতেই পারিল না।

সে বার বার পায়ের দিকে চাহিতেছে লক্ষ্য করিয়া অক্ষয়বাবু বলিলেন, ও আর কি দেখছেন। জুতো পায়ে দেওয়া এখানে চলে না। নেহাৎ যদি চান ত হোস্টেল থেকে বেরিয়ে ইস্কুলটা পর্যন্ত যেতে পারেন, পথে বেরোনো চলবে না।··· তা এক রকম ভাল, জুতোর খরচটা বেঁচে যায়, কি বলেন ?

তিনি নিজের রসিকতায় নিজেই এক চোট হাসিয়া লইলেন, তারপর কহিলেন, অসুবিধা হয় ত ঐ ছেলেগুলোর কাউকে দিন না জুতোটা খুলে—নিয়ে চলুক।

ভূপেন প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, না, কিছু দরকার নেই।···তা ছাড়া এখনও ত আপনাদের দেশে অভ্যস্ত হই নি—খালি পায়ে চলতে পারব না।

স্টেশনের তারের বেড়া পার হইয়া আসিয়াই একটা বড় চালার নিচে পাশা-পাশি ঘরে পোস্টঅফিস, মনোহারীর দোকান ও একটা খাবারের দোকান পড়িল। স্টেশনের মালের শেড্‌টা আড়াল ছিল বলিয়া প্ল্যাটফর্ম হইতে ভূপেন দেখিতে

পায় নাই। খাবারের দোকান বলিয়াও চেনা যাইত না, যদি না মোদকের পুত্র সেই সময়ই রসগোল্লা পাক করিতে বসিত—কারণ ধুলার ভয়ে এখানে খাদ্যদ্রব্য বাহিরে সাজানোর রীতি নাই, সাধারণ ঘরের মধ্যেই দোকান। কেরোসিনের পুরানো টিনে রসগোল্লা থাকে বারকোশ চাপা, খরিদ্দার চাহিলে অন্ধকার ঘরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেয়। পাশের মনোহারী দোকানটিতে কিছু কিছু মাল বাহিরের দিকে সাজানো আছে বটে কিন্তু তাহার প্রত্যেকটির উপর যে পরিমাণ ধুলো জমিয়াছে তাহাতে কোনটা কি জিনিস, দূর হইতে চিনিবার আর কিছুমাত্র উপায় নাই।

তবু, লোকালয়ের চিহ্ন ঐ তিনটি ঘরেই কিছু মেলে, সেই চালাটা ছাড়াইয়া আসিয়া পথ চলিতে চলিতে ভূপেন যেদিকেই চায় শুধু মাঠ। মধ্যে দু-এক টুকরা ধান-জমি আছে, সেইটুকুতেই দৃষ্টি যা আরাম পায়, নহিলে শুধুই ডাঙ্গা—রুক্ষ, অনুর্বর, তৃণশূন্য কঠিন সে ভূমি, সেদিকে চাহিলে বাংলাদেশের গ্রাম বলিয়াই চেনা যায় না। গাছের মধ্যে দু-একটা জায়গায় কাঁটা গাছ, আর দূরে দূরে এক-একটা তালের কুঞ্জ। বহু দূরে, মাঠের প্রায় প্রান্তে দু-একটা চালার মত কি নজরে পড়ে। তাহারই সঙ্গে গাছপালার একটা সবুজ রেখা তৃষিত পথিকের প্রাণে আশা জাগাইয়া আকাশের কোলে আঁকা রহিয়াছে। কিন্তু সে এতই দূরে যে, ভয় হয়, বুঝিবা ওটা চোখেরই ভ্রম।...

অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর, যেটাকে আগে মাঠের প্রান্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহার কাছাকাছি আসিয়া, হঠাৎ পথ এবং সেখানের জমি, দুই-ই নিচের দিকে হেলিয়া পড়িতে দেখা গেল, সামনেই অনেকগুলি চালাঘর জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে, গাছ-পালারও খুব অভাব নাই। অথাৎ—এইটিই গ্রাম। শুধু চালাবাড়ি নয়, দুই-একটি পাকা বাড়িও নজরে পড়িল, যদিচ ধুলায় তাহাদের দেওয়ালের চুনের মৌলিক রঙ অনেক দিনই চাপা পড়িয়াছে।

অক্ষয়বাবু বুঝাইয়া দিলেন, এইটেই হ'ল এখানকার গ্রাম। ইস্কুলটা কিন্তু আর একটু দূরে—ঐ সামনের মাঠটা পেরিয়ে। এখানকার জমিদার ইস্কুলের জমি বাড়ি দুই-ই দান করেছেন কিনা, কাছাকাছি জমি পাওয়া যায় নি।...এইটে হ'ল এখানকার ডাক্তারের বাড়ি, ইনিই এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। আর এই হ'ল তারিণীবাবুর বাড়ি, খুব সাধক লোক ছিলেন, সম্প্রতি মারা গেছেন। ওঁর ছেলে আছে অবিনাশ, সে-ও খুব বিদ্বান, সদরে ওকালতি করে। ভদ্রপাড়া বলতে এই সাত-আট ঘর, বাকী সবই ছোট জাত।

ক্লান্ত ভূপেন সব কথা মন দিয়া শুনিল না, শুধু অবসন্নভাবে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র। জুতার মধ্যে ধুলো জমিয়া জুতা ভারী হইয়াছে, মেঠোপথে চলিয়া পা-ও আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—এখন সে কোথাও একটু বসিতে পারিলে বাঁচে।

অক্ষয়বাবু তখনও বক্তৃতা করিয়াই চলিয়াছেন, দূরে থাকা একরকম ভাল, বুঝলেন না? গরম পড়লেই কলেরা, আর ফি বৎসর গ্রাম যেন উজোড় হয়ে যায়, আমাদের ওটা অনেক দূরে বলে বেঁচে গিয়েছি, তাও মশায় কুয়ো নিয়ে বিভ্রাট, খুব যখন রোগটা চাপে তখন সারা রাত জেগে কুয়ো পাহারা দিতে হয়।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন ?

—কুয়ো ত এদিকে খুব বেশী নাই, থাকলেও অত খরচ করে কে কাটাবে মশাই ? অধিকাংশ কুয়োতেই জল যায় শুকিয়ে—গরম না পড়তে পড়তে। তখন সব ছোটে হোস্টেলের কুয়োতেই জল নিতে, আমাদের চাকরই তুলে দেয় যতটা পারে —কিন্তু যখন-তখন ত আর তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ ওদের তুলতে দিলেই সর্বনাশ, স্যানিটেশনের জ্ঞান ত একেবারে নাই, নোংরা বালতি দড়ি—যা পাবে তাই ডোবাবে, ফলে এই জলটি সুদ্ধ যাবার দাখিল হয়, বুঝলেন—না ? অথচ অতগুলো ছেলের জীবন-মরণ নির্ভর করছে এটুকু জলের ওপর, সে রিস্‌ক্ ত কম নয়।

ততক্ষণে তাহারা মাঠ পার হইয়া ইস্কুলের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে ; একেবারেই যে ফাঁকা তা নয়, দুই-একটি ঘর এখানেও আছে, তবু খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট নয়। ইস্কুল বাড়িটা পাকা, খুব ছোটও নয়, ইংরাজী 'ই' অক্ষরের মাঝখানের ছোট টানটা বাদ দিলে যেমন দাঁড়ায় সেইভাবে একতলা ঘরের শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। সামনে অনেকটা ফাঁকা জমি, সেটা খেলার মাঠও নয়, বাগানও নয়। উঁচু-নিচু পতিত জমি, গাছপালা ত নাই-ই, ঘাসও অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে হয় এমনি দুরবস্থা। সীমানা ঘেরা নাই. পাঁচিল দিবার ইচ্ছা ছিল—সেটা বোঝা যায় মাঝখানে পাকা ফটকের দুইটা থাম দেখিয়া—কিন্তু আর কিছুই করা হইয়া ওঠে নাই।

ইস্কুলের ঠিক সামনেই হোস্টেলবাড়ি, সেটিও খুব ছোট নয় কিন্তু কাঁচা। শক্ত মাটির দেওয়ালের উপর খড়ের চালা, সামনে খানিকটা করিয়া টানা রোয়াক। তবে মাটির দেওয়াল হইলেও সে মাটি এতই কঠিন যে ভিতরের চুনের কাজ দেখিলে মাটি বলিয়া চেনা যায় না। মেঝেও সিমেন্ট করা—অর্থাৎ মেটে ঘরের অসুবিধা কোনটাই নাই। আর সবচেয়ে যেটা ভাল লাগিল ভূপেনের, হোস্টেলের উঠানটি কাঁটাতার দিয়া ঘেরা এবং ভিতরে অসংখ্য ফুল ও ফলের গাছ। সেটা, অক্ষয়বাবু বুঝাইয়া দিলেন, কুয়াটা থাকার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। ছেলেদের স্নান ও অন্যান্য কাজ-কর্মের সমস্ত জলটা বাগানে আসে বলিয়াই এতগুলি গাছগালা, এমন কি কলাগাছ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হইয়াছে—আর শুধু এই বস্তুটির অভাবেই ইস্কুলের উঠানটাতে কিছু করা যায় নাই।

উহাদের দলটিকে কাছাকাছি আসিতে দেখিয়া হেডমাস্টার ও ছেলের দল ভিড় করিয়া আগাইয়া আসিল। পিছনে অন্য তিনজন শিক্ষক ছিলেন। হেডমাস্টার প্রবীণ লোক, সৌম্যদর্শন, কাঁচা-পাকা দাড়ি ; বেঁটে-খাটো লোকটি। গলায় মোটা তুলসীর কণ্ঠি, কপালে তিলক অর্থাৎ ঘোর বৈষ্ণব। এই মানুষটি সম্বন্ধে ভূপেনের একটু ভয় ছিল, ইনিই বারো-আনা মনিব, কেমন লোক হইবেন কে জানে। কিন্তু মানুষটিকে দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল। মধুর হাসিয়া তিনি অভ্যর্থনা জানাইলেন, আসুন। আসুন। আপনি বোধ হয় ভূপেনবাবু। আমার নাম শ্রীভবদেব দাস, আমিই এখানকার হেডমাস্টার।

ছেলেগুলির দিকে চাহিয়া কহিলেন, ওরে নতুন মাস্টারমশাইয়ের বাক্স-

বিছানাটা ঐ ও-পাশের ছোট ঘরটায় নিয়ে যা, যতীনবাবুর ঘরে। যতীনবাবু, আপনি ওগুলোর একটু তত্ত্বাবধান করুন গে—কেমন ?—আসুন ভূপেনবাবু—এদিকে ! বাবা ভজহরি, বাবুর মুখ-হাত ধোবার জল দাও একটু—

হোস্টেলের ঠিক মাঝখানের ঘরটিতে ভবদেববাবু থাকেন। সামনে বড় দুইটি মাদুর পাতা রহিয়াছে, বোধ হয় এতক্ষণ ইঁহারা এইখানেই বসিয়াছিলেন। ভবদেববাবু ভূপেনকে সঙ্গে করিয়া সেইখানেই লইয়া গেলেন, মাদুরটা দেখাইয়া কহিলেন, বসুন, বসুন, একটু বিশ্রাম করুন। ওরে ভজহরি, বাবা জল দিলি ? পা-টা একেবারে ধুয়েই বসুন, কেমন ?

ভজহরি বালতিতে জল দিয়া গেল। ভবদেববাবুর ইঙ্গিতে একটা ছেলে কোথা হইতে অত্যন্ত মলিন-একটা তোয়ালেও লইয়া আসিয়াছিল। ভূপেন কোনমতে আলতো জলটা মুছিয়া লইয়া মাদুরে আসিয়া বসিল, তারপর অন্যের অলক্ষিতে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল।

সকলে বসিলে ভবদেববাবু হাঁক দিলেন, ঠাকুর, চা হয়েছে ?

স্টেশন হইতে আসিবার সময় একটি ছেলে ময়রার দোকানের কাছে পিছাইয়া পড়িয়াছিল—এতক্ষণে তাহার কারণটা স্পষ্ট হইল। ঠাকুর একটি প্লেটে করিয়া গুটিচারেক রসগোল্লা এবং একটা কানাভাঙা কাপে এক কাপ চা রাখিয়া গেল। আরও দুই পাত্র চা আসিল ছোট কলাই করা মগে, হেডমাস্টার নিজে একটা এবং একজন শিক্ষক আর একটা লইলেন। বাকী যে কজন শিক্ষক ছিলেন তাহাদের দিকে ভূপেন কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিতেছে দেখিয়া ভবদেববাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন ওঁরা কেউ চা খান না।

তারপর পশ্চিমের দিগন্তজোড়া মাঠটার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, সন্ধ্যে অবিশ্যি হয়েছে—কিন্তু রাত হয় নি একেবারে, কী বলেন ? চা খাওয়া চলে ? য়্যাঁ—

সামনেই যিনি বসিয়াছিলেন তিনি কহিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—স্বচ্ছন্দে। তা ছাড়া আমার গুরুদেব বলেছেন—পানকে দোষ নেই।

ভবদেববাবু একটু অপ্রতিভভাবে ভূপেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, মানে এখনও সন্ধ্যা করা হয় নি কিনা—নিন, নিন ভূপেনবাবু, চা জুড়িয়ে গেল।

বলিয়া তিনি নিজেই বেশ বড় করিয়া একটা চুমুক দিলেন।

কুৎসিত অপেয় চা—চা না বলিয়া গরম জলই বলা উচিত। তবু এই ট্রেন ভ্রমণ এবং পথশ্রমের পর ভূপেনের আরামই লাগিল। রসগোল্লাগুলিও ভাল—দোষের মধ্যে একটু যা মাধুর্যের আতিশয্য।

চা খাইতে খাইতে ভবদেববাবু সকলের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন।—ভূপেনবাবু, আসুন এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন অপূর্বকৃষ্ণ পাল, য়্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার মশাই, হায়ার ক্লাসে অঙ্ক আর জিওগ্রাফী পড়ান। এঁর সঙ্গে ত আপনার আলাপই হয়েছে, অক্ষয়বাবু। উনি যতীনবাবু, হিস্ট্রির মাস্টার, ইনি হলেন রাধাকমল বিদ্যাভূষণ, হেডপণ্ডিত, আর আপনার পিছনে উনি বিজয়বাবু, বিজয়বাবু হোস্টেলে থাকেন না অবিশ্যি, উনি স্থানীয় লোক—

শুধু আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন বলেই বসে আছেন।

যথারীতি নমস্কার বিনিময়ের পর আলাপ জমিয়া উঠিল। অপূর্ববাবুই অগ্রণী হইয়া আলাপ চালাইলেন—কলিকাতার হালচাল কি, জিনিসপত্রের দর কত? মাছ সব রকম পাওয়া যায় কিনা, দুধের কি দর, ভূপেন কেন এম-এ পড়া ছাড়িল, রিপন কলেজে আজকাল কে কে প্রফেসার আছেন, বঙ্গবাসী কলেজের নূতন প্রিন্সিপাল কেমন লোক—বাপের নাম রাখিতে পারিবেন কিনা, এই সব রকমারি প্রশ্ন।

ছেলেদের দল তখনও কৌতূহলী হইয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অধিকাংশই ক্ষীণকায়, ম্যালেরিয়া ও খাদ্যাভাবে শুধু শীর্ণ নয়—অপুষ্টও বটে। প্রথম শীত হইলেও ঠাণ্ডার আমেজ বেশ আছে—কিন্তু বেশীর ভাগ ছেলের গায়েই একটা গেঞ্জি পর্যন্ত নাই। ময়লা খাটো কাপড়—দুই-একজনের একটু আধুনিকতার ছোঁয়াচ আছে—হাফ প্যাণ্ট। ভূপেন দুই-একবার তাহাদের দিকে চাহিতেই অপূর্ববাবু প্রচণ্ড ধমক দিলেন, এই, তোরা এখানে কেন রে। যা সব পড়ুতে বসগে যা—

তাড়া খাইয়া সকলেই চলিয়া যাইতেছিল, ভবদেববাবু তাহাদের মধ্যে দুইজনকে ইঙ্গিতে ডাকিলেন। দুইজনেই সমবয়সী, বছর-ষোল হইবে—শ্যামবর্ণ,—একটি ইহারই মধ্যে একটু বলিষ্ঠ গঠনের। ভবদেববাবু গলা নামাইয়া কহিলেন, এই দুটি ছেলে এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠবে, দুটিই বড় ভাল ছেলে—যত্ন নিতে পারলে ইস্কুলের নাম রাখবে। ওরে পদন, নতুন মাস্টারমশাইকে পেন্নাম কর্। কৈ রে সালেক—আয় আয়।

বলিষ্ঠ ছেলেটিই পদন—হরিপদ নাম সংক্ষিপ্ত হইয়া পদনে দাঁড়াইয়াছে। অপর ছেলেটি মুসলমান, শোনা গেল মাইল আষ্টেক দূরে কি একটা গ্রামে বাড়ি, ছাত্রবৃত্তি পাইয়া হাই স্কুলে পড়িতে আসিয়াছিল, এখন ক্লাশ পড়ে। অবস্থা খুবই খারাপ—কোনমতে হোস্টেলের খরচটা বাপ চালায়, তাও বোধ হয় ঘটিবাটি বেচিয়া। ভরসা—ছেলে ভাল করিয়া পাস করিলে দুঃখ ঘুচিবে। তাহারা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সালেক ছেলেটি হোস্টেলের কম্পাউণ্ড পার হইয়া মাঠের পথ ধরায় ভূপেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ও ছেলেটি যাচ্ছে কোথায়? হোস্টেলে থাকে না?

ভবদেববাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, ঐ যে দূরের চালাটা দেখছেন ঐটেই হ'ল মুসলমানদের হোস্টেল। একটা ঘর—গোটা চারেক সীট আছে। ইনস্পেক্টারের পেড়াপীড়িতে করতে হয়েছিল। দুটি মাত্র ছাত্র আছে মোটে—ওদের আর কে লেখাপড়া শিখছে, আপনিও যেমন। এই ছেলেটি দেখছি যা, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ।

ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তা ওদের খাওয়া-দাওয়া?

—এখানেই খায়। খাবার ঘণ্টা পড়লে ওদের থালা গেলাস নিয়ে এসে উঠোনে পাতে, ভাত ডাল ঢেলে দেওয়া হয়। ওরা ওখানে নিয়ে গিয়ে খায়। নিজেদের থালা বাসন নিজেরাই মেজে নেয়—ঘর-দোরও ওদের ঝাঁট দিতে হয়। কী করব বলুন, দুটি ছাত্রের জন্য ত আর মুসলমান চাকর রাখা সম্ভব নয়।

শুধু তাই নয়, পরে ভূপেন জানিয়াছিল, স্নানের ও পানের জলের জন্যও ইহাদের এখানকার চাকরের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়—কুয়া হইতে জল তুলিয়া লইবার অধিকার ইহাদের নাই।

ছেলেরা চলিয়া যাইবার পর হইতেই অপূর্ববাবু ভূপেনকে দখল করিবার জন্য অসহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভবদেববাবু চুপ করিতেই আবার তিনি উপর্যুপরি প্রশ্ন করিলেন। এই ভদ্রলোকটিকে প্রথম দর্শনেই ভূপেন যেন অবাক হইয়া গিয়াছিল। শ্যামবর্ণের দোহারা দীর্ঘাকৃতি মানুষটি, চেহারায় কোথাও অসাধারণত্ব নাই। শুধু তাঁহার চশমার বিদ্যুতোজ্জ্বল লোহার ফ্রেমটা দ্রুত প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততর মস্তক-চালনায় ক্ষীণ হ্যারিকেনের আলোতেই বার বার চোখের সামনে ঝিলিক মারিতেছিল। কিন্তু সেজন্যও নয়, লোকটি কথা কহিতে পারেন দ্রুত এবং প্রশ্নগুলি এমন ভাবে শুরু করিয়াছিলেন যে ভূপেনের মনে হইল বহুদিন হইতে তাহারই অপেক্ষায় এগুলি তিনি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।

কলিকাতার হাল-চাল হইতে শীঘ্রই অপূর্ববাবু ব্যাঙ্কিং-এ চলিয়া আসিলেন। কোন্ ব্যাঙ্ক কেমন চলে, কে কত সুদ দেয়, ক মাসের ফিক্‌স্‌ড্ ডিপোজিটে কত সুদ পাওয়া যায়, কোম্পানীর কাগজের কি দাম, ওখানে তেজারতি কেমন চলে,—এই ধরনের অজস্র প্রশ্ন। ভূপেনের ইহার কোনটাই ভাল করিয়া জানা ছিল না—সেজন্য অপূর্ববাবু যেন একটু ক্ষুণ্ণই হইলেন।

খানিক পরে ভবদেববাবুই ভূপেনকে বাঁচাইয়া দিলেন, একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আপনারা তাহলে গল্প করুন, আমি সন্ধ্যেটা সেরে নিই—কী বলেন? যতীনবাবু, আপনি না হয় ততক্ষণ ভূপেনবাবুকে ঘরেই নিয়ে যান, যদি জামাকাপড় কিছু ছাড়তে চান।

যতীনবাবু ভূপেনের কানে কানে কহিলেন, তাই চলুন ভূপেনবাবু, মাস্টার মশায়ের সন্ধ্যে মানে দুটি ঘণ্টা—

অপূর্ববাবুও এদিক ওদিক চাহিয়া কহিলেন, আমিও উঠি, পণ্ডিতমশায় কই, সরে পড়েছেন বুঝি? আমিও যাই ভূপেনবাবু—আবার একটা কোচিং ক্লাস আছে কিনা।

উঠিয়া দাঁড়াইতে এতক্ষণ পরে ভূপেনের নজর পড়িল ভবদেববাবুর ঘরের ভিতর দিকটায়। সামনেই একটা জলচৌকিতে বিভিন্ন দেবতার ছবি ও এক জোড়া খড়ম মালা-চন্দন প্রভৃতিতে রীতিমতো সাজানো। সামনে পূজার সমস্ত উপকরণ—ঠাকুর-ঘরের মতই। পাশে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহার ক্ষীণ আলোতে ঠাকুরের চৌকির উপরের দেওয়ালে যে প্রকাণ্ড ছবিটা টাঙ্গানো রহিয়াছে সেটা ভাল করিয়া দেখা না গেলেও ছবিটা যে কোন জটা-জুটধারী সন্ন্যাসীর তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়, খুব সম্ভব ভবদেববাবুর গুরুদেব হইবেন।

ভবদেববাবু ঈষৎ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, এই নিয়েই আছি ভূপেন-বাবু, শুধু ঠাট, ভজন-পূজন ত দূরের কথা, ওঁকে ডাকবারই বা কতটুকু সময় পাই।…আহা-হা, হরি বল, হরি বল—

যতীনবাবু ভূপেনকে একরকম টানিয়াই লইয়া আসিলেন, নিজের ঘরে।

একেবারে হোস্টেলের একপ্রান্তে ছোট একটি ঘরে দুইটি তক্তপোশ পাতা—তাহার একটাতে যতীনবাবু থাকেন। আর একটা খালি ছিল, সম্প্রতি তাহার উপর ছেলেরা অপটুহস্তে ভূপেনের বিছানা খুলিয়া বিছাইয়া দিয়াছে। যতীনবাবু ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে কপাটটা ভেজাইয়া দিয়া কহিলেন, বাপ রে, ওর হাত থেকে পরিত্রাণ কি পাওয়া যায় সহজে? কী বে-আক্কেলে লোক দেখেছেন ত! আপনি এলেন তেতে-পুড়ে, একটু বিশ্রাম করতে ত দেওয়া উচিত! তা ছাড়া আমরাও ত পাঁচ-জনে একটু আলাপ করতে চাই—বিজয়বাবু বেচারা বুড়ো মানুষ, দুটি ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে ছিলেন ঐ জন্যে শুধু। তা কি কোন বিবেচনা আছে—কুচকুরে, স্বার্থ-পর লোক!

ভূপেন বুঝিল অপূর্ববাবুর কথা হইতেছে, কিন্তু এতটা ঝাঁজের কারণ কিছু অনুমান করিতে পারিল না। সে সুটকেস খুলিয়া ধোয়া কাপড় বাহির করিতেছে, যতীনবাবুই আবার ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কহিলেন, দেশে ঢের জমিজমা আছে মশাই, ভাইদের ফাঁকি দিয়ে, মামলা-মোকদ্দমা করে সব ও নিজে নিয়েছে—হ'লে কি হবে, পয়সার আহিংকে কিছুতেই যায় না। এখানে যে মাইনে পায় সব তেজারতীতে খাটায়। এত টাকা ছড়িয়েছে মশাই যে, ছুটিতেও এখন বাড়ি যেতে পারে না। সুদই কি কম, গত শ্রাবণ মাসে মেয়েটা টাইফয়েডে যায়-যায় হয়েছিল, তিরিশটি টাকা ধার নিয়েছিলুম, বলব কি মশাই, মাস-কাবার হতে তর সয় না, ঘাড়ে জোল দিয়ে বসে এক টাকা চোদ্দ আনা আদায় করে নেয়। আবার বলে কিনা, তাই আমার লোকসান যাচ্ছে—চাষাভুষো হলে টাকায় দু-আনা পেতুম···চামার চামার!

বোধকরি বা ঘৃণাতেই, তাঁহার কণ্ঠস্বর কিছুক্ষণের মত বাধিয়া গেল। সেই অবসরে ভূপেন একবার জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল, চলুন না একটু মাঠে গিয়ে বসি, চমৎকার চাঁদ উঠেছে।

যতীনবাবু অকস্মাৎ খুশী হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, মন্দ বলেন নি, তাই চলুন। এখানে আবার যে সব গুণধরেরা আছেন—আড়ি পাততেও পেছপা নন। দুটো কথা যে কইব মশাই প্রাণ খুলে—সে উপায় নেই। রাঢ়ের লোকগুলোই পাজি। আপনি আসবেন শুনে আমি মাস্টারমশাইকে বলে আমার ঘরে ব্যবস্থা করলুম।

ভূপেন একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, আপনিও কি কলকাতা থেকে এসেছেন?

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে যতীনবাবু উত্তর দিলেন, না—আমার বাড়ি হুগলী জেলায়।

মাঠে তখন চমৎকার জ্যোৎস্না নামিয়াছে। তৃণশূন্য, বৃক্ষলতাশূন্য দিগন্ত-প্রসারী মাঠে সে আলো কোথাও কিছুমাত্র ম্লান হইবার অবসর পায় নাই, পালিশ-করা রুপার পাতের মতই চক্‌চক্‌ করিতেছে। সেদিকে চাহিয়া ভূপেনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না—চাঁদের আলো যে এত উজ্জ্বল হয় তাহা সে এতদিন জানিত না,

জ্যোৎস্নার এই অপরিসীম ঔজ্জ্বল্য আর কোথাও কোনদিন ইতিপূর্বে দেখে নাই।

হোস্টেল হইতে অনেকটা দূরে, অর্থাৎ সর্বপ্রকার শ্রবণ-সম্ভাবনার বাহিরে গিয়া যতীনবাবু বসিলেন। পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে পূর্ব কথারই জের টানিয়া কহিলেন, একটা পয়সা খরচ নেই ভাই ওর, বললে বিশ্বাস করবেন না। হোস্টেল-খরচা মাসে চারটে টাকা, তাও ওর লাগে না। মাস্টারমশাইকে বলে কয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্টের পোস্টটাও নিয়ে নিয়েছে। মাস্টার-মশাই যখন নিজে হোস্টেলে থাকেন তখন ওঁরই সুপারিন্টেন্ডেন্ট হওয়ার কথা—আর সত্যি-সত্যি দেখেন উনিই. মাঝখান থেকে ও চারটে টাকা বাঁচিয়ে নিলে। সে দিন-কতক কী ভাগবত পড়ার ধুম আর মাস্টারমশাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে মালা জপ করা! ব্যস্—উনি গেলেন গলে—ওঁকে বোঝালে কি জানেন? বললে, আপনি যদি এই সব নিয়ে থাকেন তাহলে সাধন-ভজন করবেন কখন? আমি থাকতে আপনাকে এভাবে সময় নষ্ট করতে দেবো না। অথচ চাকরিটি বাগাবার শুধু ওয়াস্তা, কোথায় বা গেল মালা, কোথায় বা গেল ভাগবত। মাস্টারমশাই এখন আর চক্ষুলজ্জাতে কেড়ে নিতেও পারেন না।

কথা কহিতে কহিতে বিড়ি নিভিয়া গিয়াছিল, সেটা আবার ধরাইয়া দুই তিনটা টান দিয়া যতীনবাবু শুরু করিলেন, অবিচারটা দেখুন, আমরা সবাই ওর চেয়ে কম মাইনে পাই, অবস্থাও আমাদের ঢের খারাপ, কিন্তু সে কথাটা মাস্টার-মশাই একবারও ভেবে দেখলেন না। ঐ পণ্ডিতমশাই রয়েছেন, ছাপোষা লোক, মাইনে পান মোটে তিরিশটি টাকা—চারটে টাকা ওঁর বেঁচে গেলে কতখানি বাঁচত! তা ছাড়া অক্ষয় রয়েছে, আমি রয়েছি—এ কথাটা ওঁর ভেবে দেখা উচিত ছিল না?

তারপর অকারণেই গলার পর্দাটা নামাইয়া কহিলেন, ঐ অক্ষয়টাই কি কম নাকি, দিন-রাত মাস্টারমশাইয়ের ফরমাশ খেটে আর ওঁর সামনে লোক-দেখানো হরিনাম ক'রে এমন বাগিয়েছে যে চুরি করছে জেনেও মাস্টারমশাই ওকে কিছু বলেন না, ওর হাতেই সব বাজার, মায় ইস্কুলের যা কিছু খুচরো কেনা-কাটা খরচা, সব ওর হাতে। ইস্কুলেও কিছু করে না—এক নম্বরের ফাঁকিবাজ। আর চুকলি খাবার একখানি। খালি মোসাহেবীর জোরে চাকরি করে খায় মশাই, নইলে অন্য ইস্কুল হলে একদিনও চাকরি থাকত না। কিচ্ছু জানে না মশাই, বিশ্বাস করুন। নতুন এসেছেন, ঐ চীজটিকে খুব সাবধান।

সব শুনিয়া ভূপেনের মনটা কেমন যেন দমিয়া যাইতেছিল। মানুষ মানুষই, কলিকাতাতেও অবিনাশবাবু আছেন—সুতরাং দুঃখ করিবার কিছু নাই, কিন্তু বাড়ি হইতে, শহর হইতে, এত দূরে ওই নির্জন পল্লীগ্রামে যাহাদের সঙ্গে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে তাহাদের যে পরিচয় সে পাইতেছে, তাহাতে দমিয়া যাইবার কথা। বিশেষত এই যতীনবাবু, যে লোকটি তাহার ঘরেই থাকিবেন—আশ্চর্য, এতক্ষণ ধরিয়া সহকর্মীদের সম্বন্ধে বিষ উদ্গার করা ছাড়া আর কিছুই করেন নাই। কাহারও সম্বন্ধে বলিবার মত ভাল কথা কি কিছুই নাই?

যেন তাহার মনের কথাটা বুঝিতে পারিয়াই যতীনবাবু পুনশ্চ কথা কহিলেন হ্যাঁ, মানুষ বলি ঐ বিজয়বাবুকে, সাতেও নেই পাঁচেও নেই, একেবারে নিপাট ভাল মানুষ। মানুষের উপকার ছাড়া কখনও অপকার করেন না। অথচ তাঁরই সব চেয়ে দুরবস্থা, ঘরে একপাল ছেলে-মেয়ে, জমি বলতে বিশেষ কিছুই নেই, যা করে এখানের ঐ ক-টা টাকা মাইনে। ভাল লোক কি নেই, কাল চলুন ইস্কুলে সব পরিচয় করিয়ে দেব'খন—আমাদের অধর আছে, খাসা ছোকরা, একটু গান-বাজনার ঝোঁক আছে, তাই নিয়েই থাকে, কারুর কথায় কখনও নাক গলায় না।

তারপর হঠাৎ গলাটা আর একবার নিচু করিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনার ভাগবত পড়া আছে? চৈতন্যচরিতামৃত, নিদেন জয়দেবের দু-একটা শেলাক?

ভূপেন তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গিতে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, বিশেষ পড়া নেই, তবে দু-একবার উল্‌টে-পাল্‌টে দেখেছি বই কি। কেন বলুন ত?

যতীনবাবু যেন বিশেষ দুঃখিত হইয়া কহিলেন, তবে আর কি, আপনার চড়চড় করে মাইনে বেড়ে যাবে। যেমন ইনি, তেমনি সেক্রেটারী—হরি-হরি করেই গেল। আমি মশাই কিছুতেই ঐগুলো পড়তে পারি নে। যদি বা পড়ি ওষুধগেলা করে, কাজের সময় কিছুই মনে পড়ে না।

একটু পরেই খাওয়ার ঘণ্টা পড়িল। ভূপেন যতীনবাবুর সঙ্গে খাবার ঘরে গিয়া আহারে বসিল। খাবার ঘর না বলিয়া সেটাকে একটা আটচালা বলাই উচিত—রান্নাঘরের সংলগ্ন এমনি একটা স্থানে সার-সার আসন পড়িয়াছে। ছাত্র ও শিক্ষকেরা একসঙ্গেই বসিয়াছেন, কেবল শিক্ষকদের জন্য একটু স্বতন্ত্র পংক্তির ব্যবস্থা আছে এই মাত্র। ভবদেববাবু ভূপেনকে ডাকিয়া পাশে বসাইলেন, কহিলেন, বেড়াতে বেরিয়েছিলেন বুঝি যতীনবাবুর সঙ্গে? কেমন লাগল আমাদের দেশ?

ভূপেন একটু জোর দিয়াই কহিল, বেশ লাগল। সত্যি এমন চাঁদের আলো এর আগে আর কখনও দেখি নি। আপনার কি এই জেলাতেই বাড়ি?

ভবদেববাবু জবাব দিলেন, না, আমার বাড়ি বর্ধমান জেলায়,—তবে বেশী দূরে নয়। এখান থেকে নিকটেই—

সকলেই আসিয়াছিলেন, খালি পণ্ডিতমহাশয় ছাড়া। তাঁহার জন্য আসন একটি পাতাই ছিল। সেদিকে একবার চাহিয়া ভবদেববাবু হাঁক দিলেন, ঠাকুর, পণ্ডিতমশাইয়ের ভাত হ'ল?

ভূপেনের দিকে ফিরিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন, পণ্ডিতমশাই কারুর হাতে ভাত খান না। সব রান্না হয়ে গেলে ওঁর একটি ছোট হাঁড়ি আছে পেতলের, তাতেই ভাত চাপিয়ে দেওয়া হয়, উনি নামিয়ে নেন।

বলিতে বলিতেই পণ্ডিতমহাশয় একটা বেড়িতে করিয়া তাঁহার ছোট হাঁড়িটা ধরিয়া প্রবেশ করিলেন। ততক্ষণে অন্য সকলকেও ভাত দেওয়া হইয়া গিয়াছে—পণ্ডিতমহাশয় আসনে বসিতেই সকলে আহার শুরু করিয়া দিলেন। ভাত, একটা জলবৎ ডাল এবং আলু-বেগুন-কচুর একটা তরকারী। অন্য কোন উপকরণ নাই—ছাত্র ও শিক্ষকরা সকলেই সেই একমাত্র ব্যঞ্জন দিয়া আহার শেষ করিয়া

উঠিলেন। এতক্ষণে ভূপেন বুঝিতে পারিল যে মাসিক চার টাকায় কেমন করিয়া খাওয়ানো সম্ভব হয় ই'হাদের। ভবদেববাবু যেন কতকটা কৈফিয়ৎ দিবার মত করিয়াই কহিলেন, এখানে হপ্তায় দুদিন হাট হয় বটে, কিন্তু বিশেষ কিছুই মেলে না। বেগুন কচু আর কুমড়ো। কখনও কখনও উচ্ছে পাওয়া যায়—সেও দৈবাৎ।

ভূপেন পরে দেখিয়াছিল যে দৈবাৎ উচ্ছে পাওয়া গেলেও কোন সুবিধা হয় না। সেদিনও সেই একটাই মাত্র ব্যঞ্জন হয়, সকলে আগাগোড়া তেতো তরকারী দিয়া ভাত খাইয়া ওঠেন। বিশেষ কোনদিন ছাড়া দ্বিতীয় উপকরণের কথা ই'হারা ভাবিতেও পারেন না—মাছ ত কল্পনার অতীত। জমিদার বাড়িতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে মাছ ধরানো হইলে, এক-একদিন তিনি হয়ত কিছু মাছ পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, সেই সব দিনগুলিতে এখানে রীতিমত উৎসব পড়িয়া যায়।

আহারাদির পর ভবদেববাবু ভূপেনকে নিজের ঘরে আনিয়া বসাইলেন। সে যে জুতাটা বাহিরেই ছাড়িয়া আসিল তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি খুশী হইলেন। হুঁকাটার গা বাঁ-হাতে মুছিয়া লইয়া সেটাকে মুখের কাছে আনিয়া কহিলেন, যাক—আপনি তবু জুতোটা খুলে এলেন। আজকাল অনেকে ঠাকুরদেবতাদের ওটুকু সম্মানও দিতে চান না। ঠাকুর আছেন কি নেই—সেটা বড় তর্ক ভূপেনবাবু? থাকলেও আমার এইটুকুর মধ্যে আছেন কিনা সে কথাটাও আমি তুলব না, আমি শুধু বলতে চাই যে অপরের যদি বিশ্বাস থাকেই, সেটাকে আঘাত করে লাভটা কি বিশেষত যদি তাতে ক্ষতি না হয়—কি বলেন?

—সে ত বটেই। ভূপেন নির্বোধের মত ক্লান্ত কণ্ঠে সায় দিল।

হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া ভবদেববাবু কহিলেন, কেমন দেখছেন গ্রাম, থাকতে পারবেন? কখনও অভ্যেস নেই—মাস্টারী সহ্য হবে কি?

—খুব হবে। ভূপেন কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া কহিল, ছেলে পড়াতে আমার খুব ভাল লাগে। এখানে ছাত্রগুলি কেমন?

ঈষৎ অবজ্ঞায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভবদেববাবু কহিলেন,—ঐ একরকম। সত্যি কথা বলতে কি ও-কথা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই নি। জীবন-ধারণের জন্যে একটা বৃত্তি নেওয়া উচিত তাই একটা নিয়ে থাকা—কোনমতে দিনগত পাপক্ষয়। এমনিতেই সাধন-ভজনে বিঘ্নের অন্ত নেই—তার ওপর যদি দিনরাতই ঐ নিয়ে থাকব ত তাঁকে ডাকব কখন?

ভূপেন একটু বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। খানিকটা পরে ধীরে কহিল, তবু একটা দায়িত্ব ত আছে।

উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া ভবদেববাবু কহিলেন, কতটুকু ক্ষমতা আপনার ভূপেনবাবু, কী দায়িত্ব আপনি বইতে পারেন?…আমি ও-সব কিছু বুঝি না, জানি রাধারাণী আমাকে দিয়ে যা করিয়ে নেবার তা নেবেনই। তার বেশী হাঁকড়-পাকড় করে কোন লাভ নেই, তাতে ঠকতে হয়।

তারপর নীরবে কয়েকটা টান দিয়ে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, আপনার এধারের সাহিত্য কিছু-কিছু পড়া আছে? শ্রীমদ্ভাগবত? আমি গীতার কথা বলছি না, আমি বলছি ভগবানের—

—বুঝেছি। ভূপেন জবাব দিল, সামান্য সামান্য পড়েছি বৈ কি।

—বেশ বেশ। ভালই হ'ল, আপনার সঙ্গে তবু মধ্যে মধ্যে একটু আধটু আলোচনা করা যাবে। বড় খুশী হলুম শুনে। এখন ত লোক ভাবে বুড়ো না হ'লে বুঝি ও-সব বই পড়তে নেই।···বড় রাত হয়ে গেছে, আপনিও ক্লান্ত—নইলে একটা বই একটু পড়ে শোনাতুম। বড় ভাল বই একটা হাতে এসেছে—

ভূপেন আর বেশী ভদ্রতা করিতে পারিল না, তাঁহার প্রথম কথাটারও সূত্র ধরিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভবদেববাবু কহিলেন, চললেন ? আচ্ছা যান —শুয়ে পড়ুন গে। কাল তখন ভাল করে আলাপ হবে'খন।

ভূপেনের আসল ইচ্ছা ছিল হোস্টেলের ছেলেগুলির সহিত একটু আলাপ করিয়া বাজাইয়া দেখে কিন্তু তখন ক্লান্তিতে তাহার চোখের পাতা বুজিয়া আসিতেছে বলিয়া সে চেষ্টা আর করিল না। আন্দাজে আন্দাজে অন্ধকারেই নিজের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যতীনবাবু বেচারা বসিয়া ঢুলিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, যাক— তবু ভাল যে শিগ্‌গির ছাড়া পেলেন। আমি বলি এই রাত্রেই বুঝি আপনাকে ভাগবত শোনাতে বসে ; নিন মশাই শুয়ে পড়ুন। রাত ঢের হয়েছে।

তিনি আলো নিভাইয়া নিজেও শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভূপেন ঘুম পাওয়া সত্ত্বেও তখনই শুইতে পারিল না। বিছানায় বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। চাঁদের আলো তখন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যেন, বাহিরে মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিলে চোখ ধাঁধিয়া যায়।

নির্জন, অতি নির্জন পল্লীগ্রাম। কোথাও কোন প্রাণের লক্ষণ নাই। অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া সহসা ভূপেনের মনে হইল, সে যেন সেই সৃষ্টির প্রথম যুগে ফিরিয়া গিয়াছে, সে-ই এ পৃথিবীর প্রথম মানব। শহর, কোলাহল, আত্মীয়স্বজন—চির-পরিচিত সেই সব আবেষ্টনী যেন কোন সুদূরে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। সে যেন কোন জন্মান্তরের কথা, সে সব যেন স্বপ্নে দেখা।

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনযুদ্ধ বলিতে আজ আর কিছু রহিল না—সমস্তই তাহার জীবন হইতে লেপিয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই জনহীন, কোলাহল-হীন, আশাহীন, নির্বান্ধব, অপরিচিত জীবদের মধ্যে তাহার যেন সমাধি লাভ ঘটিয়াছে।

যাক—হয়ত ভালই হইল। যাহা গিয়াছে, যাহাকে রাখিতে পারা যায় নাই, তাহার জন্য বৃথা শোক আর সে করিবে না ; এমন কি এ সংশয়ও মনে রাখিবে না যে ইহার প্রয়োজন ছিল কিনা।···

ঘুমে সমস্ত চৈতন্য শিথিল হইয়া আসিতেছে, তাহারই মধ্যে মনে পড়িল সন্ধ্যার কথা। কাল সকালে কি তাহাকে একখানা চিঠি দিবে ? না, দরকার নাই— তাহাদের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে অবাঞ্ছিত নিজেকে সে বারবার নিক্ষেপ করিবে না কিছুতেই। সন্ধ্যা সুখী হোক—আর কিছুই সে চায় না।

স্কুলটি ছোট—মোট শ-দুই ছাত্র। সে অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা খুব কম নয়। যে সব শিক্ষক আছেন, বেশী খাটিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা একটু মন দিলেই ইহাকে প্রথম শ্রেণীর বিদ্যায়তনে পরিণত করা যায়। কিন্তু কয়েকদিন পড়াইবার পরই ভূপেন বুঝিতে পারিল যে, এই ব্যাপারটা লইয়া এখানে কেহই মাথা ঘামায় না। স্কুলে একটাও খবরের কাগজ আসে না, গ্রামে নাকি মোটে একখানা কাগজ আসে জমিদারের বাড়ি, কিন্তু দুনিয়ার সংবাদের জন্য এত বেশী আগ্রহ ইঁহাদের কাহারও নাই যে সেখানে গিয়া পড়িয়া আসিবেন। কখনও কোন লোকের সঙ্গে দেখা হইলে ভাসা ভাসা দুই-একটা সংবাদ সংগ্রহ করেন—নহিলে অধিকাংশ সময়ই গ্রামের সাধারণ চাষীদের মধ্যে প্রচারিত এবং তাহাদের নিকট হইতে সংগৃহীত গুজব লইয়া আলোচনা করেন। শুধু বাহিরের খবর নয়, বইও দুষ্প্রাপ্য। গ্রামে লাইব্রেরী নাই, থাকা সম্ভব নয়—স্কুলের লাইব্রেরী আছে, বার্ষিক ষাট টাকা তাহার জন্য বরাদ্দও আছে, কিন্তু পুরাতন বই বাঁধাই, ম্যাপ প্রভৃতি কিনিতেই তাহার অর্ধেকের বেশী চলিয়া যায়, বাকী টাকায় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া শুধু বৈষ্ণবধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ কেনা হইয়াছে—বলা বাহুল্য, ভবদেব-বাবু ছাড়া সে সব বই আর কেহই পড়েন না। কিন্তু সেজন্য কোন ক্ষোভ বা বেদনা-বোধও কাহারও মনে নাই, কেহ এ বিষয়ে প্রতিবাদ ত দূরের কথা, আলোচনা পর্যন্ত করেন না। অর্থাৎ সাহিত্য গ্রন্থ থাকিলেও যে তাঁহারা কেহ পড়িতেন, বিজ্ঞান কি ইতিহাস বা অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভে যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, এমন সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। শুধু যতীনবাবু কী একটা নূতন উপন্যাস লাইব্রেরীতে কিনিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ভবদেববাবু কেনেন নাই—এজন্য মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করিয়া থাকেন। গত গরমের ছুটিতে একটা বিখ্যাত ফিল্ম্ তিনি দেখিয়া আসিয়াছিলেন, ঐ উপন্যাসখানিই নাকি সেই ফিল্মের ভিত্তি।

ফলে, বহুদিন আগে স্কুল কলেজে পড়িবার সময় যেটুকু বিদ্যা বা জ্ঞান শিক্ষকরা আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা বৃদ্ধি ত পায়ই নাই—এত দিনের অব্যবহারে তাহারও অনেকখানি মরিচা পড়িয়া গিয়াছে। সবচেয়ে দুর্দশা নিচের ক্লাসগুলিতে। ভূপেন নিজে যখন ছোট ছিল, তখন স্কুলে কি ভাবে পড়ানো হইয়াছে তাহা আজ আর তাহার মনে নাই। তাই মোহিতবাবু যখন বার বার দুঃখ করিয়া বলিতেন—যেখান থেকে শিক্ষার বনেদ গড়ে ওঠে, সেইখানেই আমাদের দেশে সবচেয়ে অবহেলা বাবা, এদিকে যত দিন না আমরা মন দিচ্ছি ততদিন আমাদের নতুন করে জেগে ওঠার কোন আশা নেই, অনার, প্রেস্টীজ, ন্যাশনালিজ্‌ম্—এ সমস্ত সেন্‌স্‌গুলো যদি বাল্যকাল থেকে গড়ে না ওঠে ত পরে হাজার ভাল কথা বললেও বোঝানো যাবে না—অথচ সে সব শেখাবে কারা! লেখাপড়াটাই ভাল করে শেখানো হয় না। যত অপদার্থ লোক সব দেওয়া হয় নিচের ক্লাসে। অথচ ও-দেশের বই-কাগজে অনবরত দেখি—শিশুদের কী করে লেখাপড়া শেখাবে তাই নিয়ে ওদের দুশ্চিন্তার সীমা নেই—অনবরতই গবেষণা চলছে।

আর ওদের কথাই বা শুনতে হবে কেন বাবা, এ ত সহজ কথা যে বনেদ শক্ত না হ'লে সারা ইমারতই দুর্বল হয়ে থাকে।...তখন সে কথার অর্থটা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই—কথাটা মর্মে মর্মে অনুভব করিল আজ, সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া।

আমাদের দেশে শিক্ষার যে কয়টা স্বীকৃত মাপকাঠি আছে, নিচের ক্লাসে যাঁহারা পড়ান, সে মাপকাঠিতেও তাঁহারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। লেখাপড়া তাঁহাদের জানা ছিল নামমাত্র—সেই সামান্য সঞ্চয়টুকুই তাঁহারা অভাবে, অস্বাস্থ্যে ও অব্যবহারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। মাহিনা পান অতি সামান্য—তাহাতে সংসার চলে না। কলিকাতায় সে নিজে টিউশনি করিতে গিয়া এই শ্রেণীর শিক্ষক কয়েকজনকে দেখিয়াছে, সেখানেও ইঁহারা মাহিনা পান লজ্জাকর রকমের কম। সেজন্য সংখ্যা দিয়া সেটাকে পূরণ না করিলে চলে না। এক-একজন সকালে-বিকালে আটটা পর্যন্ত টিউশনি করেন, ফলে স্কুলে যখন যান তখন শ্রান্তিতে তাঁহাদের সমস্ত স্নায়ু অবশ হইয়া আসে। এখানে টিউশনি নাই কিন্তু জমি-জমা চাষ-বাস আছে। পয়সার জোর নাই বলিয়া সে ব্যাপারেও খাটিতে হয় বেশী—সংসারের কাজও শহরের তুলনায় পল্লীগ্রামে অনেক বেশী—স্কুলে আসিয়াই বলিতে গেলে তাঁহারা বিশ্রামের অবকাশ পান। সুতরাং ভাল করিয়া পড়ানো ত দূরের কথা, ছেলেদের দিকে চোখ মেলিয়া বসিয়া থাকাই সম্ভব হয় না। কোনমতে গতানুগতিকভাবে পড়া দেওয়া ও পরের দিন পড়া ধরা হয়—সে পড়াটা যে স্কুলেই তৈয়ারী করিয়া দেওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কাহারও ধারণা পর্যন্ত নাই। যেন পড়াটা ছেলেরা বাড়িতে তৈয়ারী করিয়াছে কিনা এইটা পরীক্ষা করিবার জন্যই শুধু তাঁহারা বেতন পান। অসহায় শিশুর দল ভুলে-ভরা অর্থ-পুস্তক মুখস্থ করিয়া কোনমতে ক্লাসে পড়া দেয় এবং পরীক্ষায় পাস করে। যতটা মুখস্থ করে তাহার মধ্য হইতে দুই-একটা বাক্য ছাড় পড়িলেও তাহারা ধরিতে পারে না—যেটুকু লিখিল তাহার অর্থ হয় কিনা বুঝিবার মত বিদ্যাও তাহাদের কাহারও নাই। শিক্ষকেরাও ইহাতে অভ্যস্ত, ছেলেদের উত্তর-পত্র দেখিয়া কে আশুতোষ দেব এবং সুবল মিত্রের অর্থপুস্তক ব্যবহার করে—এ নাকি তাঁহারা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন, এ-ই তাঁহাদের গর্ব। তাঁহারা নম্বর দেন সেই-ভাবে, মধ্যে পদ বা বাক্য ছাড় পড়িলে সেই অনুপাতেই নম্বর কাটেন—সবটার অর্থ দাঁড়াইল কিনা সেটা বিবেচনা করিয়া পরীক্ষা করেন না, কারণ, তাহা হইলে না কি 'ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়' হয়।

সব চেয়ে মজার কথা এই যে, অঙ্ক পর্যন্ত এখানে মুখস্থ চলে। পরীক্ষার পূর্বে মাস্টারমশায়রা শক্ত শক্ত অঙ্কগুলি বোর্ডে কষিয়া দেন, ছেলেরা খাতায় হুবহু টুকিয়া লয়, এবং সেইভাবে মুখস্থ করিয়া গিয়া পরীক্ষাপত্রে লেখে। সেখানেও দুই-একটা ধাপ বাদ চলিয়া গেলে অসুবিধা নাই—তাহাতে দুই-এক নম্বর কাটা যায় মাত্র। উপরের ক্লাসে, হেডমাস্টার নিজে যেখানে পড়ান, এমন কি সেখানেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে কি প্রশ্ন আসিতে পারে সেইটা হিসাব করিয়া পড়ানো হয়। কোন ধৃষ্ট ছাত্র যদি অন্য দু-একটা প্রশ্ন করিয়া ফেলে ত মাস্টার-

মহাশয়রা অম্লানবদনে এই বলিয়া থামাইয়া দেন যে,—ও-সব কোশ্চেন আসে না কখনও। তার চেয়ে আমি যেগুলো বলি দাগ দিয়ে নে। এইগুলো ইম্পর্টেণ্ট, ওটা লিখে রাখ ভেরি ইম্পর্টেণ্ট।

ছেলেরা সেইভাবে তৈয়ারী হইতেছে। অপেক্ষাকৃত ভাল ছেলে যাহারা, তাহারা পূর্ব-পূর্ব বৎসরের ম্যাট্রিকের প্রশ্নপত্র এবং গত বৎসরের টেস্টপেপারগুলি হইতে কঠিন প্রশ্নের জবাব শিক্ষকদের নিকট হইতে লিখাইয়া লয় এবং সেই উত্তরগুলি রাত জাগিয়া মুখস্থ করে। ইহার বেশী তাহারাও জানিতে চাহে না, শিক্ষকরাও জানান না।

ভূপেনের মন এই দূষিত বাতাসে যেন হাঁপাইয়া ওঠে। তাহার স্বপ্ন, তাহার আদর্শ, শিক্ষার এই প্রহসনে বার বার অপমানিত হয়। তাহার ক্ষুব্ধ আত্মা অন্তরে অন্তরে গজরাইতে থাকে, মিছিমিছি ছেলেগুলির এ কৃচ্ছ্রসাধন কেন? এত কষ্ট করিয়া এ কিসের তপস্যা করিতেছে তাহারা? শিক্ষার, না জ্ঞানের, না পাস করার—না চাকরি করার? ছাত্র বা শিক্ষক কাহারও সামনেই শিক্ষার আদর্শ নাই। ছাত্রদের একমাত্র চিন্তা পাস করিয়া শহরে চাকরি পাইব—শিক্ষকদের একমাত্র চিন্তা ইহাদের পাস করাইয়া চাকুরি বজায় রাখিব। দেশ বা ভবিষ্যৎ জাতি সম্বন্ধে তাঁহাদের যে এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব আছে সে কথা স্মরণ করাইতে গেলে হয় ত বা তাঁহারা চমকাইয়া উঠিবেন। ভূপেনকে ক্লাস সেভেন ও এইট-এ ইংরাজী এবং ইতিহাস পড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল। সে প্রথমটা পড়াইতে গিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িল। মোহিতবাবুর সংসর্গে আসিয়া শিক্ষাদান সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ অন্য রকমের ধারণা হইয়াছিল—শিক্ষাসম্পর্কিত বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও তিনি পড়াইয়াছিলেন ভূপেনকে—কিন্তু পড়ানোর সে সব পদ্ধতির সহিত এই ছাত্রগুলির পরিচয় মাত্র নাই—তাহারা শুধু অবাক হইয়া চাহিয়াই থাকে না, পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে, হাসাহাসিও করে। ভূপেন যায় তাহাদের পড়াটা বুঝাইয়া দিতে, কিন্তু এই বোঝানোটা যে কি পদার্থ সেইটাই বুঝিতে না পারিয়া তাহারা অস্বস্তি বোধ করে। তাহাদের সেই বিস্মিত ও শূন্য-দৃষ্টির দিকে চাহিয়া ভূপেনের বুকের ভিতরটা ভারী হইয়া আসে—এই সব মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে কোন দিন যে ভাষা ফুটাইতে পারিবে, সে আশা আর রাখা যেন সম্ভব হয় না।

পড়াইতে আরম্ভ করার দিন-পনেরোর মধ্যে বার-কয়েকই এই শিক্ষকতা ছাড়িয়া কলিকাতায় ফিরিবার সংকল্প করিয়াছে ভূপেন, কিন্তু তাহার পিতার বিলাপ এবং অবিনাশবাবুর বিদ্রূপের হাসি কল্পনা করিয়া আবার মনকে দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছে। তা ছাড়া, সেখানে গিয়া করিবেই বা কি? এ তবু তাহার নেশার জিনিস, আশার জিনিসও বটে। সেখানে এখন ফিরিয়া গেলে ত সেই কেরানীগিরি ছাড়া আর কোন পথ খোলা পাইবে না। সে যে কি ব্যাপার তাই বা কে জানে, সে যদি আরও অসহ্য বোধ হয়? তার চেয়ে এই ভাল—এখানে সে যদি একটি ছাত্রের মধ্যেও যথার্থ জ্ঞানের পিপাসা জাগাইতে পারে, যদি একটি ছেলেকেও অন্ধকারে আলোর সন্ধান দিতে পারে, তাহা হইলেও এ কষ্টভোগ, আত্মার এ অবমাননা হয় ত সার্থক হইবে।

ভূপেন একটা ব্যাপারে কিছু সুফলও পাইল। সে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে সাধারণ জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় অথচ শিক্ষাতেও সাহায্য করে, অন্তত তাহাতে অনুরাগ বাড়ে এমন সব গল্প বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এবং সে ইচ্ছা করিয়াই পাঠ্য পুস্তকের অগ্রগতিকে সংহত করিয়া গল্পের সংখ্যা দিয়াছিল বাড়াইয়া। আর কোন ফল হউক না হউক—তাহার সম্বন্ধে প্রাথমিক একটা যে বিদ্বেষ ও অপরিচয়ের ভাব ছিল, ছেলেদের মন হইতে সেটা দ্রুত দূর হইয়া গেল—এখন বরং তাহারা আগ্রহের সহিতই ভূপেনের ক্লাসের অপেক্ষা করে। শুধু তাই নয়, ভূপেন দেখিল, শিক্ষকেরা ছাত্রদের সম্বন্ধে যে অনুযোগ করেন, বুঝাইয়া দিলে তাহারামনে রাখিতে পারে না বলিয়াই বাধ্য হইয়া তাঁহারা মুখস্থ করান, সেটা সম্পূর্ণ না হোক অংশত ভিত্তিহীন। কারণ, ভূপেন বহু দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে, গল্পগুলি একবার মাত্র শুনিয়াই তাহারা মনে করিয়া রাখে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই সেটা পরে আনুপূর্বিক বেশ গুছাইয়া বলিতে পারে। যাহারা এটা পারে, তাহারা যে পড়াটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে মনে রাখিতে বা লিখিতে পারিবে না কেন—এ কথাটা ভূপেনের মাথায় কিছুতেই যায় না।

কিন্তু এ-ধারে সুফল পাইলে কি হইবে, বিপদ ও বাধা আসিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। হঠাৎ একদিন রাত্রে আহারের পর মাঠে বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া যতীনবাবু তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, ও মশাই, এ-ধারে শুনেছেন ঐ অক্ষয় শালা আপনার নামে কি লাগিয়েছে মাস্টারমশায়ের কাছে ?

ভূপেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। সে তাহার সহকর্মীদের সহিত যথাসাধ্য সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহারই করে, কোথাও কোন ঔদ্ধত্য বা দুর্বিনয় প্রকাশ না পায় সেদিকে তাহার খুব সতর্ক দৃষ্টি থাকে—কিন্তু এ আবার কি কথা ? তাহার সম্বন্ধে কাহারও বিদ্বেষ পোষণ করার ত কথা নয়।

সে কহিল—কৈ না ত! আমি আবার কি করলুম ?

যতীনবাবু অকারণেই গলাটা খাটো করিয়া কহিলেন—আপনি নাকি বড্ড ফাঁকি দেন ক্লাসে, পড়ার ধার দিয়েও যান না, কেবল গল্প করেন—এই সব। মাস্টারমশাই সে কথা শুনে পদনকে ডেকে পাঠিয়ে কত কি জিজ্ঞেস করলেন—

ক্রোধে ও ক্ষোভে ভূপেনের ললাটের শিরা দুইটা যেন বেদনায় টন্‌টন্‌ করিতেছিল, সে কতকটা নিশ্বাস রোধ করিয়া প্রশ্ন করিল—কী বললে পদন ?

যতীনবাবু কহিলেন—পদন আপনার খুব মুখরক্ষা করেছে। সে বলেছে, না, উনি গল্প ত এমনি করেন না, আমাদের পড়া বুঝিয়ে দেবার জন্যে মাঝে মাঝে উদাহরণস্বরূপ দু-একটা গল্প বলেন।

যতীনবাবু আরও কত কি বলিয়া গেলেন—তাহার একটি কথাও ভূপেনের মাথায় ঢুকিল না, সে শুধু একটা অসহ ও নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত অন্তরটা তাহার রি-রি করিতেছিল। যাহারা যথার্থ ফাঁকি দেয়, যাহাদের শিক্ষা বা শিক্ষকতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ নাই, তাহারাই কিনা অপরের ফাঁকি ধরিতে যায়! আশ্চর্য সাহস ত।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া বিনিদ্র প্রহরগুলির ফাঁকে ফাঁকে বার বার মন স্থির করিবার চেষ্টা করিল—এ প্রহসনে আর প্রয়োজন নাই, এইখানেই শেষ করিয়া চলিয়া যাইবে সে। কিন্তু বার বারই মোহিতবাবুর কথাগুলি তাহাকে সে সংকল্প হইতে ফিরাইয়া দিল। মনে পড়িল, মোহিতবাবু একবার কী একটা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'বাবা, কর্তব্যের দায়িত্ব বুঝে তা পালন করতে পারে, এমন কি করার চেষ্টাও করে, এ রকম লোক আমাদের দেশেই খুব কম। কাজেই কোথাও তার অভাব দেখলে দুঃখ ক'রো না।' এ ধরনের তুচ্ছ কারণে হয় ত এই কথা প্রয়োগ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা, তবু সে এই কথাগুলি স্মরণ করিয়াই মনে বল পাইল। মোহিতবাবুকে সে শ্রদ্ধা করিত বটে, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেকটি কথাই যে এমন করিয়া মনে গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছে তাহা সেদিন ছিল কল্পনারও অতীত।

পরের দিন সেক্রেটারী আসিলেন স্কুল দেখিতে। সেক্রেটারী স্থানীয় জমিদার, তাঁহারই অর্থে স্কুলের পাকা বাড়ি হইয়াছে। লোকটি নাকি এককালে ইন্টার-মিডিয়েট পাস করিয়া মেডিক্যাল কলেজেও ঢুকিয়াছিলেন, তাহার পর আর পড়াশুনা অগ্রসর হয় নাই। অবশ্য তাহাতে সেক্রেটারী হইতে বাধে নাই, কারণ অর্থবল ছিল এবং তিনিই গ্রামের মধ্যে একমাত্র লোক—স্কুলটি সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ আছে।

স্কুল দেখিতে আসিলেও তিনি কিন্তু অন্য কোথাও গেলেন না, অফিস-ঘরে বসিয়া দুই-একখানা চিঠি সই করিয়াই ভূপেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভূপেন তখন পাশের ঘরে অর্থাৎ শিক্ষকদের বসিবার ঘরেই ছিল, সে এ ঘরে আসিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, যতীনবাবু পাশ হইতে প্রায় বিবর্ণ মুখে কহিলেন,—খুব সাবধান ভাই, দেখবেন আপনার পড়ানো নিয়ে কথা উঠবে নিশ্চয়।

বিরক্তিতে ভূপেনের মন ভরিয়া গেল, তবু সে অতি কষ্টে চিত্ত দমন করিয়া শান্তমুখেই এ-ঘরে আসিল। সেক্রেটারী হাসি-হাসি মুখে অভ্যর্থনা করিলেন—এই যে আসুন ভূপেনবাবু, কেমন লাগছে আমাদের দেশ ? বসুন, বসুন—

ভূপেন সবিনয়ে নমস্কার জানাইয়া উত্তর দিল—ভালই লাগছে। বেশ দেশ আপনাদের।

তার পর আরও দুই-একটা কুশল প্রশ্নের পর সেক্রেটারী কহিলেন—সামনে এগজামিন আসছে, এখন অবশ্য পড়াশুনোর কোন প্রশ্নই ওঠে না—তবু রিভিসনটা বেশ 'থরো' হওয়া দরকার। এই সময় একটু তাড়াতাড়ি করবেন, বুঝলেন ? আপনাকে আর বেশী বলব কি, তবে আমাদের দেশের ছেলেরা বড় ব্যাকওয়ার্ড বোঝেন ত, সারা বছরের পড়াটা এই সময় আর একবার ঝালিয়ে না দিলে—বুছলেন না ? এটা পল্লীগ্রামের স্কুল বটে ত ?

ভূপেনের কানের কাছটা অকারণেই কতকটা গরম হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, যতীনবাবুর অনুমানই ঠিক। মুহূর্ত-কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—দেখুন আপনাদের এখানে যে সিস্টেমে পড়ানো হয়, তা কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক

মেনে নিতে পারে না। আপনি রিভিসনের কথা বলছেন, আমি ত দেখছি, তাদের আদৌ পড়ানোই হয় নি—সেক্ষেত্রে রিভিসন কি করাব বলুন।

হেডমাস্টার ভবদেববাবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, পাশের ঘরের পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া যতীনবাবুর দল ভূপেনের আসন্ন সর্বনাশের কথা চিন্তা করিয়া সেই শীতকালেই ঘামিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভূপেন তখন মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছে, সে যখন অন্যায় করে নাই তখন মাথা নিচু করিয়া তিরস্কার ত নয়ই, এমন কি তাহার কোন প্রকার ইঙ্গিত পর্যন্ত মানিয়া লইবে না।

সেক্রেটারী কতকটা স্তম্ভিতভাবেই প্রশ্ন করিলেন—আ-আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না ত।

ভূপেন কণ্ঠস্বরে বেশ জোর দিয়াই কহিল—ছেলেদের পড়াটা বুঝিয়ে দেওয়াই হ'ল পড়ানোর আসল উদ্দেশ্য, অন্তত আমরা তাই জানি, কিন্তু আপনাদের এখানে দেখি, বইয়ের খানিকটা জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হয়, বড় জোর একবার নিজেরা রিডিং পড়ে দিয়ে সেটা বোঝবার এবং তৈরী করবার সমস্ত দায়িত্ব ছাত্রদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে তারা কতকগুলো মানের বই দেখে রিডারগুলো পড়ে আর হিস্ট্রি জিওগ্রাফী—মাস্টারমশাইরা যেটাকে ইম্পর্টেন্ট বলে দাগ দিয়ে দেন সেই-গুলো মুখস্থ করে। তাই ওদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে অঙ্কসুদ্ধ ওরা মুখস্থ করতে চায়। একে কি আপনি পড়ানো বলেন? এ পড়া ওদের কি কাজে আসবে? এরই ফলে আমরা আজ জাতি হিসেবে সর্বত্র হটে যাচ্ছি। জেনেশুনে ছেলেদের এ সর্বনাশ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

সেক্রেটারীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, কহিলেন—তাহলে এঁরা কি সবাই ছেলেদের সর্বনাশই করছেন এখানে বসে?

—জেনে করছেন না। হয়ত এঁরা এত-সব কথা কোন দিন এভাবে ভেবেই দেখেন নি—গতানুগতিকভাবে বহু দিন থেকে যে প্রথায় পড়ানো চলে আসছে তারই পুনরাবৃত্তি করছেন মাত্র। কিন্তু আমি এ নিয়ে ভেবেছি, বহু বইও পড়েছি। শিক্ষা সম্বন্ধে ও দেশে যে সব গবেষণা-আলোচনা চলছে তার সবটা না হোক খানিকটারও খবর রাখি। আমি যেটুকু পড়াচ্ছি সেটুকু যতক্ষণ না ছাত্ররা ভাল করে এবং সহজে বুঝতে পারছে, ততক্ষণ আমি এগোতে পারব না। তাতে তাদের পরীক্ষার ফল ভাল হোক্ আর না হোক্—

তাহার কঠিন কণ্ঠস্বরে সেক্রেটারী বোধ করি একটু দমিয়াই গিয়াছিলেন। খানিকটা ইতস্তত করিয়া কহিলেন—কিন্তু পরীক্ষায় পাস করাটাও ত দরকার, গরিব ছেলে এখানকার, একটা বছর নষ্ট হ'লে ক্ষতি হবে না কি?

ভূপেন জবাব দিল—অন্য সাবজেক্ট ত আছে, সেগুলোয় পাস করলে আমার সাবজেক্টের জন্যে আটকাবে না। তা ছাড়া সারা বছরে অনেক মুখস্থ করেছে ওরা, তাতেই পরীক্ষা দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু সেদিক দিয়ে একটু অসুবিধা হলেও, আমার কাছে যতটুকু পড়েছে সেটুকু তাদের সত্যিকার কাজে আসবে।

তারপর একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অবশ্য আপনাদের যদি অসুবিধা

হয় সে আলাদা কথা, সেক্ষেত্রে কোন রকম সঙ্কোচ না করে বলবেন আমি নিঃশব্দেই সরে যাবো। কিন্তু পড়ানোর দায়িত্ব যতক্ষণ আমার ওপর থাকবে, ততক্ষণ আমার বিবেক অনুসারেই আমি চলবো, নিজেকে ফাঁকি দিতে পারবো না। আচ্ছা, নমস্কার।

ভবদেববাবুকেও একটা নমস্কার করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

॥ ১০ ॥

ব্যাপারটা লইয়া জল্পনা-কল্পনার অন্ত রহিল না। চাকরি যে ভূপেনের যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—শুধু সেটা কবে, সেই তারিখটা লইয়াই যত কিছু আলোচনা। শুধু তাই নয়, ইহার পর দুই-তিন দিন এক বিজয়বাবু ছাড়া অন্য কোন শিক্ষক ভূপেনের সহিত প্রকাশ্যে কথা কহিতেই সাহস করিলেন না। শুধু পণ্ডিতমহাশয় আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, বেশ করেছ ভায়া। আমরা সংসারে জড়িয়ে পড়েছি, আমাদের এখন কোনমতে দিনগত-পাপক্ষয় ক'রে যাওয়া, কিন্তু তোমরা জেনেশুনে অন্যায় করবে কেন! ভালই বলেছ, এরা না রাখে তোমার মত কৃতী ছাত্রের মাস্টারীর অভাব হবে না।

আর প্রকাশ্যেই বাহবা দিলেন বিজয়বাবু। মানুষটি অত্যন্ত নিরীহ, তাঁহার দারিদ্র্যও সর্বজনবিদিত, কিন্তু তবু তিনিই সকলকার সামনে কমন-রুমে বসিয়া বলিলেন, তুমি ভাই আজ যা বলে এলে তাতে এক দিক দিয়ে আমাদেরই অপমান করা হ'ল বটে, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে আমাদের মুখও রাখলে। আমাদের যে বিবেক আছে, দায়িত্ব আছে, একথাটা যেন আমরা ভুলেই গেছি। আর সত্যিই ত, আমরা ছেলেদের পড়াবো আমাদের রিস্‌ক্‌-এ, সেখানে যদি অন্যায় কিছু না থাকে তাহ'লে ও'দের কাছে আমরা ভয়-ভয় করেই বা চলবো কেন, আর ও'দের ডিক্টেশানই বা মানবো কেন!

ইঁহারা যতটা ভয়ই করুন—ভূপেনের নিজের বিশ্বাস ছিল, শেষ পর্যন্ত সেক্রেটারী কথাটা হজমই করিবেন। সে যখন চলিয়া আসে তখন অন্তত তাঁহার মুখের চেহারায় সেই কথাই ছিল। আর হইলও তাই—একে একে দুই দিন চারি দিন কাটিয়া গেল, না সেক্রেটারী না হেডমাস্টার কাহারও তরফ হইতে কোন উচ্চবাচ্য হইল না। বরং ভবদেববাবু একদিন ভূপেনকে ডাকিয়া বলিলেন, কাল সেক্রেটারী আপনার পড়ানো আড়াল থেকে শুনেছেন। তিনি খুব প্রশংসা করলেন আপনার মেথডের। এসব কি আপনি বই পড়ে শিখেছেন?…হ্যাঁ, এডুকেশন সম্বন্ধে অনেক বই বেরিয়েছে বটে আজকাল, আমাদের প্রথম বয়সে এসব ছিল না, পড়িও নি। এখন আর সময় হয় না, কাজের বই—মানুষের জীবনে যা সত্যিকারের কাজে আসবে, তাই বা কখানা পড়তে পাই এখন!…রাধে রাধে,—জানি না রাধারাণী কোন দিন অবসর দেবেন কিনা আবার।

এক্ষেত্রেও মোহিতবাবুর কথাটা কাজে লাগিয়া গেল, তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'মানুষকে যত ভয় করবে বাবা, তত সে পেয়ে বসবে। এক পক্ষ কঠিন হলেই দেখবে অপর পক্ষ নরম হয়ে গেছে। একটা কথা মনে রেখো, ভবিষ্যৎ জীবনে যদি

কোথাও কোন বোঝাপড়া করার সময় আসে আর সে সময় যদি সত্য তোমার দিকে থাকে, তাহলে তুমিই আগে রুখে উঠবে—তা প্রতিপক্ষ যত প্রবলই হোক।'

কথাটা ভূপেন প্রচার না করিলেও চাপা রহিল না। ফল হইল এই যে, এবার শিক্ষক মহাশয়েরা দুটি বড় দলে ভাগ হইয়া গেলেন। একদল ভূপেনের অনুরাগী হইয়া উঠিলেন, আর এক দল মুখে মিষ্টি কথা বলিয়া এবং সমীহ করিয়া চলিলেও মনে মনে তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিলেন। শেষোক্ত দলের দলপতি হইলেন অপূর্ববাবু। ভূপেনের প্রথম হইতেই এই মানুষটিকে ভাল লাগে নাই, অপূর্ববাবুরও মনোভাব তাহার সম্বন্ধে কখনও ভাল ছিল না। এখন তিনি স্পষ্টই ভূপেনকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভূপেন এতদিন মোহিতবাবুর কাছে বৃথা শিক্ষা পায় নাই, সে নিজের শান্ত উপেক্ষার বর্মে তাঁহার সমস্ত আক্রমণই ফিরাইয়া দিত—কোন বিদ্রূপই তাহার সে বর্ম ভেদ করিয়া তাহাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

কিন্তু এই সমস্ত দলাদলির মধ্যে একজন শুধু ছিলেন অত্যন্ত নির্বিরোধী, পবিত্র—তিনি বিজয়বাবু। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই ভূপেন এই মধুর-প্রকৃতির মানুষটির অনুরক্ত হইয়া উঠিল। লোকটি দরিদ্র, লেখাপড়াও ভাল করিয়া করিতে পারেন নাই—বি-এ ফেল করিয়া মাস্টারী করিতে ঢুকিয়াছিলেন, সেদিন আশা ছিল যে, আর একবার পরীক্ষা দিয়া বি-এ এবং এম-এ পাস করিবেন চাকুরী করিতে-করিতেই; কিন্তু সংসারের চাপে সেটা আর কোন দিনই সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। তাই আজও তাঁহাকে অল্প বেতনে নিচের ক্লাসেই মাস্টারী করিতে হয়—আজও প্রতিটি দিনের সমস্যা তাঁহার কাছে জীবন-মরণের সমস্যা হইয়া আছে; সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁহাকে আহারাদি সারিয়া প্রদীপের সামান্য তেলটুকু বাঁচাইবার সাধনা করিতে হয়। অথচ—বিজয়বাবু একদিনমাত্র দুঃখ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন—তাঁহার এক দূর-সম্পর্কের মামা ছিলেন রেলের বড় অফিসার, তিনি বার বার বলিয়াছিলেন যে বি-এ পাস করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেই তিনি একটা ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। গ্র্যাজুয়েট যে নয় তাহাকে আত্মীয় বলিয়া তিনি পরিচয় দিতে পারিবেন না, বা আত্মীয় পরিচয় দিয়া কোন ছোট কাজেও লাগাইতে পারিবেন না, কিন্তু সে সুযোগ বিজয়বাবু লইতে পারেন নাই—আর একটা বছর পড়িবার মত বা অপেক্ষা করিবার মত সংস্থান ছিল না বলিয়া।

ভূপেন প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু আপনি ফেলই বা করলেন কি করে। আপনাকে দেখে ত ঠিক সে শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন বলে মনে হয় না।

মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া বিজয়বাবু উত্তর দিয়াছিলেন, ফোর্থ ইয়ারে উঠতেই মা মারা গেলেন, বাবা বুড়ো মানুষ, রাঁধতে পারতেন না, আমিও বড় অপটু ছিলাম ওসব ব্যাপারে। তাই বাধ্য হয়েই বাবা বিয়ে দিলেন। মায়ের মৃত্যু, তার ওপর পরীক্ষার ঠিক আগে বিয়ে—দুটো জড়িয়ে কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। নইলে পড়াশুনোয় আমার সত্যিই মন ছিল ভাই—আমরা বড় গরিব তা ত জানই, ছেলেবেলায় যখন খুব ক্ষিধে পেত, বই নিয়ে বসতুম। পড়তে বসলে

আর ক্ষিধের কথা মনে থাকত না।

আরও একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বিজয়বাবু আবার বলিলেন, অবশ্য ফেল করার জন্যে আমি কারুরই দোষ দিই না, এমন কি অদৃষ্টেরও না—আমার স্ত্রী বড় মিষ্টি মেয়ে ছিলেন—হয়ত ঠিক রূপসী নন, তবু তাঁকে পেয়েই আমার জীবন ধন্য হয়েছে। দারিদ্র্য ত আছেই—চিরদিনই ছিল, চিরদিনই থাকবে—ওটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে; কিন্তু সে সমস্ত দুঃখ ছাপিয়েও তিনি যে মাধুর্য দিয়েছেন তাকে কোন দিনই অস্বীকার করতে পারব না। বিয়ের পর ছ'টি মাস যে স্বপ্নে কেটেছে তার স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে, সেইটুকু সে দিন পেয়েছিলুম বলেই আজ আমি অনায়াসে একটুও ইতস্তত না করে বলতে পারব যে, এ পৃথিবীতে আসা আমার সার্থক হয়েছে। তারপর অনেক দুঃখ পেয়েছি, তিনিও পেয়েছেন—গয়না ত দূরের কথা, একটা কাপড়ও কোনদিন কিনে দিতে পারি নি—এমন কি তাঁর অসুখের সময় চিকিৎসাও করাতে পারি নি। তবু মনে হয় কি জানো ভাই—মানুষ স্বার্থপর বলেই বোধ হয় মনে হয়—বাবা সেদিন বিয়ে দিয়ে ভালই করেছিলেন, আমি ত আমার জীবনের পাথেয় পেয়ে গেছি।

স্ত্রীর কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল।

ভূপেনের মন ব্যথায়, শ্রদ্ধায় ভরিয়া গিয়াছিল; সে শুধু চুপিচুপি কহিল, বৌদি কি নেই দাদা?

সহজকণ্ঠেই বিজয়বাবু উত্তর দিলেন, না ভাই, আজ বছর-পাঁচেক হ'ল নেই।

—তা হ'লে সংসার?

—এক বিধবা দিদি আছেন, তা তিনি আবার চোখে ভাল দেখেন না। সংসার চালায় আমার বড় মেয়ে কল্যাণী। বড় লক্ষ্মী মেয়ে ভাই, বড় ঠাণ্ডা মেয়ে। মায়ের মতই স্বভাব হয়েছে, খাটতে পারে বরং তার চেয়েও বেশী···মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে ভাই, আঠারো বছরে পড়ল। কী ক'রে কার হাতে যে দেব তা জানি না। আর দিলেই বা চলবে কি ক'রে—দিন রাত আকাশ পাতাল ভাবছি, ভেবে কূল-কিনারা পাই না।

বিজয়বাবু এমনিতে অত্যন্ত শান্ত, বরং চাপা বলাই ভাল। একদিন মাত্র মনের আবেগে কথা-কয়টি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু ভূপেন সেটা ভুলিতে পারে নাই। ঐ কয়টি কথাতেই তাঁহার যে অন্তরের পরিচয় সে পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার তৃষ্ণার্ত হৃদয় তাঁহাকে অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এখানে আসিয়া পর্যন্ত মনে হইতেছিল যেন সে মরুভূমিতে আছে—অথচ একজনও যদি অন্তরঙ্গ না থাকে ত মানুষ বাঁচে কি করিয়া? বিজয়বাবুকে সে শ্রদ্ধা করিত বরাবরই, কারণ তিনিই স্কুলের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র মানুষ—যাঁহাকে কখনও কাহারও সম্বন্ধে একটিও অপ্রিয় কথা বলিতে ভূপেন শোনে নাই। পৃথিবীতে কাহারও বিরুদ্ধে তাঁহার নালিশ ছিল না—না মানুষ, না ভগবান।

সেক্রেটারী-সংবাদের কয়েক দিন পরেই সহসা ভূপেন ছুটির পর একদিন বলিয়া বসিল, চলুন দাদা, আপনার বাড়ি ঘুরে আসি।

বিজয়বাবু যেন মুহূর্তের জন্য একটু বিব্রত হইয়া উঠিলেন, তাহার পরই

সহজকণ্ঠে কহিলেন, চলো না ভাই, সে ত আমার সৌভাগ্য।

তাহার পর পথ চলিতে চলিতে প্রায় রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, অনেক দিন এই কথা আমার মনে হয়েছে ভাই—আর আমারই বলা উচিত ছিল আগে কিন্তু সাহস পাই নি, আমরা বড় গরিব ভাই—কি জানি কি ভাববে তুমি, শহরের লোক। এ সংকোচ রাখা হয়ত উচিত ছিল না—তবু এড়াতেও পারি নি।

ভূপেন স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, তাতে কি হয়েছে দাদা, আমি ত আপনার আহ্বান পর্যন্ত অপেক্ষা করি নি। তা ছাড়া সংকোচ মানুষ মাত্রেরই থাকে।

বিজয়বাবুর বাড়িটি ছোট নয়, সাধারণ মাটির বাড়ি, কিন্তু বেশ বড়। ঘরও এককালে কম ছিল না, যদিচ তাহার অনেক কয়টাই সংস্কারের অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মাত্র দুইটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সে দুটিও অবিলম্বে খড় না পড়িলে যে বেশীদিন টিঁকিবে না—তাহা একবার মাত্র চোখ বুলাইয়াই ভূপেন বুঝিতে পারিল। বাড়ির উঠানে একটা কংকালসার গরু বাঁধা—একটা মরাইয়ের বেদিও আছে, অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থের যাহা থাকা উচিত তা এককালে সবই ছিল। কিন্তু আজ দারিদ্র্য ও লোকাভাবের ছাপ তাহার সর্বাঙ্গে মাখানো। উঠানে ভাঙ্গাচোরা কাঠ-কাঠরা, কতকগুলি পুরানো টিন স্তূপাকার করা—বোধ-হয় বহুকাল হইতেই ঐ ভাবে আছে—তাহাদের উপরে অসংখ্য বন্য গাছ লতাইয়া উঠিয়াছে।

কতকটা কৈফিয়তেরই সুরে বিজয়বাবু কহিলেন, ঐ ত একটা মেয়ে, সারাদিন রেঁধে, গরুর কাজ করে, বাসন মেজে আর এ-সব পরিষ্কার করা পেরে ওঠে না। ও মা কল্যাণী, এ-দিকে একবার এস মা।

—যাই বাবা!—বলিয়া বোধ করি রান্না-ঘর হইতেই একটা বছর-সতেরোর তরুণী মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। তাহার রং ময়লা, যদিও একেবারে কালো নয়। সাধারণ ধরনের মুখ, একহারা ঢ্যাঙ্গা গঠন—তবু মোটের উপর একেবারে শ্রীর অভাব নাই—ভূপেনের বরং ভালই লাগিল।

সহসা বাহিরে আসিয়াই বিজয়বাবুর সহিত অপরিচিত লোককে দেখিয়া কল্যাণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বিজয়বাবু কহিলেন, দাঁড়ালি কেন মা, আয় আয় —ইনিই সেই ভূপেনবাবু, আমাদের নতুন মাস্টারমশাই। এঁর কথা ত তোকে অনেক বলেছি মা।

তাহার পর ভূপেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, এই মেয়েটিই আমার এখন বন্ধু সেক্রেটারী সব—যা কিছু গল্প ওর সঙ্গেই করি।

কল্যাণী প্রথমটায় লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর সংকোচ করিল না। দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন আপনারা। চা হবে ত বাবা?

বিজয়বাবু কহিলেন, দুধ আছে কি!—আমি ত 'র' চা খাই—কিন্তু ভায়া আমার—

কল্যাণী নতমুখে কহিল, সে যা হয় হবে বাবা।

বিজয়বাবু নিশ্চিন্ত এবং খুশী হইয়া কহিলেন, 'বেশ, বেশ। ব'স ভাই, ব'স—'

একটু পরে কল্যাণীর ছোট একটি ভাই একটা বাটি হাতে কোথায় বাহির হইয়া গেল। ভূপেন বুঝিল যে, সে দুধের সন্ধানেই চলিয়াছে। এই অল্পবয়সী মেয়েটি যে দরিদ্রের সংসারের সব ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে, তাহা বুঝিয়া সে একটু বিস্মিত হইল। সে প্রশ্ন করিল, ছেলেমেয়ে কটি দাদা?

—মেয়ে ঐ একটি ভাই—ছেলে তিনটি। মেয়েটাই সকলের বড়।

আরও দুই-একটি কথার পর কল্যাণী চা লইয়া আসিল। একটা কলাইয়ের পাত্রে তেলমাখা মুড়ি, খানিকটা পাটালী গুড় এবং কলাইয়ের বাটিতে চা। বিজয়-বাবুর যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল—কহিলেন, চিনি ছিল মা?

সলজ্জভাবে হাসিয়া কল্যাণী কহিল, গুড় থেকেই চিনি করে নিয়েছি বাবা! কেন, গন্ধ হয়েছে গুড়ের?

বিজয়বাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, না—না, গন্ধ হবে কেন।

কল্যাণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার যা ব্যাপার, তোমাকে জিজ্ঞাসা করাই ভুল। ও-বেলা ডালে নুন দিতে ভুলে গিয়েছিলুম, তা ত তুমি একবারও বললে না বাবা, নুনও চাইলে না। তোমার কি জিভে স্বাদও লাগে না?

বিজয়বাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন, নুন কি হয় নি মা ডালে? কৈ, আমি ত বুঝতে পারি নি।

কী সর্বনাশ! হাসি চাপিতে গিয়া ভূপেনের বিষম লাগিয়া গেল। সে কহিল, স্রেফ্ আ-নুনি খেয়ে উঠে গেলেন? আশ্চর্য!

—অতটা বুঝতে পারিনি—বলিয়া বিজয়বাবু মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কল্যাণী সস্নেহে অনুযোগের সুরে কহিল, কি লোককে নিয়ে যে আমার ঘর করতে হয় তা যদি জানতেন! রাত্রে শোবার আগে কিছুতেই দোরে খিল দিতে দেন না, বলেন, আমরাও ভগবানের নাম করে শুই, চোরেরাও ভগবানের নাম ক'রে বেরোয়—তিনি যে-দিন যাকে যা দেবার দেবেনই। দোর বন্ধ ক'রে কাকে ঠেকাবি বল্!

হেমন্তের ম্লান গোধূলির আলোতে বিজয়বাবুর শীর্ণ বলিরেখাঙ্কিত মুখই যেন ভূপেনের চোখে পরম রমণীয় হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এই দূর প্রবাসে দাসত্ব করিতে আসিয়া এই একান্ত ভাবগত মানুষটির সাহচর্যে তাহার একটা বড় লাভ হইয়াছে।

ইহার পর গল্প জমিয়া উঠিল দ্রুত। মেয়েটি তাহার বাপ সম্বন্ধে বহু অনুযোগ করিল কিন্তু প্রত্যেকটিই তাঁহার প্রতি কন্যার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচায়ক। এমনি বহুক্ষণ ধরিয়া কল্যাণী ও বিজয়বাবুর সহিত গল্প করিয়া অনেক রাত্রে যখন সে আবার হোস্টেলের পথ ধরিল, তখন তাহার মনে হইল যে, অনেক দিন পরে তাহার মনটা কী কারণে যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে।

॥ ১১ ॥

এ স্কুলে আসিয়া ভূপেনের আর একটা বড় লাভ হইল, সে ঐ ছাত্র দুইটি—পদ্ম ও সালেক।

সমস্ত স্কুলে, অন্তত ভূপেন যতটা পড়াইত তার মধ্যে, এই দুটি ছেলেই শুধু তাহাকে সন্ধ্যার কথাটা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিত। হয়ত ঠিক অতটা শ্রদ্ধা ছিল না লেখাপড়ার উপর—কিন্তু আগ্রহ ছিল। তাছাড়া পড়া বুঝাইতে গিয়া অপেক্ষাকৃত নীরস অংশ পড়াইবার সময় যখন অন্য সমস্ত ছাত্রের চোখই স্তিমিত বা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত, তখন মাত্র এই চারিটি চোখেই সে মনোযোগের আলো দেখিতে পাইত। তাহার অধ্যাপনার নূতন পদ্ধতির সহিতও এই দুইটি ছাত্রই প্রথম তাল রাখিয়া চলিতে শুরু করে। ইহাদের মধ্যে পদনের মাথাটা ছিল অপেক্ষাকৃত মোটা কিন্তু তাহার আগ্রহ এবং চেষ্টা ছিল খুব বেশী, সেজন্য বুদ্ধির সামান্য অভাবটুকু সে অধ্যবসায়ের দ্বারা পূরাইয়া লইত। সালেকের স্বাস্থ্য তত ভাল ছিল না বলিয়া পদনের সমান পরিশ্রম করিতে পারিত না বটে কিন্তু তাহার প্রয়োজনও হইত না, পড়াটা সহজেই তাহার মাথায় ঢুকিত। ফলে, পরীক্ষার সময় দুইজনেই কাছাকাছি থাকিত, একজন অপরকে ফেলিয়া বেশী দূর যাইতে পারিত না।

গুরুরও যেমন ছাত্রকে চিনিয়া লইতে দেরি হয় না, ছাত্ররাও তেমনি সহজে গুরুকে চিনিতে পারে। এই ছেলে দুইটিও কয়েক দিনের মধ্যেই ভূপেনের অনুরক্ত হইয়া উঠিল। স্কুলে ফুটবল বা ক্রিকেট ইত্যাদি কোন খেলার ব্যবস্থা ছিল না, বাহির হইতে যে সব ছেলেরা পড়িতে আসিত, ছুটির পর হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেই তাহাদের ব্যায়ামের কাজ সারা হইত ; হোস্টেলের ছেলেরা দুই-এক জন স্কুল হইতে ফিরিয়া ঘরেই বসিয়া থাকিত কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া গ্রাম্য-খেলায় অপরাহ্নটা কাটাইত। পদন ছিল এই দলে কিন্তু সালেক ইহাদের সঙ্গে তেমন মিশিতে পারিত না, সে কোন দিন হয়ত নিজে নিজেই ঘুরিয়া বেড়াইত, কোন কোন দিন ইহাদের খেলার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া দেখিত। ভূপেন এখানে কয় দিন থাকিবার পর অন্যান্য মাস্টার মহাশয়দের সংসর্গে যখন প্রায় হাঁপাইয়া উঠিল, তখন নিজেই যাচিয়া এই ছেলে দুইটিকে সঙ্গী করিয়া লইল। সকালে সে ইচ্ছা করিয়াই বিনা পারিশ্রমিকে এই ছেলে দুইটিকে পড়াইতে বসিত, কোন দিন বা নিজেদের হোস্টেলের রোয়াকে, কোন দিন বা সালেকদের হোস্টেলের দাওয়ায়। এখানে গোলমাল বেশী, সালেকদের ওখানে পড়ানোর দিক দিয়া অনেক সুবিধা, কিন্তু ভূপেন ভরসা করিয়া সব দিন ওখানে যাইতে পারিত না—কারণ লক্ষ্য করিয়াছিল যে ভবদেববাবু বা অন্য মাস্টার মহাশয়রা কেহই ঠিক মুসলমান হোস্টেলের ছোঁয়াচ পছন্দ করেন না। তবে এক একদিন যখন এখানকার গোলমাল অসহ্য হইযা উঠিত তখন প্রায় মরীয়া হইয়াই সে সালেকদের দাওয়ায় গিয়া বসিত।

সকালে চলিত স্কুলের পড়া—পরীক্ষার প্রস্তুতি, আর বিকালে শুরু হইত পথের পড়া। ভূপেন ছাত্র দুইটিকে লইয়া জলযোগের পর বাহির হইয়া পড়িত মাঠে—ধূলি-ধূসর পায়ে হাঁটা পথ ছাড়িয়া সে উঠিত ডাঙ্গায়, কোন কোন দিন বা ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া গিয়া পড়িত নদীর ধারে। গ্রাম হইতে বহু দূরে আর একটি ছোট গ্রামের প্রান্তে অতিশীর্ণ জলের রেখা, নদী হিসাবে তাহার কোন মূল্যই

নাই, সেটা নদীর পরিহাস মাত্র, তবু ভূপেনের মন কঠিন ধূলি-বিবর্ণ জলহীন দেশে থাকিতে থাকিতে সামান্য জলরেখাটির জন্যই তৃষিত হইয়া উঠিত—তাই মধ্যে মধ্যে এখানে না আসিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু তবু এ বেড়ানোর মধ্যে ভ্রমণ বা ব্যায়ামটা বড় কথা নয়—পড়ানোটাই আসল। সে এই সময় স্কুলের পড়া বাদ দিয়া যতটা সম্ভব মুখে মুখে বাহিরের জগতের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিত। দেশ-বিদেশের কথা, নানা জাতির ইতিহাস, ভাল ভাল বইয়ের গল্প, জননায়ক ও সাহিত্যিকদের জীবনী, বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনী—অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের সব বিভাগই তাহাদের গল্পের মধ্যে আলোচিত হইত। প্রথম প্রথম এ সমস্ত কথা উহারা শুধু অবাক হইয়া শুনিত, প্রশ্ন করিতে পারিত না। তাহাদের ইস্কুল, এই কয়টি পরিচিত গ্রাম এবং লোকমুখে-শোনা কলিকাতা শহরের বাহিরে যে একটা বিরাট জগৎ পড়িয়া আছে, এ যেন তাহাদের কাছে বিশ্বাস করাই কঠিন। ক্রমে একটু একটু করিয়া বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিলে তাহারা সাহস করিয়া প্রশ্ন করিতে শুরু করিল, তাহাদের কৌতূহল ভরসা পাইয়া নূতন জগতে প্রবেশের পথ খুঁজিতে লাগিল।

ভূপেনও তাহাদের কাছে আশানুরূপ সাড়া পাইয়া উৎসাহ বোধ করিল। সে একটু একটু করিয়া এই ছেলে দুইটির কাছে তাহার ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিতে লাগিল। এ যেন এক নূতন নেশা—সন্ধ্যার যোগ্যতা তাহাদের নাই সত্য কথা, তাহাকে এই সব গল্প বলিয়া যে আরাম পাওয়া যাইত তা এ ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব নয়, তবু তাহার নিজের শক্তিকে বিকশিত করিয়া তুলিবার এ একটা পথ ত বটে। ক্রমে তাহাদের এই বেড়াইবার সময় দীর্ঘতর হইয়া উঠিতে লাগিল, ফিরিতে রোজই প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষেরই আপত্তি থাকিত না। হাঁটা এবং বকা এই ডবল পরিশ্রমে ভূপেনের অন্ততঃ ক্লান্তি বোধ করিবার কথা কিন্তু সে যেন ঘুরিয়া আসিবার পর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সুস্থই মনে করিত। সে যে শিক্ষকতা করিতেছে না—সামান্য কয়েকটা টাকা বেতনে দাসত্ব করিতেছে, এই কথাটা সে এই সময়েই কতকটা ভুলিয়া থাকিতে পারিত।

কিন্তু মাস্টারমহাশয়রা তাহার এতটা বড়াবাড়িকে মোটেই প্রীতির চোখে দেখিতেন না। যতীনবাবু প্রত্যহই রাত্রে অনুযোগ করিতেন, কী ক'রে যে মশাই ঐ দুটো পাড়াগেঁয়ে ভূতের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান বুঝি না। আমার ত এদের সঙ্গে কথা কইতে ঘেন্না করে।

কোন দিন বা বলিতেন, আর বকেনই বা কী ক'রে অত মশাই? ইস্কুলে বকতে হয় নিতান্ত পেটের দায়ে। মাইনে নিচ্ছি ঐ জন্যে, না বকলে চলে না তাই—তার পরও আবার ঐ আহাম্মক ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে বকতে ইচ্ছে করে আপনার? আশ্চর্য!

অপূর্ববাবুও একদিন টিফিনের সময় কথাটা পাড়িলেন, বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়ে ঐ ছেলে-দুটোর সঙ্গে রোজ সকালে বিকেলে অতক্ষণ কাটান কি ক'রে মশাই? বিরক্তি বোধ হয় না?

ভূপেন এক কোণে বসিয়া কি একটা বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ পড়িতেছিল, (বইটা কয়-

দিন আগে ভবদেববাবু দিয়াছেন, রোজই তাগাদা করেন পড়া হইয়াছে কিনা) জবাব দিল, বিরক্তি বোধ করলে আর ও আজ করব কেন বলুন ! আমার ভালই লাগে।

রাধাকমলবাবু টিপ্পনী কাটিলেন, আসলে আমাদের সঙ্গ ওঁর ভাল লাগে না— আমাদের সঙ্গে গল্প করার চেয়ে ওদের সঙ্গে বক্-বক্ করাও ঢের ভাল, বুঝলে না ?

ভূপেন মুহূর্তে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইল। কণ্ঠস্বরে নিরাসক্তি আনিয়া উত্তর দিল, তা কথাটা এক রকম মন্দ বলেন নি পণ্ডিত মশাই। হাজার হোক ওরা ছেলেমানুষ, আমাদের মত কুটিলতা বা সাংসারিক জ্ঞান ত ওদের মধ্যে এখনও ঢোকে নি। ওদের সঙ্গে গল্প ক'রে এখনও আনন্দ পাওয়া যায়।

যতীনবাবু ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনি কি বলতে চান, আমরা সবাই কুটিল।

শান্তকণ্ঠে ভূপেন জবাব দিল, শুধু আপনারা কেন, আমরা সবাই কি অল্প-বিস্তর সোফিস্টিকেটেড হ'তে বাধ্য হই নি, সংসারের ঘূর্ণিতে পড়ে ?

যতীনবাবু তাহার কথাটার ঠিক জবাব না দিয়া বলিলেন, যতই সরল হোক মশাই, ঐ পাড়াগেঁয়ে ভূত-দুটোর সঙ্গে দিন-রাত বকার কথা আমি অন্তত ভাবতেই পারতুম না।

ভূপেন বইতে চোখ রাখিয়াই কহিল, আমাদের শহরে বাড়ি, মুখ বদল হিসেবে পাড়াগাঁয়ের লোক ভালই লাগে। তা ছাড়া আপনারা এসেছেন চাকরি করতে, আমি এসেছি পড়াতে, পড়ানোই আমার শখ। ভাল ছেলে পেলে আমার খুশী হবারই কথা। চাকরি করার দরকার হ'লে আমি এত দিন কলকাতার অফিসে পাকা হয়ে যেতে পারতুম।

অপূর্ববাবু মুখটা বিকৃত করিয়া কহিলেন, শখ ক'রে আবার কেউ পড়াতে আসে, আশ্চর্য !

সেদিনের মত কথাটা সেখানেই চাপা পড়িয়া গেল, যদিও আপস-আলোচনায় এটাই সাব্যস্ত হইল যে, নিরতিশয় দম্ভ-হেতু ভূপেন ইচ্ছা করিয়াই মাস্টার-মহাশয়দের সঙ্গ এড়াইয়া চলে ; আর সেই জন্যই ঐ ছোঁড়া দুইটাকে লইয়া সময় কাটায়।

কিন্তু প্রসঙ্গটার ঐখানেই শেষ হইল না। স্বয়ং ভবদেববাবু একদিন তাহাকে ডাকিয়া কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন, ভূপেনবাবু, ওদের নিয়ে অত রাত অবধি কোথায় বেড়ান ? সাপখোপের দেশ মশাই, অতটা রাত না করাই ভাল।

ভূপেন সবিনয়ে কহিল, তা অবশ্য বটে, তবে শীতকাল, সাপের ভয় বিশেষ নেই শুনেছি।

নীরবে বার-দুই মালাটা ঘুরাইয়া লইয়া ভবদেববাবু পুনশ্চ কহিলেন, তাছাড়া অপূর্ববাবু বলছিলেন যে অত রাত ক'রে ফেরার ফলে ছেলে দুটির নাকি পড়ারও অসুবিধা হচ্ছে, ফিরে এসে হাত-পা ধুয়ে বই নিয়ে বসতে না বসতেই খাবার ঘণ্টা

পড়ে—খেয়ে এসে ঘুমোয়। পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে এল, এখন একটু না পড়লে পেরে উঠবে না, বুঝলেন না?

ভূপেন অতিকষ্টে রাগ দমন করিয়া কহিল, সে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা ত আমি করেইছি মাস্টারমশাই. আমি নিজে ওদের রোজ পড়াই। বেড়াতে যে যাই, সে সময়টুকুও আমি অপব্যয় হ'তে দিই নে, মুখে মুখে পড়ানোই চলে। আমার ক্লাসগুলোর মধ্যে ঐ ছেলেটোর সম্বন্ধে যা কিছু ভরসা রাখি—ওরা যদি তৈরী হয়ে ভালো ভাল রেজাল্ট করে তা'হলে আপনারই সুনাম।

ভবদেববাবু কহিলেন, তা ঠিক! তবে কি জানেন, আমি বুঝি ও সব ঝামেলায় যাবার দরকার কি? যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করা—সময় যদি সব নষ্টই করলুম ত নিজের কাজ কখন সারব বলুন। একে ত সময় নেই, তার ওপর—। যাক আপনি যদি বোঝেন যে ওদের ক্ষতি হবে না, তাহলে অবশ্য অন্য কথা—জয় রাধে! জয় রাধে! রাসপঞ্চাধ্যায় পড়ছেন বেশ মন দিয়ে? ওটা শেষ হ'লে আর একটা এই দেব আপনাকে—

তার পর যেন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ কণ্ঠেই কহিলেন, একটু সকাল ক'রে ফিরলে আপনার নিজের পড়াশুনোরও ত সুবিধা হয়।

ভূপেন কি একটা উত্তর দিতে গিয়াও চাপিয়া গেল। বোধ করি এ বিষয় লইয়া যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করিতে তাহার ঘৃণাই বোধ হইল। কেন যে ইহাদের এই অহেতুক আক্রমণ তাহা বুঝা না গেলেও তাহার বিরুদ্ধে যে বড় একটা দল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, সাতটা সাড়ে-সাতটার মধ্যেই তাহারা ফেরে, সেটা ভবদেববাবু দালানে বসিয়া মালা জপ করিতে করিতে প্রত্যহই দেখেন অথচ তিনি অপূর্ববাবু কথার প্রতিবাদ না করিয়া তাহাকেই সে অনুযোগ শুনাইতে বসিলেন। খাবার ঘণ্টা পড়ে ঠিক নটায়—অর্থাৎ সাড়ে-সাতটায় ফিরলেও দেড় ঘণ্টা সময় হাতে থাকার কথা এবং পদন অন্ততঃ যে সে দেড় ঘণ্টার অপব্যয় করে না তাহা সকলেই জানে। কিন্তু এ-সব কোন যুক্তি দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না—সে নিঃশব্দে খানিকটা বসিয়া উঠিয়া গেল।

তবে ইহার পর সে ইচ্ছা করিয়াই সালেকদের সহিত বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ করিল। ছুটির পর অধিকাংশ দিন সে বিজয়বাবু সহিত তাঁহাদের বাড়িতে পর্যন্ত আগাইয়া যাইত। কল্যাণীর সহিত বহু বিবাদ করিবার পর সে নিজের জন্যও দুগ্ধহীন চায়ের ব্যবস্থা পাকা করিয়া লইয়াছিল, মুড়ি ও সেই চা খাইয়া বিজয়বাবুর সহিত গল্প করিয়া সে যখন ফিরিত তখন তাহার শুধু ভ্রমণের কাজটাই সারা হইত না—যথার্থ ভদ্র ও ভগবদ্‌ভক্ত লোকের সংসর্গ করার ফলে মনটাও সুস্থ বোধ হইত।

পদনদের সহিত বেড়ানো বন্ধ করিলেও আসল কাজটা সে ভোলে নাই। সন্ধ্যার পর হোস্টেলে ফিরিয়া সে সকালের মতই পদনদের লইয়া আবার পড়াইতে বসিত, তবে এ সময়টা ইচ্ছা করিয়াই সামনে বই খুলিয়া রাখিয়া গল্প করিতে—সাধারণ জ্ঞানের গল্প। পড়ার বইয়ের সঙ্গে সে সময় সম্পর্ক থাকিত খুব কম।...

অপূর্ববাবুর দল এটাকেও তাঁহাদের প্রতি ভূপেনের তাচ্ছিল্যের আর এক দফা নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া মনে মনে বিষম চটিয়া গেলেন কিন্তু এ ব্যবস্থাটা রদ করিবার আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

পরীক্ষা আসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনের হুড়াহুড়ি। এ ব্যাপারটার মধ্যে যে এতটা কদর্যতা আছে, তাহা ভূপেন আগে কল্পনাও করে নাই। মাস্টারমহাশয়দের কথাবার্তার মধ্যে এমনি একটা ইঙ্গিত সে মধ্যে মধ্যে পাইয়াছে বটে কিন্তু তখন এতটা বোঝা সম্ভব ছিল না। ছেলেবেলায় নিজে যখন স্কুলে পড়িত তখন এ-সব লক্ষ্য করিবার কথা নয়, বছরের শেষে একটা পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা পাওয়া যায় এবং কতকগুলি চকচকে নতুন বই হাতে আসে—এইটুকুই শুধু জানিত। এখন যতই ব্যাপারটা দেখিতে লাগিল ততই ঘৃণায় মন রি-রি করিয়া উঠিল। বিভিন্ন প্রকাশকদের প্রচারক বা ক্যানভাসারের দল পাঠ্যপুস্তকের বোঝা লইয়া দলে দলে এই সময় আসিতে থাকে। ইহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, যে কাজে আসিয়াছে সেটাও ভদ্র ও সুচারুভবে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা অনেকের নাই; লোভ ও স্বার্থপরতার যে মাত্রা ও সীমা আছে, সে কথাটা ইহাদের অভিধানের বাহিরে। অবশ্য ইহাদের উপর রাগ বা ঘৃণা করা অন্যায়; সকলেই অত্যন্ত দরিদ্র। বৎসরের শেষে এই কয়টা কাঁচা টাকার মুখ চাহিয়া থাকে সারা বছর, মাহিনা ও রাহা খরচের উদ্‌বৃত্ত (অর্থাৎ চুরি) মিলিয়া বেশীর ভাগ ক্যানভাসারেরই পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশী থাকে না। এই সামান্য টাকার লোভে ভাল বা বুদ্ধিমান লোক যে কেহ আসিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাদের মধ্যে অনেকেই খাওয়া ও শোওয়ার কাজটা হোস্টেলে হোস্টেলে সারিয়া দৈনিক আট আনা দশ আনা বাঁচায়। মাস্টারমহাশয়রা এই অবাঞ্ছিত অতিথিদের ঠিক প্রীতির চোখে না দেখিলেও চক্ষুলজ্জা এড়াইতে পারেন না—আশ্রয় ও আহার দিতে বাধ্য হন।

আসেও এক-একটি অদ্ভুত জীব—কেহ কেহ একেবারে একবস্ত্রে বাহির হয়, মুটে ভাড়া দিবার ভয়ে বইয়ের ব্যাগ ছাড়া আর কিছুই আনে না। এমন কি দ্বিতীয় বস্ত্র পর্যন্ত না। কেহ বা বইয়ের সঙ্গেই একখানি ময়লা কাপড় ও তেলচিটে গামছা ঐ অদ্বিতীয় সুটকেসে ভরিয়া লইয়া আসে। একটি ক্যানভাসার ঢাকা হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে তিন সপ্তাহ পরে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে —তাহার সহিত আলাপ করিয়া ভূপেন জানিল, সে তিন সপ্তাহের মধ্যে কাপড় জামা ত ছাড়েই নাই—স্নানও করে নাই। ম্যালেরিয়ার ভয়ে জল গায়েও ঢালে না, পেটেও না। 'স্রেফ চা খেয়ে আছি মশাই, এই একুশ দিন!' বলিয়া সে সগর্বে ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ফলে তাহার সাদা জিনের কোট এবং কালো মাথার চুল দুই-ই বীরভূমের লাল ধুলির রঙে সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছে।

কিন্তু শুধু যদি এই সব ক্যানভাসারের দল নিজেদের বইয়ের জন্য আসিয়া ধর-পাকড় করিত বা হেডমাস্টার মহাশয়ের নির্লজ্জ স্তাবকতা করিত ত ভূপেনের

অতটা অসহ্য বোধ হইত না। স্কুলের কমিটি-মেম্বারেরা প্রায় সকলেই থাকেন কলিকাতাতে। গ্রামের যে-সব ভদ্রলোকেরা লেখাপড়া শিখিয়া কলিকাতাতে ওকালতি, ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা করেন—অন্ততপক্ষে অধ্যাপনা বা সরকারী চাকুরি—তাঁহাদেরই, অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, ধরিয়া স্কুল-কমিটির মেম্বার করা হয়। সারা বছরে তাঁহাদের কোন পাত্তা পাওয়া যায় না কিন্তু এই সময়ে তাঁহারা প্রায় সকলেই বিভিন্ন প্রকাশক ও পাঠ্যপুস্তক-লেখকদের তদ্বিরের ফলে হেডমাস্টার ও সেক্রেটারীর কাছে এক-দুই কিংবা ততোধিক বইয়ের জন্য সুপারিশ করিয়া দীর্ঘ চিঠি লেখেন। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত মেম্বারদের খুব জরুরী কমিটি মিটিং-এ যোগ দিবারও সময় হয় না, তাঁহারা, হয়ত বা পরিচিত প্রকাশকদের অর্থেই, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের সভাটিতে হাজির হন—এবং অনেক সময়ে ঝগড়া-বিবাদ করিয়াও নিজেদের জিদ্ বজায় রাখেন। আগে হেডমাস্টার ও শিক্ষক মহাশয়দের উপরই পুরাপুরি এ ভার ছিল ; কিন্তু তাঁহারা নাকি এই সব ক্যান্ভাসারদের অনুরোধে অনেক সময়ে ভাল বইয়ের উপর ঠিক সুবিচার না করিয়া 'খাতিরে'রই প্রাধান্য দেন—সেই জন্য, সেই অনাচার বাঁচাইবার জন্যই মেম্বাররা স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারাই বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের ও হেডমাস্টার মহাশয়ের সাহায্য লইয়া পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ নির্বাচন করিবেন। ফলে যাঁহারা সারা বছর ধরিয়া ছেলে পড়ান, তাঁহাদের সুবিধা-অসুবিধা কিছুমাত্র বিবেচিত না হইয়া পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত হয়। হয়ত বা উকীলের অনুরোধে স্বাস্থ্য, ডাক্তারের অনুরোধে ইতিহাস, এবং ইঞ্জিনিয়ারের অনুরোধে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত বই নির্বাচিত হয়। কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়া থাকেন (ভূপেনের কাছে কথাটা স্পর্ধা বলিয়াই মনে হইল) যে, বইগুলি তাঁহারা আদ্যোপান্ত পড়িয়াই সুপারিশ করিতেছেন।

তবু ভূপেনের অনেক শিক্ষা বাকি ছিল। এক দিন কথাটা উঠিতে পণ্ডিত মহাশয় বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, শুধু এদের দোষ দিলে চলবে কেন ভায়া। মাস্টারমশাইদের হাতে ভার থাকলেই কি আর ভাল বই বেছে ধরানো হ'ত মনে করো ? আমার শালা কলকাতার এক মস্ত ইস্কুলে হেডপণ্ডিতি করে, সেখানে কমিটির অত জুলুম চলে না, মাস্টারমশাইদের বিশেষ করে হেডমাস্টারের খুব হাত আছে, কিন্তু সেখানেও কি হয় জানো ? হেডমাস্টার, জয়েণ্ট হেডমাস্টার সকলেরই দু-একখানা করে পাঠ্যপুস্তক আছে, তাঁরা সেইগুলো নিয়ে বদলা-বদলি করেন। মানে, ধরো আমার আছে ক্লাস থ্রির একখানা বাংলা বই, তোমার আছে ফাইভ-সিক্সের ইতিহাস, আমি তোমার বইটা ধরাবো যদি তুমি আমার বইটা ধরাও। বুঝলে ব্যাপারটা ? এর ওপরই বই ধরানো হয় সেখানে, ভাল মন্দ কিছু বিচার করা হয় না।

যত শোনে ভূপেনের মন তত হতাশায় ভরিয়া আসে। শিক্ষাদানের এই পুণ্য-ক্ষেত্রে হয়ত আরও কত অনাচার চলে—যা সে এখনও শোনে নাই। কিন্তু এখনই যে তার প্রায় দম বন্ধ হইয়া আসিল। কেমন করিয়া সে এখানে টিঁকিয়া থাকিবে। মনে পড়ে সন্ধ্যা আর মোহিতবাবুর কথা—হায় রে। শিক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য

লইয়া কত বড় বড় কথাই না তাঁহারা আলোচনা করেন—কোথায় তাহার ভিত্তি যদি জানিতেন।...

এক দিন, তখন প্রায় স্কুল বন্ধের সময় হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার এক নাম-করা অর্থ-পুস্তক-ব্যবসায়ীর লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভাঙ্গা-হাট, ইস্কুলের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, যেটুকু কাজ বাকী আছে সেটুকু অফিস-ঘরেই চলে—মাস্টারমহাশয়দের হাজিরা দেওয়া ছাড়া বিশেষ কোন দায়িত্ব নাই। ভূপেন সকাল করিয়া হোস্টেলে ফিরিয়া আসিয়াছে—বাড়িতে একটা চিঠি লেখা দরকার, সেটা সারিয়া একেবারে বাহির হইবে এই ইচ্ছা। বিজয়বাবুর বাড়ি সেদিন সন্ধ্যার অনেক আগেই যাওয়ার কথা, কল্যাণী কি-সব পিঠা প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার বিশেষ নিমন্ত্রণ। কয়েক দিন আগে একটা ইংরাজী বইয়ের গল্প সে কল্যাণী ও তাহার ভাইদের বলিতে শুরু করিয়াছিল, সেটা শেষ হয় নাই বলিয়া বিজয়বাবুর বড় ছেলেটির কড়া তাগাদা আছে, সেটার জন্যও খানিকটা সময় লাগিবে। এধারে তিনটার মধ্যে চিঠি ডাকে না দিলে আজ যাইবে না—সবটা জড়াইয়া তাহার তাড়াই ছিল। সুতরাং সহসা যতীনবাবুর সঙ্গে একটি অপরিচিত 'ক্যানভাসার'-মার্কা ভদ্রলোককে ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিরক্তিতে তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তবু সে কোন প্রশ্ন না করিয়া শুধু যতীনবাবুকে বলিল, আসুন।

যতীনবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কেমন যেন থতমত খাইয়া গেলেন। কহিলেন, এই—ইনি ভাই একটু আপনার কাছেই এসেছেন।

—আমার কাছে? কেন বলুন ত?...বিস্মিত ভূপেন প্রশ্ন করিল।

সে ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া বিনা নিমন্ত্রণেই ভূপেনের বিছানায় বসিলেন, তাহার পর ব্যাগ খুলিয়া মোটা মোটা খান-দুই অভিধান বাহির করিয়া কহিলেন, আমাদের মালিক এইগুলো আপনাকে পাঠিয়েছেন।

আরও বিস্মিত হইয়া ভূপেন প্রশ্ন করিল, আমাকে? আপনি কোথা থেকে আসছেন বলুন ত?

সে ভদ্রলোক তাঁহার ফার্মের নাম করিলেন। ভূপেন কহিল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ত আমার পরিচয় নেই, তিনি শুধু শুধু আমাকে উপহার পাঠাবেন কেন? আপনার নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে—

ক্যানভাসারটি ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, আপনাকে, মানে আপনার নাম কি আর তিনি জানেন?—তবে—মানে ঐ ক্লাস এইট-নাইনে আপনিই ত ইংরাজী পড়ান?

এবার ভূপেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই কহিল, ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি, আমাকে কি করতে হবে?

—না, না, করতে কিছুই হবে না—তবে এই ছেলেদের যদি দরকার হয়, মানে মানের বই বা অভিধান ওদের দরকার ত হয়ই—সেই সময় যদি আমাদের কথাটা একটু বলে দেন। বই আমাদের খুবই ভাল, সে স্যার আপনি ত উলটে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আপনাকে আর কি বলব—মানে—

ভূপেন বাধা দিয়া কহিল, মানে ঘুষ, এই ত ?

—ছি ছি, এ কী বলছেন স্যার। ঘুষ নয়, তবে—যদি দরকার হয়, বুঝলেন না,—বইটা দেখা না থাকলে ত আর আপনি বলতে পারবেন না—

ভূপেন কহিল, মানের বইয়ের চলন ইস্কুল থেকে ওঠাব, এই আমার সাধনা। আর অভিধানের কথা, সে যদি ছেলেরা আমাকে কখনও প্রশ্ন করে, লাইব্রেরীতে সব অভিধানই আছে, দেখে যেটা ভাল মনে হয় সেইটার কথাই বলে দেব। সুতরাং আপনার ও অভিধান কোনোই দরকারে লাগবে না। আপনি ওগুলো নিয়ে যান—

ভদ্রলোক যেন বিষম অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, না না স্যার, আপনার নাম ক'রে নিয়ে এসেছি যখন, তখন ও অনুরোধ আর করবেন না। রেখে দিন, বাড়ির ছেলেপুলেদের ত কাজে লাগবে, না হয় আমাদেরটা রেকমেণ্ড নাই করলেন।

—ছেলেপুলেদের দরকার লাগলে আমি কিনে দিতে পারব। শুধু শুধু অপরিচিত লোকের দান নেওয়া আমি পছন্দ করি না, ও আপনি নিয়ে যান—

যতীনবাবু অনেক আশা করিয়া ভদ্রলোককে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিলেন, ভূপেনের দুইখানা অভিধানের একখানিতে ত ভাগ বসানো যাইবেই, চাই কি উহার কাছ হইতেও ভাইপোর নাম করিয়া একটা বাগানো যাইতে পারে। এখন সব যায় দেখিয়া তিনি ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া একবার চোখ টিপিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, রেখে দাও না ভায়া, ভদ্রলোক তোমার নাম ক'রে বার করলেন বই দুটো, ফিরিয়ে দিলে অপমান বোধ করবেন হয়ত।

ভূপেন ঈষৎ কঠিন কণ্ঠেই কহিল, কিন্তু নিলে আমি নিজে ঢের বেশী অপমানিত বোধ করব যে। দোহাই আপনার যতীনবাবু, এ-সব ব্যাপার আপনাদের ভাল লাগে, আপনারাই নিয়ে থাকবেন, এ ঝামেলা আর আমার কাছে টেনে আনবেন না।···আপনি কিছু মনে করবেন না, মোদ্দা আপনার ঘুষ আমি নিতে পারব না। আপনি ও নিয়ে যান—

ভদ্রলোক আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভূপেন বাধা দিয়া কহিল, আপনি যতই বোঝাবার চেষ্টা করুন যে ওটা ঘুষ নয়, কিছুতেই পেরে উঠবেন না। তাছাড়া আপনি নিজেও বেশ জানেন যে ওটা ঘুষই। আপনি যদি ওগুলো জোর ক'রে রেখে যান তাহ'লে যদি-বা এমনি কোন দিন ভাল-মন্দ বিচারে আপনাদের বই রেকমেণ্ড করবার সম্ভাবনা থাকত, এখন আর থাকবে না। আমি আপনাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালাব—

এ কথার পরে আর তিনি বই রাখিয়া যাইতে সাহস পাইলেন না—পুনশ্চ ব্যাগে পুরিয়া উঠিয়া পড়িলেন। যাইবার সময় শুষ্ক হাসি হাসিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, তাহলে আসি স্যার—একটু দেখবেন গরীবদের—আসুন যতীনবাবু।

যতীনবাবু ক্ষোভ আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া চাপা-গলায় বলিয়া ফেলিলেন, মাইনে ত পান তেতাল্লিশ টাকা, অত তেজ কিসের বুঝি না। পৈতৃক বোধ হয় কিছু আছে। দুটো বই মিলিয়ে বারো টাকা দাম, অনায়াসে আটটা

টাকায় বেচা যেত। আমাদের ত আর উপরি কিছু নেই—ঐগুলোই উপরি। যত সব আহাম্মক!

তিনি মুখ কালি করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ভূপেনেরও আর চিঠি লেখা হইল না, যেটুকু লেখা হইয়াছিল প্যাডের মধ্যে চাপা দিয়া রাখিয়া সে কোনমতে জামাটা গায়ে গলাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যতীনবাবুর শেষ কথাটায় আরও একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। নমুনা-কপি পাঠ্যপুস্তকে আফিস-ঘর ভরিয়া গিয়াছে। এতগুলি বই কি হইবে প্রশ্ন করায় অপূর্ববাবু বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, কেন, বিক্রী হবে। দেখুন না, দুদিন পরেই পুরোনো বইওয়ালারা আসতে শুরু করবে। যা নতুন দাম তার অর্ধেক পর্যন্ত পাওয়া যায়।

ভূপেন অবাক হইয়া বলিয়াছিল, কিন্তু এতে ত প্রকাশকদের ক্ষতি। তার চেয়ে বই না রাখলেই হয়?

--অত সাধু হ'লে চলে না ভায়া, ঐটেই আমাদের উপরি—অপূর্ববাবু জবাব দিয়াছিলেন। সেই কথাটাও এখন মনে পড়িয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভূপেনের ভিতরটা কেমন যেন সির-সির করিয়া উঠিল। সে যেন এই অস্বস্তিকর চিন্তাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্যই গতিটা আরও বাড়াইয়া দিল। এ অস্বস্তি হইতে দূরে কোথাও যাওয়া দরকার। বিজয়বাবু ও কল্যাণীর কথাটা মনে পড়িয়া গেল। একজোড়া স্নেহকোমল চক্ষুর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তাহার পথ চাহিয়া আছে—সেখানে দারিদ্র্য থাকিতে পারে, নীচতা নাই; আতিথ্য সেখানে আড়ম্বরহীন কিন্তু আন্তরিক। সেই স্নিগ্ধ মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে পোঁছিতে না পাবা পর্যন্ত যেন শান্তি নাই।

॥ ১২ ॥

বড়দিনের ছুটিতে ভূপেন বাড়ি যাইবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিল কিন্তু বিশ-একুশ তারিখ নাগাদ হোস্টেল একেবারে ফাঁকা হইয়া আসিলে সে একটু দ্বিধায় পড়িল। তবু হয়ত শেষ পর্যন্ত সে থাকিয়াই যাইত যদি না সহসা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে শান্তির চিঠির সহিত মোহিতবাবুর একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইত।

ভূপেন এখানে আসিবার আগে বাড়ির লোকেদের প্রত্যেককে সাবধান করিয়া দিয়া আসিয়াছিল যে তাহার ঠিকানা যেন কাহাকেও দেওয়া না হয়। সন্ধ্যারা তাহার ঠিকানা খোঁজ করিয়া তাহাকে চিঠি দিবার চেষ্টা করিবে তাহা সে জানিত, আর সেইটাতেই ছিল তাহার আপত্তি। কালের ব্যবধানে একদিন হয়ত সে তাহার বেদনা, তাহার আশাভঙ্গের গ্লানি ভুলিয়া যাইতে পারিবে, বর্তমান ব্যবস্থাতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে, কিন্তু সন্ধ্যাদের সহিত যোগাযোগ থাকিলে সে বিস্মৃতি আর সম্ভব নয়। তাহারা যখন ছাঁটিয়াই ফেলিয়াছে ভূপেনকে তখন কী অধিকার আছে তাহাদের মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিয়া শান্তিভঙ্গ করার? তাহারা ধনী, তাহাদের সহিত ভূপেনের জীবনের কোথাও সমতা নাই—কী প্রয়োজন মিছামিছি অকারণ নিষ্ফল সম্পর্ক রাখার! তাহারা

তাহাদের নিজ কক্ষপথে সুখে ঘুরিয়া বেড়াক—ভূপেনের মনে কোন ক্ষোভ কোন ঈর্ষা নাই। উপগ্রহের অধিকার সে চায় না, সে-মর্যাদাকে সে অপমান বলিয়াই মনে করে।

তাহার অনুমান যে মিথ্যা নয় তা সে ইতিমধ্যে শান্তির পত্রে কয়েকবারই জানিয়াছে। ও-বাড়ির দারোয়ান বার বার তাহার ঠিকানা জানিতে আসিয়াছিল, বার বার তাহারা মিথ্যা বলিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। শেষকালে বুঝি উপেনবাবু বলিয়াই দিয়াছিলেন, বাবুকে ব'লো, ছেলে কাউকে ঠিকানা দিতে বারণ করেছে।

তাহার পর আর কেহ খোঁজ করিতে আসে নাই। ভূপেন তারপর হইতে বাড়ির প্রত্যেক চিঠিখানি খুলিবার সময়ই মনে করিয়াছিল যে, তবু হয়ত সন্ধ্যারা হাল ছাড়ে নাই, তবুও আবার লোক পাঠাইয়াছে কিন্তু আর কোন চিঠিতেই সে কথার উল্লেখ না পাইয়া নিশ্চিন্তও হইয়াছে যেমন—অবুঝ মন তাহার কোথায় যেন একটু ক্ষুণ্ণও হইয়াছে। মনে হইয়াছে যে, এই তাহাদের ভূপেনের সংবাদের জন্য আকুলতা! সন্ধ্যা ত নিজে আসিয়া জোর করিয়া ঠিকানা জানিয়া যাইতে পারিত। সে আসিলে কি আর কেহ 'না' বলিত? পরক্ষণেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়াছে, এ অবশ্য ভালই হইল, ও জের না রাখাই ভাল। সে যাহা চাহিয়াছিল তাহাই হইয়াছে, জীবনের দুটা স্রোত পরস্পর হইতে এতই দূরে যে, সে ব্যবধানে সেতু রচনা করিতে যাওয়াই মূর্খতা।

তাই, আজ এতদিন পরে হঠাৎ মোহিতবাবুর চিঠি পাইয়া সে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু আগে খুলিল বোনের চিঠিই—। শান্তি এ-কথা সে-কথার পর একেবারে শেষের দিকে লিখিয়াছে সন্ধ্যার কথা।—হ্যাঁ, তোমার ছাত্রী সন্ধ্যা হঠাৎ সেদিন এসে হাজির হয়েছিল। ওদের দারোয়ান বার-কতক তোমার ঠিকানার জন্যে এসে ঘুরে গেছে বটে, কিন্তু কর্তা বা তোমার ছাত্রী এতদিন কেউ আসে নি। আমি ওকে কখনও দেখি নি, তুমিও কোনদিন ওর কোন বর্ণনা দাও নি, কিন্তু তবু সেদিন দেখেই চিনতে পারলুম। বেশ মেয়েটি, সত্যি। মুখখানি খুব মিষ্টি, না? আহা, ওর অবস্থা বড় করুণ। কথাটা কিছু ভাঙল না, কিন্তু ভাবে বুঝলুম যে তুমি কোন কারণে ওদের ওপর রাগ করেছ, আর সে দোষটা তাদেরই। তাই জোর করবার সাহস নেই, শুধু খবরটা কোন মতে পাবার জন্য সে কী ব্যাকুলতা! শেষে বলে কি জানো? বলে, 'ভাই বড়দিনের ছুটিতে মাস্টারমশাই আসবেন ত? আচ্ছা তিনি যদি আমার মুখ না দেখেন, যখন দুপুরবেলা ঘুমিয়ে থাকবেন চুপি-চুপি এসে দেখে যাবো, কেমন? কতকাল দেখি নি ভাই, কেবলই মনে হয় এত-দিনে কেমন দেখতে হয়েছেন—কে জানে।' আহা বেচারী! একবার নিজেই বললে, 'আমাকে কি আর এত কাল মনে আছে? কে জানে!' তার পরই আবার জোর দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই মনে আছে। দেখো ভাই তোমার দাদা কখনও আমাকে ভুলতে পারবেন না, আমি কি তাঁকে কম জ্বালাতন করেছি। অন্ততঃ সে জন্যেও ত আমাকে মনে থাকবে, কি বলো?' গলা জড়িয়ে ধরে আমার সঙ্গে কত গল্পই করলে, যেন কত কালের চেনা। অত ত বড়লোক, কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই, না?…এসেছিল একখানা সাদা শাড়ী পরে—মা গো! সোনারত্তি গায়ে

নেই। ওর দাদু কিনে দ্যায় না, না ও পরে না ?…তা তুমি এসে একবার ওর সঙ্গে দেখা ক'রো, কেমন ? লক্ষ্মীটি।…আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, ওরা যদি অত বড়-লোক না হ'ত ত ওকে আমার বৌদি করতুম।…ইত্যাদি।

বহু বহু দিনের পর যেন আবার সেই পাষাণ-ভারটা বুকের মধ্যে অনুভব করিল ভূপেন। শুধু সে কষ্ট পাইয়াছে, সে আঘাত পাইয়াছে ; বেদনা বোধ করিবার, নিজেকে অপমানিত বোধ করিবার কারণ একমাত্র তাহারই ঘটিয়াছে—এতদিন এইটাই ছিল তাহার বড় সান্ত্বনা—আজ এতকাল পরে সন্ধ্যার আকুলতার এই কাহিনী তাহার সেই সান্ত্বনা ও অভিমানের মূলে যেন বড় একটা আঘাত করিল। তাহা হইলে সন্ধ্যাই শুধু তাহার আত্মার সহিত জড়াইয়া যায় নাই ; সন্ধ্যার মনে তাহারও একটা মূল্যবান আসন আছে।…আর তাহার অভাবে সন্ধ্যাও কষ্ট পাইতেছে। মনে মনে শান্তির কথাটার প্রতিধ্বনি করিয়াই সে যেন বলিল, আহা বেচারী! আমার তবু এখানে কাজ-কর্ম আছে, ছাত্ররা আছে, বিজয়বাবু আছেন কিন্তু তার দিন কী ক'রে কাটছে কে জানে। পড়াশুনো হয়ত বন্ধই হয়ে গেছে। অন্য মাস্টার এলে কি আর আমার মত যত্ন নিয়ে পড়াবে ? মনে ত হয় না।

অনেকক্ষণ পরে সে মোহিতবাবুর চিঠিটা খুলিল, তিনি বাড়ির ঠিকানাতেই চিঠি দিয়াছেন, সেই চিঠি ঠিকানা বদলাইয়া এখানে আসিয়াছে। মোহিতবাবু লিখিয়াছেন ঃ

কল্যাণীয়েষু—

বাবা ভূপেন, তোমার খবর জানি না, তবে শুনলুম যে, তুমি মাস্টারী করছ কোথায় মফঃস্বলে। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের স্কুল, মাইনে কম এবং কাজ বেশী—তা ছাড়া ম্যালেরিয়ার ভয় ত আছেই। তুমি যে অভিমান ক'রে এমন একটা কাজ করবে তা ভাবি নি। এর জন্য নিজেকেই যেন সর্বদা অপরাধী মনে করি। তুমি যে আমাকে বুঝতে পারো নি এবং ক্ষমা করো নি এ তারই প্রমাণ। যাক্—তবু আমি অভিযোগ করব না। কারণ অন্যায় হয়ত আমারই। সন্ধ্যা নিজেই পড়াশুনো করে, কী করে তা আমি জানি না, কারণ আমার শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছে হঠাৎ—আমি আর কিছুই দেখতে পারি না। অন্য মাস্টার রাখতে চেয়েছিলুম, সে রাজী হয় নি—সাধারণ প্রাইভেট টিউটর তার পছন্দ হবে না জানি বলে আমিও জোর করি নি। ও একটু মন-মরা হয়েই থাকে বুঝতে পারি, তারই ফলে এ ক'মাসে একটু যেন রোগাও হয়ে গেছে, কিন্তু আমি নিরুপায়। ভাল করলুম কি মন্দ করলুম এ কথাটা যেন ভেবে দেখবারও সাহস নেই—কেননা যদি বিবেক বলে যে মন্দই করেছি, তখন হয়ত কন্যার মৃত্যুশয্যায় করা শপথ আমাকে ভাঙ্গতে হবে। যা করেছি, তার মুখ চেয়েই করেছি, এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। যাক্—তোমার কাছে আমার একটি অনুনয় আছে,—রাখবে বলেই আশা করি, বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসে একবার অন্ততঃ আমার সঙ্গে দেখা করবে—জরুরী দরকার আছে। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি, আর সময় নেই।…তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানবে। ইতি—

সন্ধ্যা কৃশ হইয়া গিয়াছে, সে মন-মরা হইয়া থাকে। আর সমস্ত কথা ছাপাইয়া এই কথাটাই বার বার ভূপেনের মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। বেচারী সন্ধ্যা! সেই প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া সে-দিন পর্যন্ত তাহার আচরণ, তাহার কথাবার্তার প্রতিটি খুঁটিনাটি ভূপেনের মনে পড়িতে লাগিল। এমন শ্রদ্ধা বোধ হয় আজ পর্যন্ত কোন ছাত্র-ছাত্রী কোন গুরুকে করে নাই, সে দিক দিয়া ভূপেনের জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে, সার্থক হইয়া গিয়াছে, আজ আর তাহার কোন ক্ষোভ নাই। বরং এই নির্জন বিদেশে সে সব কথা স্মরণ করিয়াই দুই চক্ষু বার বার সজল হইয়া উঠিল। শিক্ষায় এত অনুরাগ এত নিষ্ঠা, সবই হয়ত বেচারীর ব্যর্থ হইতে চলিল। অথচ ভূপেনের কত আশাই ছিল, প্রাচীনকালের ব্রহ্মবাদিনী ঋষি-কন্যাদের মত এই মেয়েটি একদিন তাহার পাণ্ডিত্য লইয়া পৃথিবীর সামনে দাঁড়াইবে, আর সেই সুদুর্লভ সম্মানের অংশ পাইয়া, উহার গুরুর মর্যাদা পাইয়া সেও ধন্য ও কৃতার্থ হইবে—এই ছিল উহার অন্তরের গোপনতম স্বপ্ন।·· মানুষের অতি স্থূল দেহের প্রশ্ন, সাধারণ নর-নারীর অতি সাধারণ মোহের প্রশ্নই কিনা বড় হইয়া উহার এত বড় আশাকে ব্যর্থ করিয়া দিল! এ ক্ষোভ ভূপেনের ঘুচিবে না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর ভূপেন উঠিয়া পড়িল। না, কলিকাতায় সে যাইবে এবং আজই। কোন মতে জামাটা গায়ে চড়াইয়া বাহিরে আসিল—অপূর্ববাবু নাই, দেশে গিয়াছেন। ভবদেববাবু আছেন আর আছেন অক্ষয়বাবু। নূতন ছাত্র ভর্তি ও বদলির সময় বলিয়াই ভবদেববাবু এখনও যাইতে পারেন নাই—বড়দিনের দিন যাইবেন, এইরূপ কথা আছে। সে তাঁহার কাছে গিয়া কথাটা পাড়িতেই তিনি বলিলেন, ও, আপনি তাহ'লে যাচ্ছেন? এ আমি জানতুম—হোস্টেল খালি হয়ে গেলে আর মন টেঁকে না এখানে···যাক্ ভালই হ'ল, আমার একখানা বই একটু খোঁজ করবেন ওখানে? শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের লেখা; অনেক আগে ছাপা হয়েছিল, এখন নাকি আর পাওয়া যাচ্ছে না। একটু যদি পুরনো বইয়ের দোকানে-টোকানে খোঁজ করেন—চার টাকা পাঁচ টাকা যা দাম হয় নেবেন। বরং এই পাঁচটা টাকা রাখুন আপনার কাছে।

ভূপেন তাড়াতাড়ি কহিল—না, না, ও টাকা এখন থাক্—বইযদি পাওয়া যায় নিশ্চয়ই আনব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।···আর সেই বুকাননের বইটা যে এবার আনাবেন বলেছিলেন, সেটা দেখ্‌ব নাকি?

ভবদেববাবু যেন একটু দ্বিধায় পড়িলেন। একটুখানি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, ওটা? ওটা বরং এ-যাত্রা থাক্। এবার যদি কিছু বাঁচাতে পারি বরং সামনের গরমের ছুটিতে,—আরও দু-একখানা এডুকেশন সিস্টেমের বইসুদ্ধ একসঙ্গে কিনব।···মোদ্দা এটা যেন ভুলবেন না—আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়ান, আমি নামটা লিখে দিই—

তিনি ভূপেনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় রাস্তায় আসিয়া নাম-লেখা চিরকুটটা দিয়া

গেলেন। এ বইটিও যে স্কুলের টাকাতেই কেনা হইবে, ভূপেন তাহা জানে, অথচ অত্যন্ত দরকারী বই কিনিবার সময়েও ভবদেববাবু কত না ইতস্ততঃ করেন।

আর একটা বিদায় নেওয়া বাকী আছে—সে বিজয়বাবুদের কাছে। ভূপেন হিসাব করিয়া দেখিল যে, দুই ঘণ্টার মধ্যে হোস্টেলে ফিরিয়া আসিতে না পারিলে পাঁচটার ট্রেনটা কোন মতেই ধরা যাইবে না। সুতরাং খুবই জোরে পা চালাইতে হইবে। যাতায়াতেই প্রায় তিন কোয়ার্টার সময় চলিয়া যায়, তার উপর বিজয়-বাবুর বাড়ি একবার গিয়া পড়িলে উঠিয়া আসা শক্ত; এমন করিয়া সকলে মিলিয়া অনুরোধ করেন আর একটু বসিবার জন্য যে, কোনমতেই ওঠা যায় না। বিশেষতঃ কল্যাণী, প্রতিদিনই একরকম জোর করিয়া ভূপেনকে চলিয়া আসিতে হয়, কোন দিন সে সহজ সম্মতি দেয় না।

আজও তাহার কলিকাতায় যাইবার সংবাদটা শুনিবামাত্র, সকলে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল। কল্যাণী কহিল, বা-রে, আমি ক'দিনে কত কী সব পিঠে তৈরী করব মনে ক'রে রেখেছি, আর আপনি অম্‌নি না বলা-কওয়া বাড়ি চললেন? সে হবে না। এখন দু-তিনদিন ত নয়ই।

বিজয়বাবু সস্নেহ-ধমক দিয়া কহিলেন, তাই বলে ও বেচারী বাড়ি যাবে না। সেখানে ওর বাবা-মা ভাই-বোন ওর পথ চেয়ে নেই? তারা বুঝি কেউ নয়? না যাওয়াটাই বরং অন্যায় হ'ত।

অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কল্যাণী কহিল, আমি কি তাই বলছি? উনি আগে বললেন কেন যে যাবেন না? তাই ত আমি আশা ক'রে আয়োজন করলুম—

ভূপেন কহিল, তুমি দুঃখ করছ কেন ভাই, আমি পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যেই ফিরে আসছি ত, স্কুল খোলবার আগেই এসে পেঁছিব—তখন বরং এইগুলো ক'রো; দু'দিন না হয় মুলতুবী থাক্ না।

বিজয়বাবুও খুশী হইয়া কহিলেন, সে ভাল কথা। এ ক'দিন না হয় বন্ধ থাক।

কিন্তু কল্যাণীর মনের মেঘ কাটিল না। সে কহিল, হ্যাঁ, তাই নাকি হয়। সব ঠিক-ঠাক—এখন নাকি বন্ধ রাখা যায়।

তার পরই কি ভাবিয়া কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া কহিল, আচ্ছা, সে যাই হোক্ এখনও ত দেরি আছে, দেখি এর মধ্যেই কিছু করা যায় কিনা।

হাত-ঘড়িটা দেখিয়া ভূপেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ও কি, এখন হবে না কল্যাণী, এক ঘণ্টা সময়ও পুরো নেই। এখন থাক্, বুঝলে? মিছিমিছি ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই—ফিরে এসে হবে'খন্—এই কল্যাণী—

কিন্তু কল্যাণী ততক্ষণে রান্নাঘরের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। আর করিলও সে অসাধ্য-সাধন। একঘণ্টা পার হইবার আগেই কী একটা খাবার প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে এইগুলি প্রস্তুত করিতে তাহাকে যে কী পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তা তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ভূপেন বুঝিতে পারিল, ছুটাছুটিতে মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এই শীতেও ললাটের প্রান্তে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া গিয়াছে।

জলযোগ শেষ করিয়াই ভূপেন উঠিয়া পড়িল। ছোট ছেলেমেয়েগুলির কাছে বিদায় লইয়া বিজয়বাবুকে প্রণাম করিয়া কল্যাণীর দিকে তাকাইতেই সে সহসা বলিয়া উঠিল, চলুন আপনাকে ঐ মোড়টা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

ভূপেন খুশী হইয়া কহিল, সেই ভাল, চলো।

সকলের ছোট ভাইটির হাত ধরিয়া কল্যাণী তাহার পিছু পিছু অনেকখানি পথ কিন্তু নিঃশব্দেই আসিল। তারপর হঠাৎ এক সময়ে কহিল, আচ্ছা, এইবার আপনি যান, আমি ফিরি।

তারপর গলায় আঁচল দিয়া পথের উপরেই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া যেন কোন মতে প্রশ্নটা করিয়া ফেলিল, আবার আসবেন ত?

ভূপেন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছে। সে কহিল, কেন, সন্দেহ আছে নাকি?

—যদি—যদি ভাল চাকরি পান অন্য কোথাও?

অস্ফুট স্বরে প্রশ্নটা শেষ কবিবার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া কপোল বাহিয়া অজস্র জল ঝরিয়া পড়িল।

সে-দিকে চাহিয়া মুহূর্তের জন্য ভূপেনের কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। সে কল্যাণীর একখানা হাত নিজের মুঠার মধ্যে ধরিয়া ঈষৎ চাপ দিয়া গাঢ়কণ্ঠে কহিল, আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব কল্যাণী, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

বোধ হয় নিজের দুর্বলতায় কল্যাণী নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল—সে নীরবে ভূপেনের হাতের মধ্য হইতে হাতটা টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাড়ির রাস্তা ধরিল।…

কল্যাণীর এ ব্যবহার যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অভাবনীয়। দুই তিন মাসের যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতায় বিজয়বাবুর পরিবারের সকলের প্রতিই সে আকৃষ্ট হইয়াছে সত্য কথা, তাঁহারাও সকলে তাহাকে স্নেহ করেন, কিন্তু সে সম্পর্ক যে কোনদিন সাধারণ প্রীতির স্তর হইতে অন্তরঙ্গতর হইতে পারে—এ-কথা ভূপেন একদিনও ভাবিয়া দেখে নাই। বিজয়বাবু লোকটি ভাল, ছেলেমেয়েগুলিও ভদ্র ও মিষ্ট স্বভাবের, এই জন্যই একটা আকর্ষণ ছিল ভূপেনের। কিন্তু—। অবশ্য এটা কল্যাণীর স্নেহ-কোমল হৃদয়ের অত্যন্ত স্বাভাবিক বিকাশ হইতে পারে আর সেই-টাই বেশী সম্ভব, ভূপেন নিজেকে বার বার এই কথাটাই বুঝাইল। কল্যাণীর এত দিনের ব্যবহারে এখনও এমন কোন বিশেষ সুর বাজে নাই যে আজ অন্য কথা ধারণা করা যায়।…তবু, ফিরিবার পথে সারাটা সময় সেই কিশোরী মেয়েটির কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহাকে উন্মনা করিয়া রাখিল।

॥ ১৩ ॥

বাড়ি পৌঁছিয়া ভূপেন শান্তির মুখে শুনিল, সন্ধ্যা সেদিনও তাহার খবর লইয়া গিয়াছে। মোহিতবাবুর শরীর নাকি খুবই খারাপ—অতিরিক্ত ব্লাডপ্রেসার, ঘরের বাহিরে আসাও নিষেধ। যে কোন মুহূর্তেই হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়া যাইতে পারে।

শান্তি প্রশ্ন করিল, আজ রাত্রেই যাবে নাকি দাদা ওখানে?

অকস্মাৎ যেন ভূপেন শান্তির উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল, হ্যাঁ—তা যাবো না! সবে আসছি তেতে-পুড়ে আমার আর বিশ্রামের দরকার নেই!

অপ্রতিভ হইয়া শান্তি কহিল, না—অত অসুখ, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। হঠাৎ যদি কিছু ভালমন্দ হয় ত—

—হয় ত আমি কি করব! আমি ত আর ডাক্তার নই—ভগবানও নই।

শান্তি আর কথা কহিল না। ভূপেন কাপড়-জামা ছাড়িয়া বাথরুমের দিকে চলিয়া গেল মুখ-হাত ধুইতে। রাস্তার ধুলো তাহার সর্বাঙ্গে, মাথার চুলে পর্যন্ত যেন পুরু হইয়া জমিয়াছে। বহুদিন কলের জলে স্নান করিলে তবে যদি একটু পরিষ্কার হয়।

মা বলিলেন, কী কালো হয়ে গেছিস্ রে! একেবারে চেনা যায় না যেন!

ভূপেনের তখনও বিরক্তি কাটে নাই, সে ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল, আমি ত মেয়েছেলে নই যে, রং ফরসা রাখার জন্যে ভাবতে হবে।

আসল কথা, বিরক্তিটা তাহার নিজের উপরই। সে আসিতে আসিতে এই কথাটাই ভাবিতেছিল যে আজ রাত্রেই সন্ধ্যার বাড়ি যাওয়া যায় কিনা। সন্ধ্যা কৃশ হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা ম্লান হইয়া থাকে—এই সংবাদটার সহিত তাহার মনের আবেগ জড়াইয়া কী এক দুর্বার আকর্ষণে টানিতেছে তাহাকে ঐ দিকেই—আর সেই জন্যই সে যেন নিজের উপর বিরক্ত। যাহাদের সহিত প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু ছিল না, থাকা সম্ভব নয়—তাহাদের সম্বন্ধে মনে এ রকম দুর্বলতা থাকা অন্যায়। ইহাকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না।

মা জলখাবার ও চা দিয়া বলিলেন, এখনই কি ভাত খাবি, না ওখান থেকে ঘুরে আসবি আগে?

—কোথা থেকে ঘুরে আসব?···চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিতে গিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে ভূপেন।

—সন্ধ্যাদের বাড়ি থেকে? না, কাল সকালে যাবি? ওর দাদু নাকি এখন-তখন।

—তোমাদের অত দরদ থাকে তোমরা যাও—আমি এই রাত্রে কোথাও বেরোতে পারব না।

সত্য সত্যই সে-দিন গেল না সে। হয়ত ইহা অকৃতজ্ঞতা, মোহিতবাবুর সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইবার, কৃতজ্ঞ বোধ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে তাহার—তবু মা-বোনের এই উদ্বেগ এবং ধারণা যেন কেমন একটা অকারণেই তাহাকে বিগড়াইয়া দিল। ইহারা কথাটা না পাড়িলে হয়ত এক সময়ে তাহার মনে স্বাভাবিক আকর্ষণেরই জয় হইত—কিন্তু এখন এমনই একটা অভিমান উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে যে, আর যেন কোন মতেই আজ রাত্রে যাওয়া যায় না। সেজন্য—রাত্রি যখন সত্য সত্যই গভীর হইয়া আসিল, যাওয়ার সম্ভাবনা সত্যই আর রহিল না, তখন সে অনুতপ্ত হইয়া উঠিল এবং বহু রাত্রি পর্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই মুখ-হাত ধুইয়া বাহির হইয়া পড়িল—

জলযোগের জন্য দশ মিনিটও অপব্যয় করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু চোরবাগানে সেই বিশেষ পরিচিত গলিটার মোড়ে পৌঁছিয়া নানা রকমের বিভিন্ন মনোভাব একই সঙ্গে যেন তাহাকে কেমন বিহ্বল ও আচ্ছন্ন করিয়া দিল। পা যেন আর চলে না। কত আশা, ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন এইখানে তাহার মনে গড়িয়া উঠিয়াছিল—কত স্নেহ ও শ্রদ্ধা তাহার প্রাপ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল সেদিন, তারপর একদিন আবার এইখানেই সব ভাঙিয়া চুরিয়া বর্তমান অবজ্ঞাত, অখ্যাত, আশাহীন ভবিষ্যৎহীন জীবনযাত্রার সূচনা হইল—এই বাড়িটি তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উৎস।

কিন্তু না, সে জোর করিয়া পা চালাইল, স্বপ্ন যদি কিছু দেখিয়া থাকে ত সে-ই অন্যায় করিয়াছে। তাহার জীবন যা হইতে পারিত তাহাই হইয়াছে। কী পায় নাই, কী হইতে পারিত সে হিসাব আজ থাক্—যেটুকু অযাচিত ভাবে কল্পনার অতিরিক্তরূপে সে পাইয়াছে, সেইজন্যই যেন কৃতজ্ঞ থাকে সে চিরদিন—সেইটাই মনুষ্যত্ব।

দারোয়ান সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাসী-চাকরদের সকলের মুখে ই অভ্যর্থনার হাসি। এ বাড়ির সবই তাহার জানা, সেও সকলের পরিচিত সুতরাং কেহই ভিতরে সংবাদ দিবার বা পথ দেখাইবার চেষ্টা করিল না। বুকের অকারণ স্পন্দনকে প্রাণপণে দমন করিতে করিতে সে নিজেই যতদূর সম্ভব সহজভাবে উপরে উঠিয়া গেল। কিন্তু সিঁড়ির মোড়টা ঘুরিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িল সন্ধ্যা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই দেখা হওয়াটা লইয়া তাহার মনে মনে বহুদিনের একটা প্রতীক্ষা ছিল—প্রস্তুতিও ছিল, তবু এই আকস্মিক সাক্ষাতে সেও কিছুক্ষণ যেন অনড় অচল হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, কোন সম্ভাষণ বা কোন প্রশ্ন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

সন্ধ্যা কাল রাত্রেই ভূপেনকে আশা করিয়াছিল, না আসাতে উদ্বিগ্নও হইয়াছিল। সেই জন্য ভোর হইতেই তাহার একটা কান পাতা ছিল বাহিরের দিকে—একটি বহু-পরিচিত পদধ্বনির আশায়। ভূপেন বাড়িতে পা দিতেই তাই সে সংবাদ সকলের আগে তাহার কানে পৌঁছিয়াছে। আগেকার দিন হইলে সে ছুটিতে ছুটিতে নিচে আসিয়া ভূপেনকে অভ্যর্থনা করিত কিন্তু আজ যেন কেমন সঙ্কোচে বাধিল। সব কথা সে জানে না, শুধু এইটুকু জানে যে তাহাদের দিক হইতেই কি একটা অন্যায় হইয়াছে আর সেই জন্যই মাস্টারমশাই পড়াশুনা ছাড়িয়া ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই সুদূর পল্লীগ্রামে নিজেকে একরূপ সমাহিত করিয়াছেন এবং সেই অপরাধেই খুব সম্ভব তাহাদের সহিত পত্রালাপ পর্যন্ত রাখিতে চান না।

এই সব কথা মনে ছিল বলিয়াই হইক, আর এই দেখা বহুদিনে ঈপ্সিত বলিয়াই হউক—চোখোচোখি হওয়ার পর মুহূর্ত-কয়েক সন্ধ্যারও যেন পা চলিল না। তারপর অবশ্য সে-ই নিজেকে সামলাইয়া লইল, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া সেই মধ্য-পথেই ভূপেনকে প্রণাম করিয়া অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কহিল, বড্ড রোগা আর কালো হয়ে গেছেন মাস্টারমশাই।

ভূপেনের বিহ্বলতাটা তখনও যেন কাটে নাই। তবু সে চেষ্টা করিয়া হাসিল। কহিল, আমি ত পাড়াগাঁয়ে পড়েছিলুম, ভাল ক'রে খাওযাই হয় নি অর্ধেক দিন। কিন্তু তোমারও ত শরীর খুব ভাল দেখছি না।

সত্যই সন্ধ্যা কৃশ হইয়া গিয়াছে। আর লম্বাও হইয়াছে যেন অনেকখানি। সন্ধ্যার দেহে কৈশোরের ছোঁয়াচ লাগার বহু পূর্ব হইতে সে তাহাকে পড়াইতেছে—প্রতিদিনকার দেখার ফাঁকে ফাঁকে তাই কখন যে তাহার দেহে কৈশোরের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ভূপেন বুঝিতেও পারে নাই। আজ সে প্রথম লক্ষ্য করিল যে, কৈশোরও তাহার যায় যায়—এমনকি সন্ধ্যাকে তরুণী আখ্যা দিলেও খুব বেমানান হয় না। হয়ত ইহার সবটা স্বাভাবিক নয়। ভূপেন চলিয়া যাওয়াতে লেখাপড়া এক রকম বন্ধ হইয়াই গেছে, অথচ কী প্রচণ্ড নেশা ছিল তাহার লেখাপড়ায়, তা ভূপেন ছাড়া এত বেশী আর কে জানে! সেই ক্ষোভ—এবং এ পৃথিবীতে তাহার একমাত্র আত্মীয় দাদুর অসুখের জন্য দুশ্চিন্তাই খুব সম্ভব তাহাকে এই প্রবীণতা আনিয়া দিয়াছে, কিশোরীকে সহসা দেখিলে তরুণী মেয়ে বলিয়া সমীহ হয়।

ভূপেন বিস্মিত হইযা তাহাব দিকে চাহিয়া রহিল। এই কয়মাসে যেন কত পরিবর্তনই হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যাকে চেনাই কঠিন আজ। শুধু তাহার সেই আশ্চর্য চোখ দুটি, শ্রদ্ধায় ও জিজ্ঞাসায় পূর্ণ সেই স্থির দৃষ্টিটুকুই তেমনি আছে—একমাত্র সেই চোখ দুটির দিকে চাহিলেই তাহার সেই ছোট্ট ছাত্রীটিকে মনে পড়ে।

সন্ধ্যা একটু হাসিয়া কহিল, কি দেখছেন অবাক হয়ে, আমকে কি চিনতে পাবছেন না?

ভূপেনও এতক্ষণে সামলাইয়া উঠিয়াছে, সেও হাসিয়াই জবাব দিল, সেই রকমই বটে।··· যাক—কেমন আছেন দাদু?

দাদুর প্রসঙ্গে সন্ধ্যার মুখের প্রস্ফুট শতদলটি যেন নিমেষে মুদিয়া গেল। ছলছল চোখে কহিল, কি জানি, কিছুই ত বুঝতে পারছি না। উঠতে ত পারেনই না, এক দিককার পা-টাও যেন কম-জোর হয়ে গেছে, প্যারালিসিসের মত। এছাড়া আর কোন রকম অসুখ নেই, জ্বর-টর বা কোন উপসর্গও নেই। কিন্তু ডাক্তাররা বলছেন যে ব্লাডপ্রেসার একটু কমলেও উনি আর কাজ-টাজ কোন দিন করতে পারবেন না। চলুন না—দাদু উঠেছেন এতক্ষণে।

সন্ধ্যার পিছনে পিছনে ভূপেন মোহিতবাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মোহিতবাবুও শীর্ণ হইযা গিয়াছেন, মুখে একটা অস্বাভাবিক পাণ্ডুর আভা। ভূপেনের মনে হইল, তিনি যেন এই কমাসেই অতিরিক্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

ভূপেনকে দেখিয়া তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিলেন, তুমি এসেছ? বাঁচলুম! জানতুম যে আমার এই রকম খবর পেলে তুমি না এসে থাকতে পারবে না।···গিন্নী, মাস্টারমশাইকে চা-টা দাও।

সন্ধ্যা কহিল, আর তোমার ওষুধ—দাদু?

—দাও ওষুধ। তারপর ভূপেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, ওষুধে ত এর কিছু হয় না। নিয়মিত ডায়েট আর বিশ্রাম। তারপর হঠাৎ একদিন ডাক আসবে,

বিনা নোটিশেই চলে যেতে হবে। তবু ডাক্তাররা ছাড়ে না, সব জেনে-শুনেও ওষুধের স্তোক দেয়।

ভূপেন এতক্ষণে প্রশ্ন করিল, এখন কেমন আছেন? একটু ভাল বোধ করছেন?

—ভাল?…মোহিতবাবুর প্রশান্ত মুখ নির্মল হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ভাল কি আর বোধ করা সম্ভব বাবা? বয়স ত কম হ'ল না, খাটছিও বহুদিন ধরে। প্রকৃতি তার শোধ নেবে বই কি। তবে একটা কথা বিশ্বাস করো, ঠিক পয়সা রোজগারের জন্যেই এতদিন খাটি নি, অর্থলোভ আমার এত প্রবল নয়—খাটতুম শুধু একটা অভ্যাসে, অনেক-কিছু ভুলে থাকবার জন্য। যাক—বাজে কথা বেশী বলব না, কারণ একটু বেশী কথা কইলেই মাথার মধ্যে কেমন ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, বুকের মধ্যেও একটা যন্ত্রণা হয়। আর বেশী দিন নয় এটা ঠিক—বাঁ পা-টা পড়ে গেছে, ওদিককার চোখেও মোটে দেখতে পাই নে। বুকের অবস্থা খুব খারাপ। এইবার একদিন হঠাৎ ডাক আসবে, তারই অপেক্ষা করছি।

তারপর চোখ বুজিয়া একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, অবশ্য তার জন্য আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। আমি বহুদিন ধরেই প্রস্তুত আছি। এমন কি যদি এই মুহূর্তেই চলে যেতে হয় তবে এ নালিশও করব না যে, অমুক জরুরী কাজটা সারা হ'ল না, কিংবা সন্ধ্যার একটা ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারলুম না। আমরা বিষয়ী লোক—যত দিনই বাঁচি না কেন, কতকগুলো কাজ চিরদিনই অসমাপ্ত থেকে যাবে। স্নেহের বন্ধন থেকেও ত স্বেচ্ছায় মুক্তি নিতে পারব না।

সন্ধ্যা মোহিতবাবুকে ঔষধ খাওয়াইয়া চলিয়া গিয়াছিল; এইবার ভূপেনের চা ও জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার চোখ দুইটি আরক্ত, চোখের পাতাও ভিজা। বোধ হয় মোহিতবাবুর কথাগুলি তাহার কানে গিয়াছে। সেদিক চাহিয়া মোহিতবাবু হাসিলেন, কহিলেন, গিন্নী, চিরদিন কি আমাকে ধরে রাখতে চাও? তুমি ত সাধারণ মেয়ের মত অবুঝ নও ভাই—তবে অত সহজে চোখে জল আসে কেন—ছিঃ।…আচ্ছা, তুমি এখন একটু ওদিকে দেখাশোনা করো গে, আমি মাস্টারমশায়ের সঙ্গে জরুরী কথাটা সেরে নিই।

সন্ধ্যার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কপোল বাহিয়া অবাধ্য দুটি ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, পাছে আরও অপ্রস্তুত হয় এই ভয়ে সে একটু দ্রুতই বাহির হইয়া গেল। মোহিতবাবু মুহূর্ত-কয়েক তাহার অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া ক্লান্তভাবে চোখ বুজিলেন। তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন কিংবা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের হৃদয়াবেগ দমন করিতেছিলেন—তাহা সেই মুহূর্তে বোঝা শক্ত, ভূপেন তাহা বুঝিবার চেষ্টাও করিল না, শান্তভাবেই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে মোহিতবাবু আবার কথা কহিলেন। বলিলেন, সন্ধ্যার নিকট-আত্মীয় বলতে যা বোঝায় তার অভাব নেই। অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কে তারা খুবই নিকট কিন্তু আত্মীয় কেউ নয়। এদের হাত থেকে সন্ধ্যাকে কে রক্ষা করবে

সেই আমার ভাবনা। সন্ধ্যার যা বিষয় থাকবে তা খুব সামান্য নয়—সে লোভে যদি কেউ কিছু অন্যায় ক'রে ফেলেই ত তাকে দোষ দিতে পারব না। অথচ এই চিন্তাই আমার যাবার মুহূর্তকে ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে—মুখে যতই যা বলি না কেন, নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারব না, ওর একটা ব্যবস্থা না ক'রে। ...তাই এমন একজনের ওপর আমি ভার দিয়ে যেতে চাই যে ওর সম্বন্ধে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চিন্তা করতে পারবে, ওর যথার্থ কল্যাণের দিকটাই শুধু চিন্তা করবে। অনেক ভেবেও বাবা, একমাত্র তুমি ছাড়া আর কারুর নাম মনে পড়ল না, তাই আমার উইলে তোমাকেই ওর অভিভাবক ও এক্‌জিকিউটার ক'রে রেখে গেলাম।

—আমাকে? সে কি।...অতি কষ্টে ভূপেনের কণ্ঠ ভেদিয়া এই দুটি কথা শুধু বাহির হইল।

মোহিতবাবু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, অদৃষ্টের পরিহাস বলে মনে হচ্ছে, না? কিন্তু এ আপৎকালে আর কাউকেই খুঁজে পেলাম না বাবা; আমি জানি সন্ধ্যাকে তুমি কত স্নেহ করো—আমি জানি কি জন্যে সেই সুদূর পল্লীগ্রামে গিয়ে আশাহীন, আনন্দহীন, কীর্তিহীন জীবন যাপন করছো! তুমিই ওর ভার নাও—

ভূপেন ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমি যে এর কিছুই জানি না। আইনকানুন সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই আমার।

—আইন-কানুন জানো না বলেই ত অত বিশ্বাস তোমার ওপর বাবা, ও জ্ঞানটা মানুষকে বড্ড বিপথে নিয়ে যায়। নিজের নির্মল বিচার-বুদ্ধি ও সহজ কল্যাণবুদ্ধির কাছে জগতের কোন আইন দাঁড়াতে পারে না। তাছাড়া—ব্যবহারিক আইনের কোন কথা যদি কোন দিন জানবার দরকার হয়—আমার জুনিয়র যিনি আছেন আমাদের অফিসে, তাঁর শরণাপন্ন হয়ো? তিনি পাকা লোক এবং অকারণে সন্ধ্যার অনিষ্ট করবেন না।

ভূপেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। এ যেন অবিশ্বাস্য কথা—শুনিবার পরও পরিহাস বলিয়া মনে হয়। সে ইঁহাদের কাছে অজ্ঞাতকুলশীল, দরিদ্র, অপরিণামদর্শী তরুণ যুবক। পাছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতায় সন্ধ্যার ভাগ্য তাহার মত লোকের সংগে গ্রন্থি বাঁধে, এই ভয়ে একদিন তাহাকে ইঁহারা বিদায় দিয়াছিলেন, আজ আবার তাহাকেই ডাকিয়া সেই সন্ধ্যার সম্পূর্ণ ভার তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। তাছাড়া মোহিতবাবু তাহার কীই-বা জানেন, কতটুকুই বা জানেন? সে যে নিজেই ভালো করিয়া জানে না নিজেকে, কোন দিন চিনিবার চেষ্টা করে নাই তেমন করিয়া। যদি সে এতখানি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখিতে না পারে।...

এক মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য এলোমেলো চিন্তা তাহার মাথায় ভিড় করিয়া আসিয়া কিছুকালের মত যেন তাহাকে নির্বাক, জড় করিয়া দিয়া গেল।

মোহিতবাবুর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই, তিনি বলিয়াই চলিয়াছেন, ওর একুশ বছর বয়স পর্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে কতকগুলো বাধা-নিষেধ রেখে গেলাম। তার বেশী রাখবার আমার অধিকার নেই, বেঁচে থাকলেও সে অধিকার থাকত না।

এটুকুও রাখলাম আমার মরা-মেয়ের মুখ চেয়ে—তার মৃত্যু শয্যায় করা শপথের অজুহাতে সন্ধ্যার যখন এত বড় অনিষ্টই করলাম তখন শেষ পর্যন্ত সেটা পালন ক'রেই যাব, তার ঋণ কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করব। টাকাকড়ির বিস্তৃত বিবরণ উইলেই পাবে, সব পাকা ব্যবস্থা করা আছে। অর্ধেক আছে দান—বাকী অর্ধেক সব সন্ধ্যার। একুশ বছর বয়স পার হ'লে সবই ও নিঃশর্তে পাবে। শুধু আমার দানের সঙ্গে যে সম্পত্তিগুলোর যোগ আছে সেইগুলো থাকবে তোমার হাতে। আমি ওকে কোন বন্ধনে বেঁধে রাখতে চাই না—ওর পথ ওর সামনে খোলা রইল। সন্ধ্যা এই বাড়িতেই থাকবে—আগলাবার জন্য কোন লোকের দরকার নেই, নেই, আমার ঝি-চাকর সব বহু দিনের, ওরা সন্ধ্যাকে স্নেহ করে। রক্তের সম্পর্কের চেয়ে হৃদয়ের সম্পর্ক বড়—এ আমি চিরদিন বিশ্বাস করি।

ভূপেনের যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে একপ্রকার আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কিন্তু এ ভার কি আমি একা বইতে পারবো? আর অন্তত একজনকেও দিয়ে যান আমার সঙ্গে—

মোহিতবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আর কাউকে এ ভার দেওয়া যায় না বলেই ত তোমাকে জড়াতে হল বাবা। তুমিই পারবে, আমি আশীর্বাদ করছি। সন্ধ্যার কল্যাণ-চিন্তা তোমাকে তোমার কর্তব্য-পথ দেখিয়ে দেবে। নিজের সহজ-বুদ্ধির ওপর বেশী নির্ভর ক'রো—এ আমার অভিজ্ঞতার কথাই তোমাকে বলে গেলাম। সব প্রস্তুত আছে, আমার মুহুরী সত্যবাবুও নিচে আছেন, তিনিই তোমাকে দেখিয়ে দেবেন—কোথায় কী সই করতে হবে, সব বলে দেবেন। হয়ত তোমাকে একবার আমার আফিসেও যেতে হবে।

মোহিতবাবু বোধ করি এতক্ষণ কথা কহিবার শ্রান্তিতেই, আবার চোখ বুজিলেন। ভূপেনও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কাজ করিবার, কথা কহিবার এমন কি এ দায়িত্ব বহনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার একটা উপায় পর্যন্ত চিন্তা করিবারও শক্তি যেন লোপ পাইয়াছে তখন তাহার। শুধু নির্বোধের মত শূন্যদৃষ্টিতে মোহিতবাবুর অনড় দেহটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে মোহিতবাবুরই আবার কথা কহিলেন। বলিলেন, তা'হলে আর আটকাবো না। তুমি সব দেখে শুনে নাও গে। যদি কিছু প্রশ্ন করবার থাকে এখনও উত্তর পাবে—এর পর সব ঘোলাটে হয়ে যাবে—বেঁচে থাকলেও কাজে আসবো না।

ভূপেন উঠিয়া দাঁড়াইতে তিনি ইঙ্গিত করিয়া কাছে ডাকিলেন। চুপি চুপি কহিলেন, তোমাকে কিছু দেবার সাহস আমার হয়নি, তবে এমন ব্যবস্থা আছে যে, ইচ্ছে করলে অনেক কিছু নিতে পারবে। এই অনুরোধটি আমার রেখো তুমি—যদি তোমার প্রয়োজন পড়ে নিতে ইতস্তত ক'রো না। আশীর্বাদ করি তুমি মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠো, একদিন তোমার কীর্তি, তোমার যশ যেন সারা দেশে ছড়িয়ে যায়। আমাদের জন্যে যে অনিষ্ট তোমার হ'লো তা যেন এক দিন ব্যর্থ হয়।...আমি যে ভুল করলুম তা যেন কোন দিন তোমাদের করতে না হয়—যে কর্তব্য সহজে সামনে আসে তাকেই যেন বরণ ক'রে নিতে পারো—যা

ভুল, যা শুধু একটা সংস্কার, মানুষের কল্যাণ বুদ্ধির যা বিরোধী এমন কোন-কিছু যেন তোমার জীবনের স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক পথকে মলিন বা বিড়ম্বিত না করে। আজ একটা কথা তোমাকে অকপটে বলে যাই বাবা, ভুল আমি করি নি, সন্ধ্যার মন কোন দিকে যাচ্ছে তা আমি ঠিকই অনুভব করতে পেরেছিলাম—তবুও আমি যেটাকে অনিষ্ট বলে আশংকা করেছিলাম তাকেও বোধ হয় ঠেকাতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত। মিছিমিছি সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। তোমার প্রতি সন্ধ্যার যে শ্রদ্ধা, তার সঙ্গে কতটা স্নেহ মেশানো ছিল তা তুমি ত বুঝতে পারোই নি, আমিও বুঝি নি। সেই জন্যেই অনুতাপ হয় বাবা—মিথ্যা মোহকে, সম্মানবোধকে আঁকড়ে না ধরে থাকলেই হ'তো। প্রতিজ্ঞা বা শপথ প্রাণপণে রক্ষা করাই বীরত্ব নয় শুধু—অনেক সময়ে তাকে লঙ্ঘন করা আরও বেশী সংসাহসের কাজ—তাতে বীরত্ব আরও বেশী। যাক—আবারও তোমাকে হয়ত আর একটা বিড়ম্বনা আর কণ্টকর বন্ধনের মধ্যে ফেললাম—কিন্তু কোন উপায় ছিল না। সন্ধ্যার ভার তুমি ছাড়া আর কে নেবে বলো ?···

অতিরিক্ত আবেগ ও ক্লান্তিতে মোহিতবাবু যেন হাঁপাইতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল। সেদিকে চাহিয়া, যেটুকু ক্ষোভ বা নালিশ ভূপেনের মনে ছিল, সব ধুইয়া মুছিয়া, নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পাছে তাহারও চোখে জল আসিয়া পড়ে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।···

সন্ধ্যা পাশের ঘরে অর্থাৎ তাহার নিজের শোবার ঘরে জানালার সামনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূপেন মোহিতবাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঈষৎ রুদ্ধ কণ্ঠে যখন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল তখন সে যেন প্রথমটা চমকিয়া উঠিল। তারপর তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, আপনি চললেন ?

—হ্যাঁ সন্ধ্যা, নিচে আমার কাজ আছে। তুমি দাদুর কাছে যাও।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সন্ধ্যা কহিল, আর কি আপনার দেখা পাবো না ?

—পাবে বৈ কি—নিশ্চয়ই পাবে। এখন ত আসতেই হবে আমাকে। তোমার দাদু যে—আচ্ছা থাক সে সব কথা, পরে বলব এখন।

তখন তাহার নিজের কথাবার্তার উপর, নিজের চিন্তা-শক্তির উপর যেন কিছু-মাত্র আস্থা ছিল না। কোন মতে প্রয়োজনীয় কাজটা সারিয়া নির্জনে কোথাও যাইতে পারিলে যেন বাঁচে। তাই সন্ধ্যার প্রণাম শেষ হইবার আগেই সে স্খলিত অথচ দ্রুতগতিতে নামিয়া আসিল।

॥ ১৪ ॥

শুধু ঐ উইল সম্পর্কে বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্তগুলো বুঝিয়া লইবার জন্য যে দুই-তিনটা দিন কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন হইল তাহার বেশী আর এক দিনও ভূপেন থাকিতে পারিল না ; স্কুল খুলিবার দুই-তিনদিন আগেই, বলিতে গেলে এক রকম পলাইয়া গেল। কিন্তু এ পলায়ন যে কাহার কাছ হইতে—সে প্রশ্ন তাহাকে করিলে সে বলিতে পারিত না।

এ কয় দিন সন্ধ্যার সহিত যে দেখা হয় নাই তাহা নহে ; কিন্তু সে দেখা হওয়াটাকে কিছুতেই দুই-এক মিনিটের বেশী যাইতে দেয় নাই ভূপেন। কথা যা হইয়াছে তা-ও নিতান্তই কাজের কথা—যেগুলি না কহিলেই নয়। তাহার এই ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া যাওয়া সন্ধ্যাও লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু মুখে কোন নালিশ জানায় নাই—শুধু তাহার মুখের করুণ বিষণ্ণতা বিষণ্ণতর হইয়া উঠিয়াছিল মাত্র। শেষ দিনে মোহিতবাবুর খবর লইয়া যখন সে চলিয়া আসিতেছে তখন সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা একটি মাত্র অনুরোধ জানাইয়াছিল, দেখুন মাস্টার-মশাই—আমার এখন ঠিক ইস্কুল কলেজের কোন কোর্স পড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। এমনি খানকতক ভাল ভাল বইয়ের তালিকা যদি তৈরী ক'রে দিতেন ত বড় ভাল হ'ত।

এ প্রসঙ্গ আগে উঠিলে ভূপেন সব কাজ ফেলিয়া বোধ হয় তখনই ফর্দ তৈয়ারী করিতে বসিত—কিন্তু আজ শুধু একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, আচ্ছা আমি ওখানে গিয়ে তোমাকে লিখে জানাবো সন্ধ্যা।

আসল কথা, সন্ধ্যার সান্নিধ্যে তাহার যেন বড় ভয় করে। মোহিতবাবুর সেদিনকার ইঙ্গিতটা পাইবার পূর্বে সে কখনও ভাবিয়া দেখে নাই যে, সন্ধ্যার সহিত তাহার সম্পর্কে নিতান্ত গুরু-শিষ্যের সুগভীর আত্মীয়তা-বোধ ছাড়া অন্য কোন অন্তরঙ্গ ছায়া পড়িয়াছে কি না। প্রথম তাহার সন্দেহ হইয়াছিল সন্ধ্যার আচরণের সংবাদে। সে ম্লান হইয়া থাকে, সে কৃশ হইয়া গিয়াছে, পড়াশুনায় তাহার আর আগের মত অনুরাগ নাই—সব কয়টি সংবাদই নূতন একটা বিশেষ সম্ভাবনার আভাস দিয়াছিল। এবার মোহিতবাবুর কথায় সে সন্দেহ যখন দৃঢ়-মূল হইয়া গেল তখন সে প্রথম নিজের মনটার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিল, ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার সাহস রহিল না। তাই, কতকটা সে যেন নিজের কাছে ধরা পড়িবার ভয়েই কলিকাতা ছাড়িয়া সন্ধ্যাকে ছাড়িয়া সুদূর বীরভূমের পল্লীতে পলাইয়া গেল। সন্ধ্যা মিষ্ট, সন্ধ্যার সঙ্গ লোভনীয়, সে তাহার আত্মার আনন্দ—তবু সে সুদূর, সে শুধু মরীচিকা। সে যত দূরে থাকে ততই ভাল। যে সম্ভাবনা আজ অঙ্কুর—তাহাকে অংকুরেই নষ্ট করা প্রয়োজন—কোন মতে তাহাতে না পত্রোদ্গম হয়। মোহিতবাবু যেদিন এই সম্ভাবনা আশংকা করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়াছিলেন সেদিন হইতে আজ তাহার দায়িত্ব আরও বেশী—কঠিন তাহাকে হইতেই হইবে, নহিলে নিজের কর্তব্য পালনে হয়ত ত্রুটি ঘটিবে, হয়ত-বা প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। কলিকাতার বাতাসে তাহার যৌবন-স্বপ্নের জাল বোনা আছে—সেখানে ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্ন সে দেখিয়াছে—সে যে এক দিন বড় হইতে চাহিয়াছিল, নিজের প্রিয় ছাত্রীকে বড় করিতে চাহিয়াছিল সে কথা আজও সেখানে গেলে মনে পড়ে। আজও সন্ধ্যার চোখের দিকে চাহিলে সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত রূঢ় বাস্তব যেন ভুল হইয়া যায়—লোভে মন দুলিয়া ওঠে। তার চেয়ে এই ভাল। অল্প বেতন, কদর্য আহার, অন্ধকার ভবিষ্যৎ—এই ভাল। ভাল তাহার এই সহকর্মীদের সংগ, ভাল এখানকার রুক্ষ বাতাসে বাহিত পর্যাপ্ত ধুলা। স্বপ্ন সে আর দেখিবে না, দেখিবার অধিকার তাহার নাই।

এবার স্কুল খুলিবার পর ভূপেন যেন কতকটা নিজের মনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই শিক্ষকতার কাজে নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া দিল। সে আসিবার সময় নিজের টাকাতেই শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক দুই-একখানা বই কিনিয়া আনিয়াছিল। সেগুলি সে এখন লাল পেন্সিলে দাগ দিয়া জোর করিয়া মাস্টারমহাশয়দের পড়াইতে লাগিল। টিফিনের সময় মাস্টারমহাশয়রা একত্র হইলেই সে ভাল ভাল বাংলা বই হইতে খানিকটা করিয়া পড়িয়া শুনাইত। শুধু তাই নয়—এবারে সে সেক্রেটারীকে বলিয়া পদন, সালেক এবং আরও দুই-তিনটি ছেলের কোচিং-এর ভার নিজের হাতে ও দিজের দায়িত্বে তুলিয়া লইল। অর্থাৎ ইচ্ছামত যাহাতে সে পড়ার বইয়ের বদলে গল্পের বই-ও পড়াইতে পারে, সে অধিকারটুকু রাখিয়া দিল।

মাস্টারমহাশয়রা সকলেই তাহাকে পাগল ঠাওরাইয়াছিলেন। কেবল অপূর্ব-বাবু প্রভৃতি দুই-একজন এই পাগলামির মধ্যেও মতলব খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের এ অসহযোগ ভূপেনের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল, সেটা আর সে গ্রাহ্যই করিত না; তবু এক এক সময় হতাশ হইয়া পড়িত বৈকি! বহুদিনের অজ্ঞতায়, মূর্খতায় ও অমনোযোগে যে অশিক্ষা, যে অন্ধকার ছেলেদের মনে জমিয়া উঠিয়াছে তাহাকে দূর করিবার চেষ্টা করা নিজের কাছেও মধ্যে মধ্যে বাতুলতা বলিয়া বোধ হইত। তাহার উপর—সব চেয়ে বড় কথা, পড়াইবে সে কাহাকে? কী ভীষণ দারিদ্র্য ইহাদের, এর মধ্যে লেখাপড়ার প্রসঙ্গটাই যে অশোভন ঠেকে। এই পৌষ মাস, সবে ধান উঠিয়াছে চাষীদের ঘরে, তবু অর্ধেক ছেলে একবেলা বেগুনসিদ্ধ খাইয়া থাকে—কেহ বা খালি পেটে স্কুলে আসে—ফিরিয়া গিয়া একেবারে ভাত খায়। গরম জামা শতকরা একটা ছেলেরও নাই, জুতা ত স্বপ্ন।···অধিকাংশ ছেলেই খালি পায়ে সুদ্ধমাত্র একটা ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে ইস্কুলে আসে। অপেক্ষাকৃত যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহারাই ছেলেদের বোর্ডিং-এ রাখে, তবু সারা বোর্ডিং খুঁজিয়াও একটা আস্ত জামা বাহির হইবে না। পড়াইতে বসিয়া ভূপেনের খালি মনে হয় যাহাদের আগে পেট ভরিয়া ভাত খাওয়ানোই উচিত—তাহাদের মাথা ভরিয়া বিদ্যা ঠাসিয়া দিলে কি হইবে।

তবে এবারে সে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটি লোককে নিজের দলে পাইয়া গেল। বিজয়বাবু নির্বিরোধী লোক, তিনি কখনও ভূপেনকে নিরুৎসাহ করেন নাই। বরং এই কাজগুলিই যে কর্তব্য, ভূপেনের পথই যে শিক্ষকের আদর্শ ও একমাত্র পথ তাহাও বার বার স্বীকার করিয়াছেন. তবু কোথায় যেন তাঁহার মনের মধ্যে এ বিষয়ে একটা উপহাসের, হতাশার সুর ছিল—তিনি কখনও তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগাইয়া আসেন নাই। বরাবরই যেমন নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকিতেন তেমনিই রহিয়া গেলেন। কিন্তু যাঁহার সব চেয়ে গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থী হইবার কথা, সেই রাধাকমলবাবুই সামান্য একটা ব্যাপারে ভূপেনের অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন।

কথাটা আর কিছুই নয়—একদিন টিফিনের সময় ভূপেন রবীন্দ্রনাথের একটা

কবিতা পড়িতেছে, রাধাকমলবাবু ঠাট্টা করিয়া কহিলেন, ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থা ত করেছ ভালোই—কিন্তু সময় যে বড় অল্প, কাঁচা ঘুম চটে গেলে অসুখ করবে যে!

এ শ্রেণীর পরিহাস ভূপেনের নিত্য-সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে কোন কথাই কহিল না, কিন্তু জবাব দিলেন যতীনবাবু। যতীনবাবু সেই অভিধানের শোক ভুলিতে পারেন নাই—সুযোগ-সুবিধা পাইলেই আজকাল ভূপেনকে খোঁচা দেন। তিনি কহিলেন, কেন পণ্ডিতমশাই, ঘুমের ওষুধ কেন?

রাধাকমলবাবু কহিলেন, ও রবি ঠাকুরের কবিতা, ও ত বোঝবার নয়—শুধু শোনবার। কানের কাছে একজন ছড়া পড়লে কার না ঘুম পায় বলো—

অন্য দিন হইলে ভূপেন এ কথাটাও এড়াইয়া যাইত কিন্তু আজ কি খেয়াল হইল, সে পণ্ডিতমহাশয়ের পাশে গিয়া বসিয়া কহিল, দাদা, আপনাকে আজ বলতে হবে, কেন আপনি এ কবিতা বুঝতে পারেন না।—কোন্ কথাটার মানে জানেন না!

রাধাকমলবাবু একটু বিপন্ন বোধ করিলেও হাল ছাড়িলেন না। কহিলেন—কথার মানে জানলে কি হবে বলো—ও যে সবটাই ধোঁয়া—মোদ্দা কথাটা কিছুতেই বোঝা যায় না।

—কবে আপনি বোঝবার চেষ্টা করেছেন বলুন—ভূপেন চাপিয়া ধরিল—এই কবিতাটাই ধরুন, কোনখানটায় আপনার ধোঁয়া লাগছে দেখিয়ে দিন।

এমনি করিয়া সে রাধাকমলবাবুকে দিয়াই পর পর দুই-তিনটি কবিতা পড়াইয়া লইল। একটু ইঙ্গিত দিতে রাধাকমলবাবু নিজেই সব পরিষ্কার বুঝিলেন, তখন আগ্রহ করিয়া 'সঞ্চয়িতা'খানা ভূপেনের কাছ হইতে চাহিয়া লইলেন। ভূপেন তাহার সহিত, রবীন্দ্রনাথের যে বইখানা সে কিছুতেই কাছছাড়া করিত না, সেই শান্তিনিকেতন দুটি-খণ্ডও তাঁহাকে গছাইয়া দিল—বিশেষ করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ দাগ দিয়া। তারপর রাধাকমলবাবু যেন পাগল হইয়া উঠিলেন—এ যেন একটা নূতন রাজ্য তাঁহার সামনে খুলিয়া গেল। তিনি এখন সবিনয়েই ভূপেনের কাছ হইতে বই চাহিয়া লন—কোথাও সন্দেহ থাকিলে আলোচনা করেন এবং স্বেচ্ছায় এক একদিন ভূপেনের কোচিং ক্লাসে যোগ দিয়া তাহাকে সাহায্য করেন। অপূর্ববাবু বলেন বাড়াবাড়ি, যতীনবাবু বলেন ভীমরতি—তবে একটা সুবিধা এই যে, রাধাকমলবাবুকে সবাই সমীহ করেন বলিয়া সামনে কিছু বলিতে সাহস করেন না।

এই ভাবে কোথা দিয়া দুই-তিন বাস কাটিয়া গেল কাজের চাপে ভূপেনের খেয়ালও রহিল না। যে ব্যথা, যে আশংকা ভুলিবার জন্য তাহার এত আয়োজন, আশাভঙ্গের সেই বেদনা এবং দুরাশার সেই আশংকা হইতে সে সত্যই দূরে থাকিতে পারিয়াছিল। সন্ধ্যা ইতিমধ্যে খান-দুই চিঠি দিয়াছিল, তবে সে খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। মোহিতবাবু একটু সুস্থ আছেন—কাজ-কর্ম করিবার মত সুস্থ না হইলেও উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বসিতে পারেন, কথাবার্তা গল্পগুজব করিতে কষ্ট হয় না। হয়ত, এ-যাত্রা বড় আশংকাটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার চিঠিতে এই সংবাদই

থাকে শুধু—আগেকার সে অন্তরঙ্গ সুরটি, বিশ্বাস ও নির্ভরতার সেই সরল সহজ ছন্দটি আর প্রকাশ পায় না। হয়ত এ অভিমান, হয়ত এ সংকোচ—ভূপেন কারণটা ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করে না। এমন কি চিঠির এই শুষ্কতায় ব্যথা পাইলেও মনে মনে ধন্যবাদ দেয় ঈশ্বরকে—তাহার কণ্টকমুকুট অকারণে ভারী ও অসহ করিয়া না তুলিবার জন্য। সেও চিঠি দেয়—শুষ্ক, সংক্ষিপ্ত; দুই-একটি গতানুগতিক কথা ছাড়া আর কিছু থাকে না তাহাতে। কাজের চাপে পড়িয়া হউক, ইচ্ছা করিয়া হউক—এই ভাবে তাহারা যদি পরস্পরকে ভুলিতে পারে—তাহা হইলে দুইজনেরই মঙ্গল।

কিন্তু ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে একটা ব্যাপারে তাহাকে সন্ধ্যার কথা মনে করিতেই হইল। হঠাৎ একদিন বিজয়বাবু স্কুলে আসিলেন না—ছেলে বলিল, বাবার শরীর খারাপ করেছে; শুয়ে আছেন। ইদানীং—কলিকাতা হইতে ফিরিবার পর—সে বিজয়বাবুদের বাড়ি যাওয়াটা কমাইয়া দিয়াছিল, গেলেও কোচিং ক্লাসের অজুহাতে সকাল করিয়া উঠিয়া পড়িত। তাহার কারণ প্রথমত কলিকাতাতে যাইবার দিনের বিদায় দৃশ্যটি তাহার মনে ছিল, তারপর এখানে ফিরিয়াও বোধ হয় সেই কারণেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল যে, সে আসিলে কল্যাণী খুশী হয়, তাহার মুখ হইয়া ওঠে উজ্জ্বল এবং উঠিয়া আসিবার সময় একটু ধরিয়া রাখিবার আগ্রহটা তাহারই সবচেয়ে বেশী। পাছে আর একটা ভুল হয়—সেই জন্য এবারে সে প্রথম হইতেই সতর্ক হইয়াছিল, আসা-যাওয়ার সংখ্যা ও সময়, দুই-ই ক্রমশ কমাইয়া আনিতেছিল। তবুও—অসুখের কথা শুনিবার পরও না গিয়া থাকা যায় না, সে ছুটির পর আর বোর্ডিং-এ না ফিরিয়া সোজা বিজয়বাবুর বাড়ির পথই ধরিল।

অবশ্য এটা শুধু খবর লইতে যাওয়া—কতকটা কর্তব্য পালনের জন্যই, অসুখ যে গুরুতর কিছু হইতে পারে একথা তাহার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না, তাই বাড়ির বাহিরে পথের উপরেই কল্যাণীকে শুষ্ক বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল, ঈষৎ শঙ্কিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি কল্যাণী, কী অসুখ বিজয়বাবুর?

কল্যাণী খুব সম্ভব তাহার আশাতেই উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, তবু উত্তর দিতে গিয়া তাহার ওষ্ঠই নড়িল শুধু—কণ্ঠ ভেদিয়া স্বর বাহির হইল না। দুই-একবার কথা কহিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপেন আরও ভয় পাইয়া গেল, কিন্তু সেখানে আর মিছামিছি সময় নষ্ট না করিয়া তাড়াতাড়ি কল্যাণীকে পাশ কাটাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। বিজয়বাবু দাওয়াতে পাতা চৌকিটার উপর পড়িয়া আছেন অন্য দিনের মতই—মুখের ভাব তেমনি প্রশান্ত, তেমনি নিরুদ্বিগ্ন। ভূপেন তাঁহাকে ঐ ভাবে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তবু একটু আশ্বস্ত হইল, কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি বিজয়বাবু, জ্বর?

বিজয়বাবু কেমন যেন শূন্যদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া একটু হাসিলেন। কহিলেন, জ্বর হলে ত বাঁচতুম ভাই। কাল ইস্কুল থেকে ফিরে রাত্রে হ্যারিকেনের

আলোতে বই পড়তে গেছি—সেই তোমার বইখানা—কেমন যেন ঝাপ্সা লাগল। বিরক্ত হয়ে আলোটার দিকে চাইতে গিয়ে দেখি আলোটার চারপাশে রামধনু। তখনই ভয় হ'ল, বই বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লুম। তবু তখনও ছেলে-মেয়েদের কিছু বলি নি। আজ সকালে উঠে মনে হল তখনও যেন রাত রয়েছে, এমনি সব অন্ধকার। খুব ঝাপ্সা ঝাপ্সা লাগছিল সব, কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করলুম—সে অবাক হয়ে বললে, সে কি বাবা, রোদ উঠেছে যে !···বুঝলুম ব্যাপারটা—শুয়েই রইলুম। কিন্তু এবেলা ঘুমিয়ে উঠে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, সব অন্ধকার।

ভূপেন কথাটা শুনিয়া যেন পাথর হইয়া গেল। এ যে বেরিবেরির লক্ষণ। সে কহিল, কিন্ত দাদা, এ যা বললেন এ ত প্লোকুমা—আপনি কি বেরিবেরি একটুও টের পান নি এতদিন ?

বিজয়বাবু বলিলেন, না। ইদানীং দু-একদিন মনে হচ্ছিল বটে যে ইস্কুল থেকে এতটা হেঁটে আসতে যেন বড্ড বেশী হাঁপিয়ে পড়ছি। একটু বুক ধড়ফড়ও করত—তবে সেটা বয়সের ধর্ম বলেই মনে করেছিলুম।

ইঁহাদের অবস্থা ভূপেন জানিত। সংস্থান কিছুমাত্র নাই—জমিজমাও না থাকিবার মধ্যে। মাহিনার টাকা কয়টি না পাইলে সব কটি প্রাণীকে উপবাস করিতে হইবে। ভগবানের এ কি মার !

এবার কথা কহিতে গিয়া তাহার গলা কাঁপিয়া গেল। সে প্রশ্ন করিল, আপনার নিকট-আত্মীয় কি কেউ কোথাও নেই ?

শান্তকণ্ঠেই বিজয়বাবু জবাব দিলেন, না ভাই। আর থাকা সম্ভবও ত নয়—আমরা কখনও কারুর কোন উপকারে আসতে পারি নি, আত্মীয়তা থাকবে কি করে বলো।

কল্যাণী ভূপেনের মুখের উপর একাগ্র নির্ভয়ে চাহিয়া ছিল, যেন সে ইচ্ছা করিলেই একটা প্রতিকার করিতে পারে। সুতরাং বিপদ যে কত বেশী, এ রোগ সারিবার সম্ভাবনা যে কত কম সে কথা ভূপেন মুখে ত উচ্চারণ করিতে পারিলই না—ভাব-ভঙ্গীতেও কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ করিতে পারিল না। তাহা হইলে এই ছেলেমানুষের দল এখনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সে প্রাণপণ চেষ্টায় কণ্ঠস্বর সহজ করিয়া কহিল, তুমি একটু বসো কল্যাণী, আমি এখনই আসছি।

গেল সে গ্রামের ডাক্তারের কাছে। তিনিও বিজয়বাবুকে শ্রদ্ধা করিতেন। সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু একটু পরীক্ষা করিয়াই তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। ভূপেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, এত সিরিয়াস্ টাইপের প্লোকুমা আমি দেখিনি, এক রাত্রের মধ্যে অন্ধ হয়ে গেল, আশ্চর্য ! যাই হোক—এখনও উপায় থাকতে পারে হয়ত—কিন্তু সে এখানে কিছুই হবে না, কারণ, আমরা এর কিছু জানি না। কলকাতায় কোন বড় চোখের ডাক্তারের কাছে এখনই যদি নিয়ে গিয়ে ফেলা যায়, হয়ত কিছুটা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারেন। তবু সে আশাও আমি বেশী রাখতে বলি না। দেখুন না, এত বড় রোগ—বছর বছর এতগুলো লোক মরছে, হাজার হাজার লোক ভুগছে, তবু

আজ পর্যন্ত কোন ওষুধ বেরোল না। কোন্ রোগের ওষুধ বেরিয়েছে বলুন—বেরিবেরি, প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড—কোনটারই ঠিক ওষুধ বলতে যা বোঝায়, তা নেই। এ যদি ওদের দেশ হ'ত ত ওদের চিকিৎসকরা বা বৈজ্ঞানিকরা যেমন ক'রে হোক ঐ সব রোগের ওষুধ বার ক'রে ফেলত। একেবারে যে হয় না তা বলছি না, কিন্তু আমাদের দেশের তুলনায় কিছুই নয়। আরে মশাই, রিসার্চ করা তো চুলোয় যাক, আমাদের দেশের ছেলেরা একবার ডিগ্রিটা নিয়ে বেরোবার পর আর কোন বই-ই পড়ে না। অথচ রোজ কত ওষুধ ওদের দেশে বেরোচ্ছে, কত নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, তার সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে কি চিকিৎসা করবে বলুন দেখি? শুধু মামুলী কতকগুলো মিক্সচার আর ইন্‌জেকশান—তাতে কি হয়।...আমরা না হয় গরীব পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার, বই কেনার পয়সা নেই, যাদের আছে তারাও ত পড়তে চায় না—

এমনি আরও খানিকটা বক্তৃতা করার পর ডাক্তার বিদায় লইলেন কিন্তু ভূপেনের সেদিকে কান ছিল না। সে নিজেই যেন ইহাদের কথা ভাবিয়া চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। বিজয়বাবুকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল স্ত্রীর গহনা বলিতে কোথাও কিছু নাই, যা আছে ঐ দু-গাছা পেটি কল্যাণীর হাতে, উহাতে বোধ হয় আধ-ভরি সোনাও নাই। আর সবসুদ্ধ, মাকড়ী প্রভৃতি দুই-একটা কুঁচা জিনিস জড়াইয়া, বড় জোর আনা-পাঁচ-ছয় সোনা মিলিতে পারে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা হইতেও দুটা বড় রকমের ঋণ লওয়া আছে, সেখানেও আর ধার পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। নিঃস্বতার এরূপ ভয়াবহ চেহারা ইতিপূর্বে আর ভূপেন দেখে নাই—সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

অথচ উপায়ও একটা না করিলে নয়। যত দিন যাইবে ততই রোগটা চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া যাইবে—তা সে জানে, কিন্তু কী-ই বা করা যায়। ইস্কুল হইতে বসাইয়া মাহিনা দিবে না, বড় জোর মাস-দুই-এর ছুটি মিলিতে পারে। তারপর? প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাতে, সে হিসাব করিয়া দেখিল, ইহাদের মাস-আষ্টেক চলিবে। তারপর সোজাসুজি উপবাস শুরু হইবে, আর কোথাও কিছু নাই। বড়ছেলে এখনও ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাস করে নাই, তাহার দ্বারাই বা কি উপার্জন হইতে পারে? এসব ক্ষেত্রে তাহাদের কলিকাতার ইস্কুলে সে দেখিয়াছে, ছেলেরা ও শিক্ষকরা কিছু কিছু চাঁদা তুলিয়া দেন। সে অবশ্য বেশী কিছু নয়—তবু একশ দেড়শ টাকা সেখানে অনায়াসে ওঠে, কিন্তু এখানে সে কথা মনে করাই বিড়ম্বনা। ছেলেরা এত গরীব যে, সেখানে চাঁদার খাতা ধরিতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়—আর শিক্ষকদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল। অপূর্ববাবু বুঝি গত মাসে গোটাপাঁচেক টাকা ধার দিয়াছিলেন বিজয়বাবুকে, এখন কি করিয়া সে টাকাটা চাওয়া যায়, এই ভাবনাতে তাঁহার ঘুম হইতেছে না।

ভূপেন সেদিন রাত্রে ঘুমাইতে পারিল না। ভবিষ্যতের কথা পরে হইবে,এখন চিকিৎসার প্রয়োজন। সে আত্মীয়ও নয়, এত অল্প দিনে বন্ধুত্বের দাবিও করিতে পারে না—তবু দায়িত্ব যেন সব তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মোহিতবাবু বলিতেন, 'যে পাশ কাটাতে পারে তার কোন দায়িত্বই নেই—বিবেচনা যার আছে,

দায়িত্ব বলো কর্তব্য বলো সবই তার।' সত্যই—ইঁহারা ত খবরটা শুনিয়া বেশ নিশ্চিন্তই আছেন—ভবদেববাবু মালাটা শুধু একটু দ্রুত ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'রাধারাণী। সবই তোমার ইচ্ছা প্রেমময়ী!' কিন্তু সে অত সহজে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে কৈ? বিজয়বাবু অবশ্য কিছুই আশা করেন না; তবু সে যে তাঁহার সস্নেহ ব্যবহার, স্নিগ্ধ সহানুভূতির কথাটা ভুলিতে পারিতেছে না। কল্যাণী ইতিমধ্যেই কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিয়াছে। কী বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে, ভাবিয়া যেন কূলকিনারা পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়েগুলি সকলে তাহারই মুখ চাহিয়া আছে—অথচ আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও, কোথাও কোন পথ সে খুঁজিয়া পাইল না।

সারা রাত এ-পাশ ও-পাশ করার পব, ভোরের দিকে একটা কথা ভূপেনের মনে পড়িয়া গেল। মোহিতবাবুর এক বন্ধু আছেন খুব বড় চোখের ডাক্তার, খুবই অন্তরঙ্গ তাঁহার সংগে, এমন কি দুই বন্ধুর পরিবারের মধ্যে যাতায়াত আছে; যদি, সে সাহায্যটা পাওয়া যায়, তবে সে-ও অনেকটা হইবে বৈকি। এমনি কলিকাতা যাতায়াতে, ডাক্তার খরচাতে একশ টাকার ধাক্কা, তাহার উপর ঔষধপত্র ত আছেই।...যাঁহার এক পয়সাও সংস্থান নাই তাঁহার পক্ষে এ প্রস্তাব দুরাশাই। ভূপেনের হাতে উহার অর্ধেক টাকাও নাই। সুতরাং—যতই কথাটা সে ভাবিতে লাগিল ততই মনটা এই সুবিধা লওয়ার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। মোহিতবাবুদের কাছে কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করার কথা দুদিন আগে সে ভাবিতেও পারিত না—কিন্তু এখন অতটা অভিমান আর নাই, বিশেষ করিয়া এ অনুগ্রহ ত সে নিজের জন্য লইতেছে না, পরের জন্য ভিক্ষা করাও লজ্জাকর নয়।

তবু সে সকালে উঠিয়াও অনেকটা ইতস্তত করিল। কিন্তু যেখানে একদিকে অর্থহীন সূক্ষ্ম আত্মসম্মান-বোধ আর একদিকে প্রয়োজন—এই দুইয়ে দ্বন্দ্ব বাধে, সেখানে শেষ পর্যন্ত প্রযোজনেরই জয় হয়। সে অবিলম্বে উহাদের একখানা চিঠি লেখাই স্থির করিল। তবে সমস্যা এই যে কাহাকে লিখিবে? হিসাবমত মোহিতবাবুকেই লেখা উচিত কিন্তু কোথায় যেন একটা সংকোচে বাধে। মনের অবচেতন অবস্থায় এটি কখন স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, সন্ধ্যার উপর তাহার একটা জোর আছেই—তাহার কাছে সংকোচের কারণ অপেক্ষাকৃত কম। পরিষ্কার এ কথাটা না ভাবিলেও সন্ধ্যাকে চিঠি লেখাটাই সহজ বলিয়া মনে হইল। সে সব কথা জানাইয়া তাহাকে একখানা দীর্ঘ চিঠি দিল এবং সকালেই নিজে হাতে ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

সেদিন প্রায় সব মাস্টারমহাশয়ই ছুটির পর বিজয়বাবুকে দেখিতে গেলেন। অনেক ছাত্রও গেল। নির্বিরোধ ভগবদ্ভক্ত মানুষটিকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতেন—ছেলেরা তাঁহার মিষ্ট স্বভাবের জন্য ভালবাসিত; সুতরাং সকলেরই যে অল্প-বিস্তর আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু কী-ই বা করিবার আছে? কেহ উপদেশ দিলেন, কেহ পূর্বেই সাবধান না হইবার জন্য অনুযোগ করিলেন—কেহ বা আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিলেন। পথ যে কোথাও নাই তা

সকলেই জানেন ; এ ভগবানের মার—এ মারের ভাগ নেওয়াও সম্ভব নয়, তাই সব কথাই ফাঁকা শোনাইল। এই সমস্ত সহানুভূতির মধ্যে বিজয়বাবু তেমনই শান্ত নম্রভাবে বসিয়া রহিলেন, যেমন চিরকাল থাকিতেন। হা-হুতাশ করিলেন না, ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন না, ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনিলেন না। তাঁহার সেই অদ্ভুত ধৈর্য ও মনের উপর জোর দেখিয়া ভূপেনের মন শ্রদ্ধায় নত না হইয়া পারিল না।

কিন্তু বিজয়বাবু স্থির থাকিলেও তাহার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। এই অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্যেও বার বার কল্যাণীর ব্যথিত ব্যাকুল চক্ষু দুইটি তাহার দৃষ্টির মধ্যে আশ্বাস খুঁজিতেছিল। সব আশা-ভরসা যেন সে-ই, যা হয় একটা উপায় সে করিতে পারিবেই—সে দৃষ্টির মধ্যে এই নির্ভরতাটুকুও বোধ হয় ছিল। সেদিকে যতবার চোখ পড়িতেছিল, ততবারই তাহার দায়িত্বের গুরুত্বটা উপলব্ধি করিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। আশা যে কম তা সে-ও বোঝে কিন্তু সত্যসত্যই যেদিন এই কথাটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে, আশা একেবারেই নাই, সেদিন কি করিয়া ইহাদের দিকে চাহিবে, কি সান্ত্বনা দিবে, তাহা যেন সে কল্পনাও করিতে পারিতেছিল না। মনে মনে প্রশ্নটাকে সে যতই এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছিল, ততই যেন ক্ষতস্থানে হাত পড়ার মত বার বার মন সেইখানেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতেছিল।

এমনি মানসিক কণ্টকশয্যার মধ্যে পরের দিনটাও কাটিল। সেদিন উত্তর আসিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা সে জানে। তবু মনে মনে কোথায় একটা আশা ছিল, সন্ধ্যার পক্ষে সবই সম্ভব, হয়ত অপ্রত্যাশিতভাবে সেই দিনই উত্তরটা আসিয়া যাইবে, হয়ত টেলিগ্রামই আসিবে। যদি জবাব না আসে, যদি সন্ধ্যা উপেক্ষা করে—এমন ভয় একবার যে মনে উঁকি মারে নাই তাহা নয় ; তবে সে আশংকা এক মুহূর্তের বেশী মনে দাঁড়ায় নাই। বরং সন্ধ্যার পর বিজয়বাবুর বাড়ি হইতে ফিরিবার সময় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আশাটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—বিজয়বাবুর একটা সুব্যবস্থা হইবে এজন্য ত বটেই, সন্ধ্যার চিঠি আসিবে এজন্যও কতকটা। সন্ধ্যার চিঠি আসিবে এবং সেই চিঠি প্রমাণ করিয়া দিবে যে ভূপেন বৃথা তাহার উপর আস্থা স্থাপন করে নাই—সন্ধ্যার উপর তাহার দাবি আছে, জোর আছে। যতই দূরে থাক তাহাদের আত্মার সম্বন্ধ একটুকু ক্ষুন্ন হয় নাই।

মানুষ অনেক জিনিস অসম্ভব জানিয়াও আশা করে এবং আশা করিতে করিতেও মনের কাছে স্বীকার করে যে ইহা অসম্ভব, ইহা যদি না ঘটে তবে নিরুৎসাহ হইবার, ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। এমনি একটা মানসিক অবস্থা লইয়া বোর্ডিং-এ ফিরিতেই প্রথম তাহার নজরে পড়িল তাহাদের ঘরে, তাহারই বিছানার উপর বসিয়া আছেন সন্ধ্যাদের সরকারমশাই।

এ ঘটনা শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, সমস্ত রকম অসম্ভব কল্পনারও অতীত। বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত ভূপেনের মুখে কথা সরিল না। একটা ভয়ও মনে উঁকি মারিতেছিল, তবে কি মোহিতবাবুই—। সে অতি কষ্টে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি

সরকার মশাই ?

সরকার প্রাণগোবিন্দবাবু পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া ভূপেনের হাতে দিয়া কহিলেন, দিদিভাই দিয়েছে। কাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে তাই আমাকেই পাঠালে, বললে বন্দোবস্ত করে নিয়ে আসুন। হুকুম একবার যা মুখ দিয়ে বেরোবে তা আর 'না' হবে না—সে ত জানেনই।

তারপর যতীনবাবুর দিকে ফিরিয়া বোধ হয় পূর্ব কথারই জের টানিয়া কহিলেন, ঐ যা বলছিলুম আপনাকে। যেমন কর্তা তেমনি আমার দিদিভাই—আপনাদের ভূপেনবাবুর ওপর যেমন বিশ্বাস তেমনি ভক্তি। এই ত কর্তা উইল করে দিয়েছেন শুনছি—সব আমার দিদিভাইয়ের, কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের হুকুম ছাড়া কিছু খরচ হবে না। তাকেও চলতে হবে এঁর হুকুমে।···কেন যে উনি এমন জায়গায় পড়ে আছেন, তা উনিই জানেন—ওঁর ভাবনা কি, উনি যা বলতেন, কর্তাবাবু সেই ব্যবস্থাই ক'রে দিতেন। ব্যবসা, চাকরি, ওকালতি কিছুরই ভাবনা ছিল না।

বিস্মিত যতীনবাবু বলিয়া উঠিলেন, বলেন কি ? সত্যিই পাগল নাকি আপনি মশাই।

কিন্তু ভূপেনের এসব দিকে কান ছিল না। সে আলোটার সামনে চিঠিখানা মেলিয়া ধরিয়া পড়িতেছিল। সন্ধ্যা লিখিয়াছে ঃ

শ্রীচরণেষু,

মাস্টারমশাই! আপনার চিঠি পেয়ে যেন একটা বোঝা নেমে গেল বুক থেকে। কিছুদিন থেকে কেবলই একটা ভয় পেয়ে বসেছিল যে, বুঝি আমরা চিরকালের মত পর হয়ে গেলাম আপনার কাছে। হয়ত কর্তব্য বা দায়িত্বের সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক থাকবে না আমাদের মধ্যে। সে যে কি দুঃখ আপনি বুঝবেন না। তাই হঠাৎ আপনার এই চিঠি পেয়ে এত আনন্দ হচ্ছে। আজও যে আমার উপর এটুকু আস্থা, এটুকু বিশ্বাস আছে—এ কথাটা নতুন ক'রে জানলুম। আপনার কোন কাজে লাগার চেয়ে অন্য সার্থকতার কথা ভাবতেই পারি না মাস্টারমশাই। এ কাজ আপনার নয়—তবু হুকুম ত আপনার মুখে থেকেই এল—এইতেই আমি সুখী।

যাক,—এবার কাজের কথা। দাদুকে সব কথা বলেছি, ডাক্তার-দাদুকেও ফোন ক'রে বলে রেখেছি। এখন শুধু ওঁকে নিয়ে আসা। আপনার পক্ষে আসার সুবিধা হবে কিনা জানি না, চিঠি পাঠাতেও অনর্থক দেরি হয়ে যাবে, এই সব পাঁচ-সাত ভেবে আমি সরকার মশাইকে পাঠালুম। তিনি বিজয়বাবুকে কাল সকালেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন—আমি ডাক্তার-দাদুকেও কাল বিকালে আসতে বলেছি। এসব ব্যাপারে দেরি না করাই ভাল। দাদু একটু ভাল আছেন। আপনি তাঁর আশীর্বাদ ও আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—

চিঠি পড়িতে পড়িতে আজও ভূপেনের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল। সেই সন্ধ্যা, তাহার ছাত্রী, তাহার বন্ধু—তাহার আত্মার অংশ।···আজও তাহা হইলে তাহাদের অন্তরের সুর কাটে নাই। এত দিনের অদর্শন, এত মান-অভিমানের

ঘাত-প্রতিঘাতেও পরিচিত তন্ত্রীটি ঠিক বাজিয়া উঠিয়াছে।

ভূপেন চিঠিখানা আর একবার পড়িল। কতদিনের কত স্মৃতি এই কয়টি ছত্রের মধ্য দিয়া যেন ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেটা সে ভুলিতেই বসিয়াছিল, সন্ধ্যার অন্তরের সেই প্রীতি, সেই শ্রদ্ধা তাহা হইলে ঠিক তেমনই আছে—কিছুই খোয়া যায় নাই…

আরও কতক্ষণ সে চিঠিখানা পড়িত কে জানে, সরকারমশাইয়ের আহ্বানে সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল, মাস্টারমশাই ?

—ও, হ্যাঁ!

ভূপেন সোজা হইয়া দাঁড়াইল। কাল সকাল আটটায় গাড়ি। আজ রাত্রেই বিজয়বাবুর বাড়ি গিয়া যাত্রার ব্যবস্থা করা দরকার। কর্তব্য আগে—সামান্য চিঠি লইয়া নষ্ট করিবার মত সময় কৈ ?…সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বিজয় বাবুর বাড়ির পথ ধরিল।

॥ ১৫ ॥

বিজয়বাবুকে পরের দিন সকালেই রওনা করিয়া দেওয়া হইল। প্রথমটা তিনি খুবই সংকোচ বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যার আগ্রহের এই নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়া এবং ভূপেনের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজী হইলেন। কল্যাণীও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে ; অন্ধ পিতাকে একেবারে পরের ভরসায় ছাড়িতে চাহিল না, ভূপেনও জেদ করে নাই। সত্যই, বিজয়বাবু যে প্রকৃতির লোক, শত অসুবিধা হইলেও কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিবেন না। তার চেয়ে কল্যাণী সঙ্গে থাকাই ভাল, তাহাকে আর বলিয়া দিতে হয় না, পিতার সামান্যতম সুবিধা-অসুবিধাও সে বোঝে। ছেলেদের লইয়া এখানে একটা সমস্যা উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু কল্যাণীর পিসিমা আশ্বাস দিলেন, চোখে না দেখিলেও দুই-তিনটা দিন চালাইয়া লইতে পারিবেন। তা ছাড়া ডাক্তারবাবুর বিধবা শ্যালিকাও এই কয়টা দিন এখানে আসিয়া থাকিবেন—ডাক্তারবাবু নিজেই উপযাচক হইয়া এই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বড় ডাক্তারের কাছেই পাঠানো হইল বটে, তবু ফলাফল সম্বন্ধে ভূপেনের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল এবং যদি সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থই হয় ত কি উপায় হইবে, সে-অবস্থাটা সে কল্পনা পর্যন্ত করিতে পারিতেছিল না। এইভাবে আশংকায় পরি-পূর্ণ হইয়া যখন সে ইহাদের প্রত্যাবর্তনের প্রহর গণিতেছে সেই সময় অকস্মাৎ আর একটি দায়িত্ব তাহার উপর আসিয়া পড়িল। বিজয়বাবুর অসুখের জন্যে এ কয়টা দিন কোচিং ক্লাস না হইলেও সালেকের অসুখের খবরটা সে ক্লাসেই পাইয়া-ছিল। তাহার নাকি প্রবল জ্বর, সর্বাঙ্গে ব্যথা—খুব সম্ভব ইনফ্লুয়েঞ্জা। তবু কিছুতেই সময় করিয়া এ দুইটা দিন তাহার খবর লইতে যাওয়া হয় নাই, এজন্য ভূপেন মনে মনে লজ্জিতই ছিল। বিজয়বাবুদের ট্রেনে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে সেই কথাটাই মনে পড়িয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল যে, আজ স্কুলের ফেরত সোজা সালেকদের হোস্টেলেই ঢুকিবে।

কিন্তু স্কুলে পা দিতেই অপূর্ববাবু শুষ্ক মুখে বলিলেন, ও মশাই, শুনেছেন ?

কিছু পূর্বেই সকলে হোস্টেলে একসঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছে, অপূর্ববাবু কয়েক মিনিট আগে আসিয়াছেন এইমাত্র—ইহার মধ্যেই শুনিবার মত কি ঘটিল অনুমান করিতে না পারিয়া ভূপেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—না ত, কি হয়েছে ?

মুখটা বিকৃত করিয়া অপূর্ববাবু কহিলেন, সালেকের গায়ে নাকি মার অনুগ্রহের গুটি বেরিয়েছে !

—সে কি !

—আবার কি, ঐ ত আব্বাস বলছে।

আব্বাস ঐ হোস্টেলের দ্বিতীয় এবং শেষ অধিবাসী। তাহাকে জেরা করিয়া ভূপেন জানিল কথাটা সত্যই। সে বেচারা ছেলেমানুষ, রীতিমত ভয় পাইয়া গিয়াছে। কাল নাকি যন্ত্রণায় সালেক সারারাত চেঁচাইয়াছে, তখন আব্বাস ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সালেককে ভূতে পাইয়াছে এমনি একটা সন্দেহও হইয়াছিল তাহার ; তারপর আজ সকালেও সালেক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া কিছু দেখা যায় নাই, আব্বাসও খুব সম্ভব ভূতের ভয়েই তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করে নাই। এইমাত্র দেখিতে পাইয়াই সে ছুটিয়াছে।

সংবাদটাতে ভূপেনের ভয় ততটা হইল না, যতটা হইল এ দুদিন সংবাদ না লইবার জন্য অনুশোচনা। সে অপূর্ববাবুকে প্রশ্ন করিল, এখন কি করবেন তাহ'লে ?

—আমরা আর কি করব, হেডমাস্টার মশাই আসুন।

ভবদেববাবু সকালের দিকে প্রায় প্রত্যহই কিছু দেরি করিয়া আসেন। আহ্নিকপূজার চাপে সকালবেলা আর ঠিক অন্য মাস্টার মহাশয়দের সঙ্গে আহারে বসিতে পারেন না। এজন্য তিনি প্রথম ঘণ্টাটা নিজের খালি রাখিয়াই রুটিন করিয়াছেন। আজও ভবদেববাবু আসিলেন মিনিট পনেরো পরে। অপূর্ববাবুর মুখে সব বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, তাই ত, রাধারাণীর আবার এ কি লীলা। জয় রাধে।

ভূপেন একটু অসহিষ্ণুভাবে জবাব দিল, কিন্তু রাধারাণী ত আর এখানে হেডমাস্টারী করেন না—এখানে দায়িত্ব আপনারই, একটা কিছু করুন !

ভবদেববাবু একটু অসহায়ভাবেই অপূর্ববাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। অপূর্ববাবু কহিলেন, আব্বাসকে ত বাড়ি পাঠাতেই হবে—এ সব কেস অবিলম্বে সিগ্রিগেট করা দরকার। ওকেই বলুন যাবার সময় সালেকের বাড়ি খবর দিতে, ওর বাপ এসে নিয়ে যাক—

এই সহজ ব্যবস্থায় ভবদেববাবু খুশী হইয়া উঠিলেন। ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু কি ক'রে যাবে পক্স-এর কেস ?

—কেন, গো-গাড়ি করে নিয়ে যাবে।

—গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান নিয়ে যেতে রাজী হবে ?

—ওরা যেখান থেকে হোক গাড়ি নিয়ে আসবে। তাছাড়া অমেরা আর কি করব বলুন।

ব্যাপার যত সহজে ইঁহারা মিটাইয়া দিলেন তত সহজে কিন্তু মিটিল না। আব্বাস বিকালের দিকে আসিয়া খবর দিল সালেকের বাবা ও মা দুইজনেই ঘুটিয়ারী সরিফে বড় পীরের দরগায় বহুদিনের মানসিক পূজো দিতে কলিকাতায় গিয়াছেন, সেখান হইতে হুগলীতে কোথায় কুটুম্ববাড়ি দুই-একদিন কাটাইয়া দেশে ফিরিবেন। আর যাহারা বাড়ি আছে তাহারা কোন দায়িত্ব লইতে রাজী নয়।

এবার অপূর্ববাবুর মুখও অন্ধকার হইয়া উঠিল। সরকারী হাসপাতাল সেই সদরে, এখান হইতে ট্রেনে করিয়া লইয়া যাইতে হয়, নযত, গো-গাড়িতে আটাশ মাইল।

কি করা যায়—এই লইয়া যখন সকলে গবেষণা করিতেছেন তখন ভূপেনেরই একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—এ কথা আগেই মনে আসা উচিত ছিল, নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিল বলিয়াই এত বড় ভুল হইয়াছে। সে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ওর খাওয়া-দাওয়ার কি হচ্ছে?

সকলে আব্বাসের মুখের দিকে চাহিল। সে মাথা চুলকাইয়া জবাব দিল, কদিন ত বার্লি আর মুড়িটুড়ি খাচ্ছিল! আজ—

—আজ কি?

—আজ সকালেও বার্লি নিয়ে গিয়ে রেখেছিলুম বটে, কিন্তু সে ওকে দিয়ে আসা হয় নি। খাবার জলও—

—তার মানে কি? ভূপেন প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল, ঐ সাংঘাতিক রুগী বিনা পথ্যে, বিনা জলে একা পড়ে আছে সমস্ত দিন? আর এই নতুন তাতের সময়!

ভবদেববাবু অপ্রতিভ হইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন, তাই ত। অপূর্ববাবু, এটা আপনাদের দেখা উচিত ছিল।

অপূর্ববাবু আব্বাসকে ধমক দিয়া উঠিলেন। যেন সব দোষ তাহারই। ভূপেন একটু বিদ্রূপের সুরে কহিল, আপনারা বয়স্ক লোক তাই ভয়ে মরে যাচ্ছেন—ও ত ছেলেমানুষ, ওর অপরাধ কি? আচ্ছা, কিছু করতে হবে না, আমিই যাচ্ছি। আব্বাস তুই বাড়ি চলে যা, যতদিন না ও ভাল হয় আমি ও হোস্টেলেই থাকব।

এই বলিয়া সে আর বাদানুবাদের অবকাশ না রাখিয়াই দ্রুত হোস্টেলের পথ ধরিল। অপূর্ববাবু পিছন হইতে হাঁকিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনার টিকে নেওয়া আছে ত?

—তা ত আছেই—ভূপেন চলিতে চলিতেই ঘাড় ঘুরাইয়া উত্তর দিল—তা ছাড়া জ্বর হ'লেই সরকারী হাসপাতালে চলে যাবো। আপনাদের ভয় নেই।

অপূর্ববাবুর মুখ লাল হইয়া উঠিল, কহিলেন, শুনলেন মাস্টার মশাই কথাটা। ওর এই ধরনের ইম্‌পার্টিনেন্স অসহ্য হয়ে উঠেছে।…আমার ডিউটি জিজ্ঞেস করা তাই—

কাছেই পণ্ডিতমশাই দাঁড়াইয়া ছিলেন, কহিলেন, ভায়ার আমার ডিউটিজ্ঞানে

এতটুকু ত্রুটি নেই। তবে কি জানো ভাই, ওদের ওটা কাঁচা বয়সের গরম—

ভবদেববাবু একটু ছোটখাটো দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, রাধে! রাধে!

সালেকদের হোস্টেলে ঢুকিয়া ভূপেন দেখিল তাহার অনুমানই ঠিক। বেচারা জ্বরে ও যন্ত্রণায় প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, পিপাসায় জিভ এত শুকাইয়া উঠিয়াছে যে, কথা কওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রথমেই খানিকটা জল খাওয়াইয়া বার্লি'টা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ভালই আছে। কিন্তু শুধু বার্লি—না চিনি, না নুন, লেবু ত কল্পনারও অতীত! অগত্যা সে নিজেদের হোস্টেলে গিয়া রান্না-ঘরের বাহির হইতেই একটু চিনি চাহিয়া লইল এবং চাকরকে দুইটা টাকা দিয়া স্টেশনে পাঠাইল, যদি পাতিলেবু ও কমলা বা অন্য কোন ফল পায়।

তারপর সালেককে বার্লি খাওয়াইয়া সে ছুটিল ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তারবাবু সব শুনিয়া একটু হাসিলেন। কহিলেন, এসব রোগে এখানে কেউ ডাক্তার ডাকে না, বিশেষ ক'রে মুসলমানরা ত নয়ই। যা করে ঐ শেতলার বামুন।···তা ওকে যে মাস্টারমশাইরা—এখনও হোস্টেলে রেখেছেন?

—ইচ্ছে ক'রে রাখেন নি—দায়ে পড়ে রেখেছেন।

ভূপেন সে কাহিনীটাও খুলিয়া বলিল। ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, পান না আসল বসন্ত—চেনা যাচ্ছে? না, এখন বোঝা সম্ভব নয়?

ভূপেন মাথা নাড়িয়া কহিল, না—**It's too early.**

—তবে কালই আমি যাবো। আজ এই ওষুধটা নিয়ে যান।

তিনি একটা ঔষধ নিজেই তৈয়ারী করিয়া দিলেন। আহার্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আবারও বলিয়া দিলেন, কাল আমি দুপুর নাগাদ যাবো—বুঝলেন! ও ত তাড়াতাড়ি কিছু করবার নেই।

সেখান হইতে হোস্টেলে ফিরিয়া সালেককে ঔষধ খাওয়াইতে গেলে প্রথমটা সে রীতিমত আপত্তি করিল। এ-সব রোগ ডাক্তারী ঔষধ খাইলে নাকি ভীষণ বাড়িয়া যায়—এই তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা মুসলমান বটে, তবু এসব রোগে শীতলার বামুনকেই তাহারা বরাবর ডাকে। অনেক বুঝাইয়া মৃদু ধমক দিয়া ভূপেন শেষ পর্যন্ত তাহাকে ঔষধ খাওয়াইল বটে, কিন্তু ভয়টা যে তাহার তবু কাটিল না—সেটা বেশ বুঝিতে পারিল। এই প্রসঙ্গে সালেক তাহার বোনের মৃত্যুর কাহিনীটাও শুনাইয়া দিল। মাত্র বৎসব কতক আগে তাহার এক বোনের হাম হইয়াছিল। খুব বাড়াবাড়ি দেখিয়া মা নিজে গিয়াছিলেন গ্রামান্তরের এক বসন্ত চিকিৎসকের বাড়ি। তিনিও শীতলার পূজারী, এই হিসাবে চিকিৎসক। তিনি বিধান দিলেন, সওয়া ছয়গণ্ডা লঙ্কা বাটিয়া চুনের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিতে হইবে। বাড়ি ফিরিয়া প্রলেপ দিবার সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করিয়া মেয়েটা মারা গেল—বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যে।

এসব কাহিনী শোনে আর ভূপেন শিহরিয়া ওঠে। অশিক্ষা ও কুসংস্কার দেশের মর্মমূলে বাসা বাঁধিয়াছে। দুঃখ করিয়া কোন লাভ নাই। আটশত বছরের

পরাধীনতার ফল এই অবস্থা, ইহার চেয়ে খারাপ হয় নাই বলিয়াই বরং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। মাঝে মাঝে নেতাদের মধ্যে যখন এ বিষয়ে মতবিরোধ হয় তখন তাহারও ঐ প্রশ্নটা মনে জাগে। কোন্‌টা আগে—নিজেদের সংস্কার আগে, পরে স্বাধীনতা—না স্বাধীনতা আগে, পরে সংস্কার? মনে হয় শেষেরটাই বোধ হয় সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি।···

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। ভূপেনের হাতে কাজ নাই—বইও নাই। সে ইতিমধ্যে সালেকের বিছানাটা পাল্‌টাইয়া দিয়াছে। ময়লা বিছানাগুলি কাল এখানেই সাবানজলে সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া দিতে হইবে। চাকরদের উপর চাপানো যাইবে না—তাহাদের যে ভয়, এসব ফরমাশ করিলে হয়ত কাজ ছাড়িয়াই পলায়ন করিবে। নিজে আব্বাসের বিছানাটাই চলনসই করিয়া লইয়াছে, নিজের বিছানা আনিয়া আবার হাঙ্গামা করিতে ইচ্ছা হয় নাই। আব্বাসের শয্যার মলিনতায় ও দৈন্যে প্রথমটা সংকোচ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু জোর করিয়া সে মনকে শাসন করিল।

বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সালেক প্রশ্ন করিল, আপনি কখন ফিরবেন মাস্টারমশাই? (আগে সে মাস্টার সাহেব বলিত—ভূপেনই বলিয়া সেটা বদলাইয়াছে।)

আব্বাস নাই, একা থাকিতে হইবে জনমানবহীন পুরীতে, সেই প্রশ্নটাই তাহার মনকে তখন হইতে পীড়া দিতেছে। ভূপেন সেটা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় নেই, আমি তোমার কাছে থাকব রাত্রে।

—রাত্রেও থাকবেন আপনি?

বিস্ময়ে কৃতজ্ঞতায় সালেকের চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

—হাঁ—যত দিন না তুমি সেরে ওঠ, আমি তোমার কাছেই থাকব সালেক। কিন্তু এরা এখনও তোমার বার্লি ফল দিয়ে যাচ্ছে না কেন। আলোতেও বেশী তেল নেই মনে হচ্ছে। তুমি একটু একা থাকতে পারবে? আমি একবার খোঁজ নিয়ে আসি।

সালেক কহিল, তা পারব, মাস্টারমশাই। তা ছাড়া আপনি দয়া না করলে ত সারা রাতই একা থাকতে হ'ত। আর কেউই আসত না—

হোস্টেলে গিয়া ভূপেন দেখিল, চাকরটি লেবু, ফল সবই আনিয়াছে, বার্লিও প্রস্তুত কিন্তু সে খবরটা পর্যন্ত কেহ দেয় নাই।

চাকরকে প্রশ্ন করিতে সে মাথা চুলকাইয়া কহিল, আজ্ঞে, ওখানে আমরা যেতে পারব না।

—আশ্চর্য। হ্যাঁ রে, তোদের কি অসুখ-বিসুখ করবে না কখনও? এত ভয় কেন?

চাকরও রুখিয়া উঠিল, মিছিমিছি শাপ-মন্যি দিও না বাবু। মুসলমানের অসুখে অত দায় আমরা নিতে পারব না। তাছাড়া পাল-বাবুও বারণ করেছেন —বলেন ছোঁয়াচ লেগে তোর অসুখ করলে, এখানে কাজকর্ম পণ্ড হবে।

পাল-বাবু অর্থাৎ অপূর্ববাবু। ভূপেন কথাটা বুঝিল। ভবদেববাবু বাহিরে

বসিয়াই মালা জপ করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিতেই তিনি কহিলেন, না না, মুসলমান বলে নয়। খাবারটা দিয়ে আসবে তাতে আর কি—তবে জানেন ওরা ভীষণ ভয় পায় এসব রোগকে। দরকার হ'লে আমাদের কাউকেই দিয়ে আসতে হবে—

— অত কিছু করতে হবে না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার ভাতটাও কি তা হ'লে ওখানে পাঠানো সম্ভব হবে না ?

—তা আর কি ক'রে হবে বলুন। সেই একই বাধা রয়েছে, বুঝলেন না ! তা ছাড়াও হোস্টেলে আবার এখানকার বাসন পাঠানোর একটা মুস্কিল আছে—

—আপনি ত বৈষ্ণব মাস্টারমশাই ? তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে ভূপেন প্রশ্ন করিল।

লজ্জিত হইয়া ভবদেববাবু বলিলেন, না, না, আমার কথা বলছি না। তবে পাঁচজনের পাঁচ রকম মত বোঝেন ত—

হ্যারিকেনে তেল ভরিয়া লইয়া ভূপেন ফিরিয়া গেল। ইহাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে কিংবা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতেও কেমন বিতৃষ্ণা বোধ হইল। মূল হইতে ডগা পর্যন্ত সমস্তটাই পচ ধরিয়াছে—কোন একটা অংশের চিকিৎসা করিতে যাওয়াই মূর্খতা।…

পরের দিন দুপুরে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া গেলেন। অধিকাংশই পান-বসন্ত, তবে দুই-একটি তাহার মধ্যে আসল বসন্তের গুটিও আছে। বিশেষ ভয়ের কোন কারণ নাই, এই আশ্বাস এবং আর একটি ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ভয়ের কোন কারণ না থাকিলেও ভূপেনকে দিন-রাত এই রোগীকে লইয়া বসিয়া থাকিতে হইল। একেবারে একা এই ছেলেমানুষকে ফেলিয়া এক পা-ও বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হইল না। ঔষধ-পথ্য-শুশ্রূষা সবই তাহার হাতে। কোন শিক্ষক একবার উঁকি পর্যন্ত মারেন না! শুধু সে যখন খাবার ঘণ্টা পড়িলে কিংবা সালেকের পথ্য লইতে হোস্টেলে যায় তখন ভবদেববাবু ও পণ্ডিত মহাশয় দুই-একটি প্রশ্ন করিয়া নিজেদের কর্তব্য সমাধান করেন।

সব চেয়ে যে ব্যাপারটায় ভূপেনের হাসি পাইল সেটা হইতেছে অপূর্ববাবুর কাণ্ড দেখিয়া। তিনি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—পাছে তাঁহাকে কর্তব্যের খাতিরে কোন খবরাখবর লইতে হয়, খুব সম্ভব সেই কারণেই, বিশেষ জরুরী কাজের অছিলায় বাড়ি চলিয়া গেলেন।

অবশ্য ইহার জন্য ভূপেনের কোন দুঃখ ছিল না। ঘৃণা বা ভয় তাহার যথেষ্ট ছিল, আগে হইলে সে-ও বোধ হয় এসব রোগের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষিত না—কিন্তু এই কয় বৎসর মোহিতবাবুর সঙ্গ তাহার চরিত্রে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে, সে-কথা সে যখন ভাবে তখন মনে মনে তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ না করিয়া পারে না।…

সব চেয়ে সে বিব্রত বোধ করে কল্যাণীর ছোট ছোট ভাইগুলির খবর লইতে না পারার জন্য। তিন দিন হইয়া গেল বিজয়বাবুরা গিয়াছেন—কোন চিঠি বা সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় নাই, খুব সম্ভব পরীক্ষা করিতেই দেরি হইতেছে।

কিন্তু এদিকে দেখা-শুনা করিবার যে দায়িত্ব সে লইয়াছিল, সেটা ঠিকমত করিতে না পারার জন্য লজ্জা ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। অবশ্য ডাক্তারবাবু খবর লন, তাঁহার একটি অল্পবয়সী বিধবা শালীও আছেন—এ ছাড়া সে যতীনবাবুকে রোজই একবার করিয়া খবর লইতে পাঠায়—একরূপে জোর করিয়াই পাঠাইতে হয় —তবু যতীনবাবু শেষ পর্যন্ত যান—অন্য কাহাকেও রাজী করানোই যায় না। অনেকেরই মনে মনে ভয় যে, যদি বিজয়বাবু একেবারে অন্ধই হইয়া যান ত এখন যাহারা বেশী খবরাখবর লইবেন—দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিবার ভারটাও তাঁহাদের উপরই আসিয়া পড়িবে। অত হাঙ্গামার প্রয়োজন কি?

অবশেষে পঞ্চম দিনের দিন বিজয়বাবুর বড় ছেলেটির মুখে খবর পাওয়া গেল, কল্যাণী চিঠি দিয়াছে সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে তাহারা আসিয়া পেঁছিবে। সে দিন সালেকও একটু সুস্থ ছিল, তাহার কাছে কথাটা পাড়িতেই, ঘরে আলো জ্বালা থাকিলে সন্ধ্যাটা সে স্বচ্ছন্দে একা থাকিতে পারিবে জানাইল। তখন ভূপেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া যতটা সম্ভব নিজেকে বীজাণুমুক্ত করিয়া বিজয়বাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

সে যখন পেঁছিল, বিজয়বাবু তাহার কিছু পূর্বেই আসিয়াছেন। আগেকার মতই শান্তভাবে বাহিরের চৌকিটাতে পড়িয়া ছিলেন, চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বোধ হয় ঔষধ লাগানো আছে। ভূপেনের পদশব্দে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এস ভায়া, ভূপেনবাবু না?

—হ্যাঁ দাদা, আমি। খবর কি?

ভূপেন রুদ্ধনিশ্বাসে প্রশ্ন করিল।

—বলছি ভাই, সালেকের খবর কি, ভাল আছে একটু? সব শুনলুম আমি স্টেশনে নেমেই ছেলের মুখে। তোমারই সার্থক জন্ম ভাই, বড় মানুষের উপকারে লাগলে। তা তাকে একা রেখে এলে যে—অসুবিধা হবে না?

—না দাদা, সে সুস্থ আছে একটু। কিন্তু আপনার খবর কি বলুন?

সহজ সংযত কণ্ঠেই বিজয়বাবু উত্তর দিলেন, ডাক্তার ত তিন দিন ধরেই পরীক্ষা করলেন, ওষুধ দিয়েছেন—ডায়েটও ঠিক করে দিয়েছেন। সন্ধ্যা-মাও ত আমার একগাদা ওষুধ কিনে সঙ্গে দিলেন, তবে আশা যে আর বিশেষ নেই তা ডাক্তারের কথাতেই বেশ বুঝতে পারা গেল।

এত নিশ্চিন্তভাবে তিনি কথাটা বলিলেন, যেন সেটা তাঁহার চরম দুর্ভাগ্যের কথা নয়—সাধারণ একটা সংবাদ মাত্র, তা-ও অপরের।

অনেকক্ষণ পরে ভূপেন যেন কণ্ঠস্বর খুঁজিয়া পাইল। প্রায় চুপি চুপি কহিল, বলেন কি দাদা? এত sudden—

—কি করবে ভাই—ভগবানের মার। প্রাণশক্তি নাকি একেবারেই ছিল না দেহে, তাই একটুও resist করতে পারে নি।

আরও খানিকটা দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর বিজয়বাবুই আবার কথা কহিলেন, মেয়েটা এসেই বোধ হয় ঘরের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়েছে—একটু

দেখগে ভাই, দুটো কথা বলোগে। ও বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েছে—

কল্যাণীর অবস্থা ভূপেন আগেই খানিকটা কল্পনা করিয়াছিল। এক্ষেত্রে তাহাকে কি বলিবে, কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে তা তাহার মাথাতেই আসিতেছিল না, তবু উঠিতেই হইল। কল্যাণী ঘরের মেঝেতে মাটির উপর মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার রোদনের কারণ ঠিক না বুঝিলেও ছোট দুটি ভাই পাশেতে শুষ্কমুখে বসিয়াছিল, এখন ভূপেনকে আসিতে দেখিয়া তাহারাও কাঁদিয়া ফেলিল। ভূপেন খানিকটা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পাশে মাটিতেই বসিয়া কল্যাণীর পিঠে একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, কল্যাণী।

কল্যাণী মুখ তুলিয়া প্রায় রুদ্ধ অথচ আর্তকণ্ঠে কহিল, শুনেছেন—বাবা আর কোন দিন বোধ হয় চোখে দেখতে পাবেন না—আর কোন দিন না।

ভূপেন তেমনিই কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। এ কথার কী-ই বা উত্তর দিবে। কল্যাণী মুহূর্তকয়েক যেন একটা কিছু সান্ত্বনার আশাতেই তাহার মুখের দিকে একান্ত আগ্রহে চাহিয়া রহিল, তার পর সেখানে কিছুমাত্র আশ্বাস খুঁজিয়া না পাইয়া তাহার পায়ের উপরেই মুখটা গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, কি হবে ভূপেনবাবু আমাদের? বাবাকে, এই ছোট ছোট ভাইগুলোকে কি ক'রে বাঁচাবো?

ভূপেনের চক্ষুও কান্নার ছোঁয়াচে সজল হইয়া উঠিয়াছিল, তবু সে জোর করিয়া কল্যাণীর মাথাটা কোলের উপর টানিয়া জবাব দিল, ভয় কি কল্যাণী, আমি —আমরা ত আছি।

॥ ১৬ ॥

সালেকের বাপ-মা দেশে পেঁছিয়া খবর পাইবাই ছুটিয়া আসিলেন। ততদিনে সালেকও একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ভূপেন কয়েকদিনের জন্য তাহাকে বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির করিল। কিন্তু বিপদ বাধিল সালেককে লইয়া— সে মাস্টারমশাইকে ছাড়িয়া বাপ-মায়ের কাছেও যাইতে চায় না। ভূপেন অনেক করিয়া বুঝাইয়া, ধমক দিয়া তবে রাজী করাইল। সে কিছু ফল এবং এক শিশি ঔষধ উহাদের সঙ্গে দিল এবং কোন মতে ঠাণ্ডা না লাগে বা পেটের গোলমাল হইতে পারে, এমন খাদ্য না দেওয়া হয়—সে সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করিয়া দিল।

সালেক গাড়িতে উঠিয়াও বহুক্ষণ তাহার হাতটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া রহিল, শেষে অসহিষ্ণু গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়িয়া দিতে ভূপেন যখন এক রকম জোর করিয়াই হাতটা টানিয়া লইয়া তখন তাহার হাতের অনেকখানিই সালেকের চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে। ইহারা কিশোর, ইহারা অল্পবয়সী—ইহাদের কৃতজ্ঞতা যতটা ভাবপ্রবণ ততটা স্থায়ী নয়, তবু ভূপেনের মনটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভারী হইয়া রহিল। এখানে আসিয়া বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছে সত্য কথা, কিন্তু এই ছেলেগুলির যে প্রীতি সে পাইয়াছে তাহার মূল্য কি কম?

তবু সালেককে বিদায় দিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। এই কয় দিন সে দেহে ও মনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর বিজয়বাবুর চিন্তা অহরহ তাহার মস্তিষ্ককে পীড়িত করিতেছে। সে কল্যাণীকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে, তাহারাও একান্ত নির্ভয়ে ভূপেনেরই মুখের দিকে চাহিয়া আছে—কিন্তু কি-ই বা সে করিতে পারে? স্কুল-কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, অসুস্থতার অজুহাতে আরও দুই মাস তাঁহারা পুরা বেতনে ছুটি দিবেন, তাহার পর দুই মাস অর্ধ বেতন—এর চেয়ে বেশী কিছু তাঁহারা করিতে পারেন না। স্কুলের যা আর্থিক অবস্থা তাহাতে আর কিছু করা সম্ভবও নয়। অর্থাৎ কায়ক্লেশে মাস চারেক কাটিতে পারে—কিন্তু তাহার পর?

হয়ত সন্ধ্যাদের বলিলে কিছু কিছু মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা হইতে পারে, কিন্তু সে ত ভিক্ষা। তা ছাড়া সে-ই বা কতটা চাওয়া যায়? যতটা পাওয়া যাইবে তাহাতে কতটা চলিবে তারও কিছু ঠিক নাই। এবং সে সাহায্য চাহিবার কোন অধিকার ভূপেনের আছে কি না—সে সংশয়টাও বার বার ভূপেনের মনে জাগিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সহসা একদিন কল্যাণী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, একবার শুনুন।

ভূপেন রান্নাঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতেই সে বিনা ভূমিকায় বলিল, গদাধরপুর প্রাইমারী ইস্কুলে না কি একজন মাস্টারের চাকরি খালি আছে, মাইনে অবশ্য বেশী নয় কিন্তু তাদের তেমনি পাশ-টাশ করারও অত দরকার নেই··· আমাদের রাখুকে দিলে কি হয়? আপনি একটু তদ্বির করলে হয়ত হয়ে যেতে পারে।

রাখু কল্যাণীর পরেই যে ভাই—ছেলেদের মধ্যে সে-ই বড়। বছর পনেরো-ষোল বয়স, সবে সেকেন্ড ক্লাসে পড়িতেছে।

বিস্মিত হইয়া ভূপেন প্রশ্ন করিল, রাখু?···কিন্তু ও ত নিজেই ছেলেমানুষ।···তাছাড়া সে মাইনেই বা আর কত পাবে?

নতমুখ কল্যাণী উত্তর দিল, শুনেছি টাকা দশেক। কিছুই নয় অবিশ্যি, কিন্তু উপোস করে মরার চেয়ে ত ভাল।

একটু যেন আহত কণ্ঠেই ভূপেন বলিল, উপোস ক'রে ত মরতে হয় নি এখনও—এরই মধ্যে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? একটু ভাবতেই সময় দাও না।

কল্যাণী খুন্তিটা লইয়া মুহূর্ত কয়েক নাড়া-চাড়া করিয়া বলিল, আপনি যখন আছেন তখন যা হয় একটা উপায় হবেই জানি, কিন্তু সেটা ত আপনার ওপরই পীড়ন করা হবে। হয় নিজের পকেট থেকে দিতে হবে, নয় ত আপনাকেও ভিক্ষে ক'রে আনতে হবে।···তা ছাড়া সে ত রইলই—যদি কিছুও আনতে পারে রাখু, ক্ষতি কি? যতটা নিজের পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারে ততটাই ভাল নয় কি?

ভূপেন কহিল—ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু ওটা ত পায়ে ভর দিয়ে চলা নয় কল্যাণী, ওটা খুঁড়িয়েই চলা। আর ওতে চিরকাল অমনি খুঁড়িয়েই চলতে হবে। ···বরং কোন মতে যদি ম্যাট্রিকটা পাস করতে পারে ত বহু দোরই খোলা থাকবে

ওর সামনে।...আচ্ছা দেখি—

সে বাদানুবাদের অবসর না দিয়াই চলিয়া আসিল। কল্যাণী সম্পূর্ণভাবে তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছে না—এ কথাটা কাঁটার মতই বহুক্ষণ ধরিয়া খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। তবে এ কথাটাও মনে মনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, জোর করিয়া আশ্বাস দেয় সে কল্যাণীকে—আমি তোমাদের সমস্ত ভার লইলাম—এমন সাহসও ত তাহার নাই। তাহার ক্ষমতা কতটুকু, সে কথা তাহার চেয়ে বেশী আর কে জানে।

সুতরাং দিন-দুই পরে একদিন তাহাকে গদাধরপুর যাত্রা করিতে হইল। কোন্ পথ, কোথা দিয়া যাইতে হয়—কত দূর, কিছুই ধারণা ছিল না। কোন মতে জিজ্ঞাসা করিয়া পেঁাছিল। এই গ্রামে সালেকদের বাড়ি, অনেক দিন আগে বেড়াইতে বাহির হইয়া সে-ই পথটা দেখাইয়া দিয়াছিল, সুতরাং মোটামুটি কোন দিকে গ্রামটা সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা তাহার ছিল।

সে স্কুলের ছুটির একটু আগেই বাহির হইয়াছিল, তবু সেখানে পেঁাছিতে তাহার অপরাহ্ণ গড়াইয়া আসিল। ছোট গ্রাম, কয়েক ঘর মাত্র লোক, তাহার মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা খুবই কম। যে কয় জন লোক আছে তাহারাও এখানকার অন্য গ্রামের অধিবাসীদের মতই অর্ধমৃত—দারিদ্র্যে, অনাহারে, ম্যালেরিয়ায় ও অশিক্ষায়—একেবারে পুরোপুরি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। প্রশ্ন করিলে তাকাইয়া থাকে, কথা বুঝিতে দেরি হয়। মনে হয় বুঝি উত্তর দিবার মত দৈহিক শক্তিও আর তাহাদের অবশিষ্ট নাই।

ভূপেন গ্রামে প্রবেশ করিতে এখানকার সব গ্রামের মতই উলঙ্গ, কৃষ্ণকায়, শীর্ণ ছেলেমেয়ের দল ঘিরিয়া দাঁড়াইল, দুই-একজন যথারীতি 'আপনার নিবাস কোথায় ?' তা-ও প্রশ্ন করিল, কিন্তু পাঠশালাটা যে কোন্ দিকে সে উত্তরটা তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিতে ভূপেনকে রীতিমত বেগ পাইতে হইল। অনেক বকাবকির পর তাহার প্রশ্নটা বুঝিতে পারিয়া একটি ছোকরা যখন 'মশাই' বা পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়িটা দেখাইয়া দিল, তখন সন্ধ্যার আর খুব বেশী দেরি নাই।

সৌভাগ্যবশত পণ্ডিতমশাই বাড়িতেই ছিলেন। বাহিরে আসিয়া পরিচয় পাইতেই বিশেষ সমরোহ করিয়া বসাইলেন। এমন কি অনেক চেষ্টা ও তম্বিরের পর রসগোল্লা ও খাস-বালুসাহীর সঙ্গে এক কাপ চা-ও আসিয়া পেঁাছিল।

জলযোগ ও কুশল-বিনিময়ের পর ভূপেন সরাসরি কাজের কথাই পাড়িল। কথাটা শুনিয়া পণ্ডিতমশাই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, বিজয়বাবুকে আমি ভাল ক'রেই চিনি বাবু, অমন মানুষ হয় না। তাঁর ছেলেকে আমি কাজ দেব এতে আর কোন কথাই চলে না। তাঁর বিপদের কথাও শুনেছি সব—এ অঞ্চলে বোরণের ঘরে ঘরে লোকেরই চোখ গেছে বাবু, তবে অমন হঠাৎ যেতে শুনি নি আর কখনও। হবে কি বাবু, তেলে যে কি ভেজাল না দিচ্ছে তা বলতে পারি না। সের-করা এক-পো সর্ষেও থাকে না। কি করব ঐ আমাদের খেতে হয় —উপায় কি ? যাক যা বলছিলুম, ও'র ছেলের কাজের কথা—মাইনে ত বাবু

সাতটি টাকার বেশী আমি দিতে পারবো না। তাতে কি ওদের পোষাবে? এই দেড় ক্রোশ পথ হে'টে যাওয়া-আসা!

—মোটে সাত টাকা!—বিস্মিত ভূপেন প্রশ্ন করিল।

লজ্জিত মুখে পণ্ডিতমশাই উত্তর দিলেন, তার বেশী আর কোথা থেকে দেব বলুন। সরকারী গ্র্যাণ্ট পাই মোটে কুড়িটি টাকা। মাইনে ওঠে কোন মাসে দশ, কোন মাসে বারো—যে মাসে খুব বেশী ওঠে, পনেরো টাকা। আট আনা আর চার আনা মাইনে, তাও অর্ধেক ছেলেই দিতে পারে না। এখানে কি ইস্কুল চলে? চলে না। আমাদের উপায় নেই বলেই জোর ক'রে চালানো। আমি নিই পনেরো টাকা—আমার ভাইকে দিই দশ। তার কমে আমাদের সংসার চলে না। বাকী কি থাকে আর তা থেকে কি দেবো বলুন দিকি! অথচ আর একটা মাস্টার না রাখলে ইন্সপেক্টার বকাবকি করে। কে আসবে ঐ মাইনেতে!...আমাদেরই কি পোষায়? কলাটা মূলোটা আদায় হয় মধ্যে মধ্যে—কেউ বা ঘর থেকে লাউ এনে দেয়, কেউ বা একটা সুষ্যি কুমড়ো। আর আয়ের মধ্যে কখনো বই বিক্রী হয় বছরের গোড়াতে, তাই বা কটা ছেলে বই কিনতে পারে? যা-ও কেনে তা-ও ধারে। সম্বচ্ছর ধরে বইয়ের দাম আদায় দিতে হয়।

ভূপেন প্রশ্ন করিল, আপনারাই বই বেচেন?

—বেচি বৈ কি। নইলে চলবে কি ক'রে? ঐ সিজিন-এর মুখে বই-ওলারা আসে, যার বইয়ে বেশী কমিশন তার বই-ই খানকতক নিয়ে রাখি—সেই বই-ই পড়াই। পেটের দায়ে সবই করতে হয় বাবু, খারাপ বই পড়াতে অসুবিধা হয়, তবু বেশী কমিশন পাই বলে তা-ই ইস্কুলে ধরাই। নইলে চলবে কেন?

—খারাপ বই জেনেও ধরান?

—কি করব বলুন? এ ত আপনাদের হাই-স্কুল নয়—এখানে ঐ কমিশনের ওপরই বই চলে। কেউ হয়ত শতকরা প'চিশ-টাকা কমিশন দেবে বললে, তার বই রাখলুম খানকতক—আর একজন ত্রিশ টাকা কি তেত্রিশ টাকা পাঁচ আনা বললে—এর বইটা চালালুম, ওর ফেরত দিলুম! তবে বই দু-একখানা ক'রে চেয়ে-চিন্তে সকলের কাছ থেকেই আদায় ক'রে রাখি। সেই বই-ই প্রাইজে চালাই। প্রাইজ খাতে খরচ দেখাতে হবে ত? টাকা পাবো কোথায়—ঐ সব চকচকে পাঠ্যপুস্তকই চালিয়ে দিই। ঐটেই একটা খরিদ দেখানো হয়। উপায় কি বাবু?

ভূপেন স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, সে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিল, কিন্তু এতে ত ছেলে-পিলেদের পড়ার ক্ষতি হয়?

—কিছু না, কিছু না! ওদের কি কারো লেখাপড়া হবে ভেবেছেন? কারো না, ও শুধু-শুধুই পণ্ডশ্রম। আর এরা পড়বেই না কি কেউ এর পরে? ঐ যা হ'ল হ'ল, তারপর ত বাড়ি বসে ম্যালেরিয়ায় ভুগবে আর যাদের জমি আছে তারা চাষ করবে।...আপনিও যেমন বাবু, ওদের পেছনে খেটে লাভ কি? পড়াশুনো হয় শহর-বাজারের ছেলেদের—তারাই পাস-টাস করে, চাকরি-বাকরি তাদের হয়। এরা কি চাকরি করতে যাবে?...দিচ্ছেই বা কে এদের চাকরি বলুন—বেশী পড়ে লাভ কি?

তবু ভূপেন হাল ছাড়িল না—মৃদু প্রতিবাদের সুরে কহিল, কিন্তু চাকরিটাই ত আর লেখাপড়া শেখার প্রধান উদ্দেশ্য নয়—

—তা ছাড়া আর কি বলুন।—পণ্ডিতমশাই প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কেউ না হয় কেরানী হ'ল—কেউ বা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, যা-ই বলুন না কেন, চাকরি ত ? ডাক্তার উকীল আর ক'টা হচ্ছে, তা ছাড়া লেখাপড়া একটা ভাগ্যের কথা, যাদের হবার ঠিক হয়। এই ত কত বড়লোকের ছেলে দেখছি—বাপ-মা কত চেষ্টা করে, কত পয়সা খরচ করে, কিচ্ছু হয় না। আবার রাঁধুনী বামুনের ছেলে বিদ্যাসাগর হয়। তা ছাড়া বই কি আর এমন কিছু ইতর-বিশেষ হ'তে পারে—গুণ-ভাগ সব অঙ্কের বইতেই আছে, বোঝেন না ?

তারপর একটু থামিয়া কহিলেন, তা ছাড়া ভাল বই কি আর পাস হয় বাবু ? এক দফা সরকার বই পাস ক'রে দিলে ইস্কুলের জন্য, আবার এক দফা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে পাস করাতে হয়। আমাদের প্রাইমারী বইতে ঝঞ্ঝাট কত।...ঐ মিটিং-এর সময় যে কেরানীবাবুকে আর মেম্বারদের মোটা ঘুষ দিতে পারবে তারই বই পাস হবে। এ বছর আমাদের জেলায় একখানা মোটে ব্যাকরণ পাস হ'ল, বলব কি বাবু, আড়াই শ'র ওপর ভুল বইটায় ! শুনলুম ঐ বইয়ের যে প্রকাশক সে নাকি চেয়ারম্যানের বৌকে আমলেট গাড়িয়ে দিয়েছে।

ইহার পর আর ভূপেনের বেশী শুনিবার ইচ্ছা ছিল না। সে দুই-একটা কথা কহিয়াই উঠিয়া পড়িতে গেল কিন্তু পণ্ডিতমশাই বিনয় করিয়া কহিলেন, বাবু চললেন—কিন্তু আমার একটা ভিক্ষা আছে।

—কি ব্যাপার ?—ভূপেন যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার কাছে আবার কি ভিক্ষা ?

পণ্ডিতমশাই মাথাটা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, অনেক দিন ধরেই ভাবছি ওপরওলাদের কাছে আর কিছু গ্র্যান্ট বাড়াবার জন্যে দরখাস্ত করব তা লেখবার লোকের অভাবে হয়ে উঠছে না। আজ যখন ভগবান আপনাকে এনে দিয়েছেন তখন আর ছাড়ছি না। হাজার হোক আপনারা হাই-স্কুলের মাস্টার, গ্র্যাজুয়েট নিশ্চয়ই—আপনারা লিখে দিলে অবিশ্যি গ্র্যান্ট বাড়বে। আর যদি পাঁচটা টাকাও বাড়ে তাহ'লে আমি বিজয়বাবুর ছেলেটাকে দশ টাকা মাইনে দিতে পারি। ওকে নিলে অবিশ্যি আমার লোকসান নেই, এখানে পড়াশুনোর তেমন চাপ নেই—চাই কি দুপুরের দিকে আমার কয়লার দোকানের খাতাটাও ওকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারি।

—আপনার আবার কয়লার দোকান আছে নাকি ?

সবিনয় হাস্যে পণ্ডিতমশাই জবাব দিলেন—সম্প্রতি করেছি, সেই ইস্টিশানের ধারে। ছোট্ট দোকান—এখানে ক'টা লোকই বা কয়লা পোড়ায়। তবু, বলি যা কিছু আসে, দুটো পয়সাই বা দেয় কে ? তবে বলতে নেই, কয়লা লক্ষ্মী। ঐ ত আপনি যে ইস্কুলে মাস্টারী করছেন, ভবদেববাবুর আগে ওখানে হেডমাস্টার ছিলেন বঙ্কিমবাবু—আগে ভদ্রলোক সদর বাজারে কয়লার দোকান দিলেন, তারপর বইয়ের দোকান, সব শেষে কাপড়ের। তিনটে দোকানই চলছে, ছেলে,

ভাইপো, ভাগ্নে—সকলকারই ভাত-কাপড় হচ্ছে ঐ দোকান থেকে। তা ছাড়া জোর কত! দোকানগুলো চালু হওয়ায় ইদানীং প্রায়ই ওঁর কামাই হ'ত। তাতেই বুঝি সেক্রেটারী একদিন কি বলেছিল—দিলেন এক কথায় চাকরি ছেড়ে। আমাদের অবিশ্যি সে বরাত নয়, তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি! সত্যি কথা বলতে কি বাবু, এ গরু চরানো আর ভাল লাগে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পণ্ডিতমশাই ঘরের মধ্য হইতে কাগজ কলম আনিয়া দিলেন। কোন মতে একটা দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া ভূপেন যখন উঠিয়া পড়িতেছে, তখন পণ্ডিতমশাই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তাই ত, ওধারে সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আপনি কি এতটা পথ চিনে যেতে পারবেন? তার চেয়ে আজ গরীবের ঘরেই যা হোক দুটো শাক-ভাত খেয়ে কাটিয়ে গেলে হ'ত না রাতটা?

দৃঢ় কণ্ঠেই ভূপেন কহিল, না, আমাকে ফিরতেই হবে। এখানে আমাদের এক ছাত্র আছে সালেক বলে, গফুর শেখর ছেলে, তার সঙ্গে দেখা করলে সে-ই আমাকে পথ দেখিয়ে দিতে পারবে।

—ও, গফুর শেখের বাড়ি! তা সে ত এখানে নয়, প্রায় আধ ক্রোশ তফাৎ আরও, রায়না গ্রাম। তবে রাস্তা এই সিধে—মাঠের ওপর দিয়ে, ঘোর-প্যাঁচ নেই। অন্ধকার রাত এই যা···

—আমার কাছে টর্চ আছে—

এই বলিয়া ভূপেন আর কথাবার্তার সুযোগ না দিয়াই বাহিরে আসিয়া পড়িল। কঠিন ডাঙ্গার উপর দিয়া শীর্ণ পায়ে-হাঁটা পথ, ভুল হইবার কোন কারণ নাই। সে দ্রুত হাঁটিতে শুরু করিল।

সালেক প্রথমটা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই—পরে যখন সন্দেহের অবকাশ রহিল না, তখন ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রায় তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর কোথায় তাহাকে বসিতে দিবে—কি পাতিয়া দিবে কিছু যেন সে ভাবিয়া পায় না, একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িল। গফুর ও তাহার স্ত্রীও ছুটোছুটি শুরু করিয়া দিলেন, ভূপেন তাঁহাদের ছেলের ঐ সাংঘাতিক অসুখের সময় যা করিয়াছে—যে অসুখে লোক ছায়া মাড়ায় না, সেই অসুখে নিজের প্রাণের ভয় না করিয়া যে অক্লান্ত সেবা করিয়াছে—তাহার কৃতজ্ঞতা মুখে প্রকাশ করিবার যেন তাঁহাদের ভাষা নাই। স্বামী ও স্ত্রী, দুজনেই সে কথা বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এমনি প্রথম খানিকটা আলাপ সম্ভাষণের পর ভূপেন ফিরিবার প্রস্তাব করিতেই সকলে লাফাইয়া উঠিলেন। গফুর কহিলেন, পথ বলে দেবার জন্য কিছু নয় বাবু মশাই। সে আপনি যদি নিতান্তই যেতে চান তাহ'লে আমি যেমন ক'রেই হোক্ পৌঁছে দিয়ে আসব—কিন্তু এখনই ত প্রায় এক পহর রাত হয়ে গেল—কখনই বা পৌঁছবেন ওখানে? তাছাড়া আমাদের ঘরে যখন পায়ের ধুলো পড়লই—একটা রাতও কি সেবা করতে পারব না? আজকের রাতটা থেকেই যান না বাবু, কী আর ক্ষতি হবে?···আমাদের এখানে থাকতে কি ঘেন্না করবে?

—ছি ছি, কি বলেন গফুর মিয়া। ভূপেন লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল।

—তবে থেকেই যান মাস্টারমশাই।

সালেক ছল-ছল চোখে অনুরোধ করিল।

তখন রাত হইয়াছে অনেকটা, ভূপেনেরও অনভ্যস্ত পা একটানা এতটা হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর এখানে এই ঐকান্তিক মিনতি, সবটা জড়াইয়া ভূপেন যেন কেমন অভিভূত হইয়া পড়িল। ঠিক থাকিবার ইচ্ছা না থাকিলেও কহিল, আচ্ছা তাই হবে।

কিন্তু গফুর মিঞা যখন প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহারা আয়োজন করিয়া দিবেন, ভূপেনকে রাঁধিয়া লইতে হইবে এবং রান্না ও খাওয়ার জলটাও কুয়া হইতে তাহাকেই তুলিতে হইবে—তখন সে রীতিমত বাঁকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তাহ'লে কিন্তু আমি এখনই চলে যাবো। আমি সে রকম ভাবলে আসতুম না—থাকা ত দূরের কথা।...আপনারা যা খাবেন আমিও তাই খাবো। আপনারা শ্রদ্ধা করে যা রেঁধে দেবেন তা কি অখাদ্য।

কথাটা সালেক বুঝিল কিন্তু গফুর রীতিমত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। এক দিনের জন্য হিন্দু ভদ্রলোককে তাঁহাদের রান্না খাওয়াইতে কিছুতেই মন উঠিল না তাঁহার। শেষ পর্যন্ত আহার্য যখন আসিয়া পেঁৗছিল তখন দেখা গেল যে ভূপেনের জাত বাঁচাইবার জন্য তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, ঘন দুধ, খই, কলা এবং মোণ্ডার ব্যবস্থা হইয়াছে। রীতিমত ফলারের আয়োজন। শুধু তাই নয়, পাড়ার একটি হিন্দু ছেলে আসিয়া পানীয় জলটাও তুলিয়া দিয়া গেল। ভূপেন তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচে, সে আর প্রতিবাদ করিল না, কোন মতে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

কিন্তু সব চেয়ে তাহার হাসি পাইল যখন সে শুইয়া পড়িতে সালেক আসিয়া পদসেবা করিতে বসিল। সে পা-টা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া ঈষৎ তিরস্কারের ভঙ্গিতে কহিল—ও কি সালেক, ছিঃ।

সালেক তাহার পা-দুটা সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, না স্যার, আজ আমি কোন কথা শুনব না। আজ আমার কত ভাগ্য আপনি আমার বাড়ি এসেছেন—এ দিন কি আর পাবো।

তাহার মনের আবেগ বুঝিতে পারিয়া ভূপেন আর বাধা দিল না। শুধু বলিল—পা টিপতে হবে না, যদি দিতেই হয় ত এমনি হাত বুলিয়ে দাও।

তারপর দুটো একটা কথা কহিতে কহিতেই সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সালেক কতক্ষণ পর্যন্ত এমনি বসিয়া তাহার সেবা করিয়াছে, সে জানিতেও পারে নাই। ঘুম যখন ভাঙিল তখন দেখিল তাহার পায়ের কাছে, অত্যন্ত সংকীর্ণ-পরিসর স্থানের মধ্যেই সালেক তাহার পা-দুটা জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইতেছে।

প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার এই সহজ ও সুন্দর প্রকাশ দেখিয়া সে সন্ধ্যাকেই স্মরণ করিল, মনে মনে বলিল, যত গ্লানি, যত কষ্টই থাক—তবু জীবিকা-উপার্জনের এই পথই আমার ভাল। তোমাকে ধন্যবাদ সন্ধ্যা, এই পথ তুমিই দেখিয়ে দিয়েছ।

ভূপেন হোস্টেলে আসিয়া পেঁাছিতে সবাই ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন—কী ব্যাপার মশাই ? কোথায় ছিলেন সারারাত ? পথ হারান নি ত ? আমরা ভেবে মরি !—ইত্যাদি প্রশ্ন ও মন্তব্য চারিদিকে !

সে যখন সংক্ষেপে সব কথা খুলিয়া বলিল, তখন আর সকলেই নিশ্চিত হইলেন বটে, অপূর্ববাবুর মুখ কিন্তু অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে গম্ভীর্যের কারণ তখন ঠিক বোঝা না গেলেও আহারের সময় কাহারও আর বুঝিতে বাকী রহিল না। সকলকারই থালায় খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, শুধু ভূপেনের আসনের সামনে পাতা। সে একটু বিস্মিত হইয়া অপূর্ববাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, থালা কি কম পড়েছে অপূর্ববাবু ?…চুরি-টুরি গেল নাকি ?

মুখ কালি করিয়া তিনি জবাব দিলেন, না, তা ঠিক নয়।…আমাকে ত মশাই ঝি-চাকর টিকিয়ে রাখতে হবে, ওরা কেউ আর আপনার বাসন মাজতে চায় না।

—তার মানে ?

আশেপাশের অন্যান্য মাস্টার মহাশয়রা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। ভবদেববাবুর ত কথাই নাই। কিন্তু অপূর্ববাবু সংকোচের ধার ধারেন না, তিনি বলিলেন, আপনি মুসলমানের ছোঁয়া খেয়ে এসেছেন—হাজার হোক এরা পাড়াগাঁয়ের মানুষ, ওদের নানা রকম কুসংস্কার আছে, তা ত জানেনই।

ভূপেন আসনের উপরই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ওদের ওপর দোষ দিচ্ছেন কেন অপূর্ববাবু ? ওদের ত এরই মধ্যে এ খবর শোনবার কথা নয়, আমি বলেছি আপনাদেরই। অবশ্য আপনাদের মতে জাত যায় এমন কোন ঘটনাই সেখানে ঘটে নি, তাঁরা জলটি পর্যন্ত তুলিয়ে দিয়েছেন অন্য লোককে দিয়ে, তবে আমার কোন আপত্তি ছিল না ওঁদের হাতে খেতে। সে যাই হোক—আমি এমনি অনায়াসে পাতায় খেতে পারতাম কিন্তু এ অবস্থায় খাবো না।

ব্যাপারটা অনেকেরই দৃষ্টিকটু হইয়া পড়িয়াছিল, যতীনবাবু আর থাকিতে না পারিয়া খপ্ করিয়া ভূপেনের হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, ভাত খাবার সময় এসব আবার কি ! বসুন বসুন ভূপেনবাবু, অপূর্ববাবুর সব তাইতে বাড়াবাড়ি। কলকাতায় থেকে কলেজে পড়েছেন, মুসলমামের ছোঁয়া খান নি কে বলুন ত। এখন আবার ঐসব মানতে হবে নাকি ?

ভবদেববাবুও বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, তা ছাড়া এক্ষেত্রে ত সে কথা উঠতে পারে না—উনি যা বললেন, তাতে ত—দাও দাও ঠাকুর মশাই থালা দাও।

যতীনবাবু ততক্ষণে জোর করিয়া ভূপেনকে বসাইয়া দিয়াছেন—সুতরাং ব্যাপারটা তখনকার মত ঐখানেই মিটিয়া গেল।

কিন্তু একেবারে যে মিটিল না, সেটা বোঝা গেল দুই চারি দিন বাদে, সালেক ফিরিয়া আসিতে। সালেকের অল্পবয়স, কৃতজ্ঞতাবোধটা সহজে মন হইতে মুছিয়া যাইবার কথা নয়—সুতরাং এবারে বাড়ি হইতে ফিরিয়া সে ছায়ায় মতন ভূপেনের

সহিত লাগিয়া রহিল। ভূপেনের কোচিং ক্লাসে পদন প্রভৃতি আরও কয়েকটি ছেলে আছে. সেখানে সে মনের মত করিয়া সকলকেই শিখাইতেছে বটে কিন্তু সালেককে এত কাছে পাইয়া সে-ও যেন উৎসাহ বোধ করিল। এই ছেলেটির মাথা ভাল, সেটা বরাবরই সে লক্ষ্য করিয়াছে, তবে খাটিবার শক্তি তাহার কম। কিন্তু সে যদি একেবারে এত ঘনিষ্ঠভাবে উহাকে কাছে পায় তাহা হইলে সালেককে বেশী খাটিতেও হইবে না—হয়ত এই ছেলেটিকে তাহার আশানুরূপই মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি, অন্তত ভূপেনের কাছে, বড় কথা নয়—তাহার আশা অনেক বেশী। বৃত্তি পদনও পাইবে—অবশ্য যদি এমনি ভাবে তাহাদের সে পড়াইতে পারে—কিন্তু সালেক একদিন মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিবে, এ স্বপ্ন ভূপেন ইতিমধ্যেই দেখিতে শুরু করিয়াছে। সন্ধ্যার মত প্রখর বুদ্ধির আভা সালেকের চোখে নাই সত্য কথা, রোগে ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহার প্রাণশক্তিই স্তিমিত, তবু তাহার প্রত্যেকটি কথা সে তেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই শোনে এবং বুঝিতে পারে। এইটিই ছিল ভূপেনের বড় আশ্বাস, ইহার বেশী ছাত্রের কাছে সে আর কিছু চায় না।

সুতরাং সে সালেকের এই কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির সুযোগ পূর্ণমাত্রাতেই গ্রহণ করিল। সকাল বেলা উঠিয়া দাঁতন করিতে করিতে সে যখন মাঠে পায়চারি করে, সালেক তখনই যে তাহার সঙ্গ গ্রহণ করে আর ছাড়ে না,—কোচিং ক্লাস পর্যন্ত সারিয়া একেবারে স্নানাহারের সময় সে নিজেদের হোস্টেলে ফেরে; ছুটির পরও কোন মতে বই ক'খানা রাখিয়া আসিতে যা দেরি, যেদিন ভূপেন এমনি মাঠে মাঠে বেড়ায় সেদিন ত সঙ্গে থাকেই,—যেদিন বিজয়বাবুদের বাড়ি যায় সেদিনও ছাড়ে না। ভূপেন যখন ভিতরে ঢোকে তখন সে বাহিরের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, নয়ত রাখুর সহিত গল্প করে, আবার ফিরিবার সময় একসঙ্গে ফেরে। হোস্টেলে ফিরিয়া ভূপেন আবারও তাহাদের লইয়া পড়াতে বসে অর্থাৎ তখনও সালেকের আর নিজের হোস্টেলে ফিরিবার প্রয়োজন হয় না, রাত্রে আহারের ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত সে মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গেই থাকে।

এমনি ভাবে মাসখানে কাটিবার পর হঠাৎ একদিন ভূপেন স্কুলে থাকিতে থাকিতেই সেক্রেটারীর দুই ছত্র চিঠি পাইল—

'একবার দয়া ক'রে আসবেন ? বাতে শয্যাগত বলে আমি নিজে যেতে পারলুম না।'

ব্যাপারটা ঠিক না বুঝিলেও অপূর্ববাবুর সহিত এই আহ্বানের যে একটা যোগাযোগ আছে সেটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কারণ, আগের দিনই রাত্রে সে যতীনের মুখে খবর পাইয়াছে, সুদখোরটা রোজ রোজ সেক্রেটারীর বাড়ি কেন যাচ্ছে বলুন ত ? নিশ্চয়ই কারোর নামে লাগাতে যায় মশাই। খুব সাবধান, ওর মতলব ভাল নয়, তা আমি বলে দিচ্ছি—দেখে নেবেন বরং—

তখন সে অতটা গ্রাহ্য করে নাই কিন্তু এখন কথাটা মনে পড়িয়া গেল। তবু চিঠির যা ভাষা তাহাতে না যাওয়াটা অভদ্রতা, তা ছাড়া তাহার না যাওয়ার কারণও কিছু ছিল না। সুতরাং সেই দিনই সে ছুটির পর হোস্টেলে না ফিরিয়া

সোজা সেক্রেটারীর বাড়িতে উপস্থিত হইল।

তিনি খাতির করিয়া বসাইলেন, প্রচুর জলযোগ করাইলেন ; তার পর ভূমিকা দিয়া শুরু করিলেন, আপনাকে একটা কথা বলব কিন্তু তার আগে আমাকে কথা দিন যে, কোন রকম অফেন্স নেবেন না !

ভূপেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি বলুন ত ? আবার নতুন কি অপরাধ ঘটল ?

—ঐ ত মশাই। আপনি আগে থাকতেই চটে উঠলেন। না, সত্যি সত্যি আপনাকে কথা দিতে হবে।

হাসিয়া ভূপেন জবাব দিল, বেশ অভয় দিলাম—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বলুন।

তবু তিনি তখনই কথাটা পাড়িতে পারিলেন না, অনেক ইতস্তত করিয়া মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, দেখুন আমি বলছিলুম কি, মাস্টারদের সঙ্গে ছাত্রদের খুব বেশী মাখামাখি করা ঠিক নয—এটা মানেন ত ?

—না, মানি না।

—মানেন না ?—বিস্মিত হইয়া সেক্রেটারী প্রশ্ন করিলেন।

—না। বরং আমার ধারণা ঠিক বিপরীত। অবশ্য সমবয়সী ভাল ছেলেদের সঙ্গেও কিছু মেলামেশা করার প্রয়োজন আছে, এটা আমি স্বীকার করি কিন্তু শিক্ষকদের সঙ্গে ওদের যদি একটা ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটা কি সব দিক দিয়ে নিরাপদ নয় ? ছেলেদের বিগড়োবার সম্ভাবনা কমে যায়, তা ছাড়া ওদের শিক্ষারও সুযোগ ঢের বেশী বাড়ে তাতে। রুটিন-বাঁধা পড়াশুনোয় কতটুকু শিক্ষালাভ হয় বলুন ত ? মাস্টারমশাইদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলে অনেক কিছু ওরা শিখতে পারে, পড়াশুনোর দিকে ঝোঁকটাও বাড়ে ক্রমশ। তাই নয় কি ?

সেক্রেটারী যেন একটু বিপন্ন বোধ করিলেন। কহিলেন, তা অবশ্য বটে, তবে এর আর একটা দিকও আছে ভূপেনবাবু। আমি আপনাকে চিনি, আপনি যে খাঁটি ইস্পাত তাও আমার জানতে বাকী নেই, তবে আপনাদের যা প্রফেসন তাতে পাঁচজনকে পাঁচ কথা বলবার সুযোগ দেওয়াও ঠিক নয়। তাতে ক'রে অন্য ছেলেদের মনের ওপর ব্যাড এফেক্ট হয়।

ভূপেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিন্তু আপনার এসব কথাগুলোর সঙ্গে আমার কি ব্যক্তিগতভাবে কোন সম্পর্ক আছে ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—মানে—ঐ ক্লাস নাইনের সালেক ছোকরা—ও আজকাল দিন-রাতই প্রায় আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, এতে সবাই নানারকমের ঠাট্টা-তামাসা করছে। একটু সাবধানে চলাই ভাল নয় কি ?

তখনও আসল কথাটা ভূপেনের মাথায় ঢুকিল না। সে খানিকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে মহেশবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু এতে ঠাট্টা-তামাশা করার কি আছে তা ত আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও বুঝতে পারছি না ; একটু খুলে বলুন—

মহেশবাবু বলিলেন, সব কথা খুলে বলা সম্ভব নয় ভূপেনবাবু। তবে আপনাদের সম্পর্কটা সম্বন্ধে—মানে আপনারা ত বন্ধু নন—অথচ অ-সমবয়সী দু'জন লোকের অমন সব সময়ে একসঙ্গে চলাফেরা করাটা··একটু দৃষ্টিকটু হয়, এই আর কি।

—স্কাউণ্ড্রেল!···ভূপেন এতক্ষণে কিছু আলো দেখিতে পাইয়া যেন গর্জন করিয়া উঠিল, ঐ অপূর্ববাবু বলেছেন ত! আশ্চর্য, এসব কথা ওঁদের মাথাতেও যায়! মন না আঁস্তাকুড়?

অপ্রতিভ হইয়া মহেশবাবু বলিলেন, না, দেখুন সত্য কথা বলতে কি একা অপূর্ববাবু নন, এই শ্রেণীর ইঙ্গিত গত সপ্তাহে আরও দু-একজনের কথা থেকে পেয়েছি। আপনি রাগ করবেন না, এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই তা জানি, তবে যদি সম্ভব হয় ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে দোষ কি! নিন্দুকের রসনাকে স্বয়ং রামচন্দ্রও ভয় ক'রে গেছেন।

বহুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া ভূপেন কহিল, ঐ ছেলেটার দ্বারা হযত একদিন আপনাদের স্কুলের গৌরব বৃদ্ধি হ'তে পারত মহেশবাবু। সেই চেষ্টাই করছিলুম। এখন বুঝতে পারছি, বাঙালীর ছেলেরা কেরানীগিরির চেয়ে মাস্টারীকে কেন ছোট মনে করে।

একটু হাসিয়া মহেশবাবু কহিলেন, কিছুই বুঝতে পারেন নি ভূপেনবাবু, কেরানীগিরি করতে গেলে আরও বেশী তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'ত। আপনাকে এখন অনেক ঘা খেতে হবে। সংসার বড় কঠিন জায়গা।

—তা বটে। ভূপেন একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনাদের এখানে এসে পর্যন্ত যা তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে তাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।···তা দেখুন আমাকে দিয়ে যদি আপনাদের সুবিধা না হয় তাহ'লে আমি বরং আনন্দের সঙ্গেই বিদায় নিচ্ছি—

—না, না,—ঐ দেখুন! ঐ জন্যেই আমি আগে আপনার কাছ থেকে কথা নিয়েছিলুম! সে কথাই নয়। তবে আপনাদের দায়িত্ব যে কত বেশী তা ত জানেনই, এসব ক্ষেত্রে একটু সাবধানে চলাই ভাল নয় কি? সেই জন্যই আমি কথাটা আপনাকে জানিয়ে দিলুম। আপনি তা বলে রাগ করতে পারবেন না—

—না, না, আমি একটুও রাগ করিনি, আপনি বিশ্বাস করুন। শুধু এই সব ব্যাপারে মনটা বড় ভেঙে যায়। আচ্ছা, নমস্কার।

ভূপেন আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসিল। রাস্তায় পড়িয়া প্রথমেই যে চিন্তাটা তাহার মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল, সেটা হইতেছে অবিলম্বে স্কুলের চাকরি ছাড়ার কথা। প্রতিদিনকার নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতায় সত্যই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, আর ভাল লাগে না। এমন করিয়া মানুষের অকারণ বিদ্বেষের সঙ্গে আর কত লড়াই করা যায়! একটা কথা ইদানীং সে লক্ষ্য করিয়াছে যে অপূর্ববাবু এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ দুই-একজন শিক্ষক সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই আড়াল হইতে তাহার কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন

এবং অনেক ভাল কথারও বাঁকা অর্থ গড়িয়া লইয়া যথাস্থানে অর্থাৎ হেডমাস্টারের কাছে লাগাইয়া আসেন। তাহার প্রমাণও ভবদেববাবুর কথাবার্তা হইতে একাধিক দিন সে পাইয়াছে। শুধু শুধু এই সামান্য বেতনের জন্য অহোরাত্র ইতরদের সঙ্গে লড়াই করিয়া পড়িয়া থাকার প্রয়োজন কি? চল্লিশ টাকার মাস্টারী বাংলা দেশে আরও ঢের পাওয়া যাইবে।

কিন্তু ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে উত্তেজনাটা যখন কিছু কমিয়া আসিল তখন মনে হইল যে, অপূর্ববাবুর দল পৃথিবীতে হয়ত সর্বত্রই আছে। যদি শিক্ষকতা করিতেই হয় ত এরূপ অপ্রীতিকর অবস্থার অভাব ঘটিবে না— হয়ত ঢের বেশী তিক্ততা সহ্য করিতে হইবে। তবু ত এখানে সে সেক্রেটারীকে সহায় পাইয়াছে—যতীনবাবুর মুখে অন্য স্কুলের সেক্রেটারী ও মেম্বারদের যে সব জুলুমের কথা শুনিয়াছে, তাহাতে সেখানে আত্মসম্মান বজায় রাখা হয়ত শুধু দুঃসাধ্য নয়—অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কতবারই বা স্কুল বদল করিবে সে? তাছাড়া তবু এখানে রাধাকমলবাবু আছেন, ভবদেববাবু আছেন, ইঁহারা লোক তত খারাপ নন। ইহার পর অদৃষ্টে কি জুটিবে তাহার ঠিক কি। এখানকার ছাত্রগুলিও বড় নিরীহ, বড় বেচারা। ইতিমধ্যেই তাহারা ভূপেনের মনে অত্যন্ত মায়ার সঞ্চার করিয়াছে, ইহাদের ছাড়িয়া যাইতেও খানিকটা কষ্ট হইবে বৈ কি। ··আর সব চেয়ে বড় কথা কল্যাণীরা। অন্ধ বিজয়বাবু একান্তভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আছেন। অবশ্য সে আর কতটুকু করিতে পারিবে, তবু এমন ভাবে ছাড়িয়া যাওয়া যায় না।

না, বাধ্য না হইলে সে এখানকার চাকরি ছাড়িবে না। কিন্তু বেচারী সালেক! চাকরি যদি ছাড়া সম্ভব না-ই হয় তাহা হইলে তাহাকে একটু সতর্ক হইতেই হইবে। এমনি ত ব্যাপারটা যথেষ্ট খারাপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপর সে সরিয়া না দাঁড়াইলে সালেকের উপর কী অত্যাচার হইবে তাহারই বা ঠিক কি!···

বড় ডাঙ্গাটা পার হইয়া তালবনের বাঁকে পড়িতেই ভূপেনের সহিত প্রথম যাহার দেখা হইল সে সালেক। সন্ধ্যার আবছায়া আলোতেও দূর হইতে দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়াইয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।

সে কাছে আসিতে সালেক একটু অনুযোগের সুরেই কহিল, কোথায় গিয়েছিলেন মাস্টার মশাই? কাউকে কিছু বলে যান নি।

ভূপেনের দুই চোখ জ্বালা করিয়া যেন জল ভরিয়া আসিল, সে সহসা দুই হাতে সালেককে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কেন, মাস্টার মশাইয়ের জন্যে তোর মন-কেমন কচ্ছিল? সেক্রেটারীর বাড়ি গিয়েছিলুম।

সালেক বিস্মিত হইয়া ভূপেনের মুখের দিকে চাহিল। শুধু যে এই আবেগটা আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত তাহাই নয়—ভূপেনের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গিয়াছিল। ভূপেনও সালেকের বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া একটু

অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তবু সে তাহাকে ছাড়িল না, বরং আরও জোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সালেক, একটা কথা বলব, তুই কিছু মনে করিস নি।... তুই—তুই আর যখন-তখন আমার কাছে আসিস নি ভাই—শুধু যখন কোচিং ক্লাস নেব তখন সকলকার সঙ্গেই পড়তে আসস।

একটা আশঙ্কা ও ব্যথা একই সঙ্গে সালেকের দৃষ্টিতে ঘনাইয়া আসিল। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সেক্রেটারী কি সেজন্যে রাগ করেছেন মাস্টারমশাই ?...আমারই অন্যায় হয়েছিল, মুসলমানের সঙ্গে এত মেলামেশা—

—ওরে না, না, সেজন্যে নয়। তুই বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই বলছি—অন্য কারণ আছে। কিন্তু সে আর না-ই বা শুনলি। ওঁরা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন তাই ত যথেষ্ট।

সালেক আর একটিও কথা কহিল না, শুধু ধীরে ধীরে নিজেকে ভূপেনের হাতের মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া তাহাকে একটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল, তাহার পর নিঃশব্দ-দ্রুত গতিতে নিজেদের হোস্টেলের পথ ধরিল।

সে যে তাহার ক্ষুদ্র বুকখানিতে কী সুগভীর অভিমান বহিয়া লইয়া গেল, তাহা ভূপেন ভাল করিয়াই বুঝিল ; তবু সে আর তাহাকে ডাকিবার বা ফিরাইবার চেষ্টা করিল না, শুধু অনেকক্ষণ সেই অন্ধকারের মধ্যেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইহার পর মাসখানেক একপ্রকার শান্তিতেই কাটিল। অপূর্ববাবু ব্যাপারটাকে তাঁহার ব্যক্তিগত জয়লাভ বলিয়া ধরিয়া লইয়া সগৌরবে পাঁচজনের কাছে গল্প করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন কিন্তু ভূপেন তাহা গায়ে মাখিল না—শুধু সাধ্যমত তাঁহার দলটিকে এড়াইয়া চলিতে শুরু করিল। তবে অপূর্ববাবু যে তাহার কোচিং ক্লাসটি বন্ধ করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সেক্রেটারী সে কথা একেবারেই কানে তোলেন নাই বরং তাঁহাকেই ধমক দিয়াছেন—এ কথাটাও ভূপেনের অগোচর রহিল না, যতীনবাবুর কৃপায় সবই সে শুনিতে পাইল। সে অবশ্য যতীনবাবুর কাছে এসব কথা শুনিতে চায় না—যতীনবাবুই গায়ে পড়িয়া বলেন। তাঁহার স্বভাবটাই কিছু অদ্ভুত। তিনি ভূপেনকেও ঈর্ষা করেন এবং অপূর্ববাবুদের চক্রান্তেও তাঁহার উৎসাহের অভাব নাই, অথচ ভূপেনের বিরুদ্ধে যত কিছু ষড়যন্ত্র হয় সে কথাগুলিও তাহাকে না বলিয়া থাকিতে পারেন না, আর সে সময় অপূর্ববাবুর সম্বন্ধে এমন চোখা চোখা গালাগালি উচ্চারণ করিতে থাকেন যে, সে সব শুনিয়া এখনও ভূপেনের মুখ লাল হইয়া ওঠে। ভূপেন একটা কথারও জবাব দেয় না—কোনদিন কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করে না. সেজন্য যতীনবাবু ক্ষুণ্ণ হন কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার তরফ হইতে উৎসাহের অভাব ঘটে না। সবটা জড়াইয়া যতীনবাবু মানুষটি ভালই—ভূপেন মনে মনে ভাবে, এবং তাঁহার কথা মনে হইলে সে আপন মনেই হাসিয়া ওঠে।

কিন্তু ইতিমধ্যে স্কুলে যে সকলের অলক্ষ্যে একটা মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল এ কথাটা যতীনবাবুও জানিতেন না। সেক্রেটারী কয়েক দিন যাবৎই ঘন ঘন

স্কুলে আসিতেছেন এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গে হেডমাস্টার মহাশয়ের সহিত অফিস-ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কী পরামর্শ করিতেছেন সেটা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল; আর সেজন্য একটু অস্বস্তিও বোধ করিতেছিল কিন্তু তাহার আসল কারণটা কাহারও কল্পনাতে পর্যন্ত আসে নাই, এমন কি অতি-চতুর অপূর্ববাবুরও না। যতীনবাবুর ধারণা যে এবার সকলকার একটা সাধারণ মাহিনা-বৃদ্ধির জল্পনা চলিতেছে—রাধাকমলবাবুর ধারণা, স্কুলের খরচ কিছু না কমাইলে চলিতেছে না, পরামর্শটা হইতেছে সেই দিক ঘেঁষিয়া। কিন্তু আসল কথাটা একদিন একেবারে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই তাহাদের কানে আসিয়া বাজিল।

দিন-পনেরো আগে অক্ষয়বাবু সহসা কী একটা কাজের অছিলায় বাড়ি চলিয়া যান আর ফিরিয়া আসেন নাই। অবশ্য সে অছিলাও যে তিনি দিয়াছিলেন এটা অনুমান মাত্র, কেহ দিতে শোনে নাই। শুধু অল্প লোকের মধ্যে একজন অনুপস্থিত থাকায় অসুবিধাটা সকলেই ভোগ করিতেছিল এবং মনে মনে অক্ষয় সম্বন্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য করিতেছিলেন। ইহারই মধ্যে একদিন সকালবেলায় খবর পাওয়া গেল যে, অক্ষয়বাবু আর একেবারেই ফিরিবেন না, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

তারপরই সব খবর একেবারে একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। অক্ষয়বাবু ইদানীং হেডমাস্টার মহাশয়ের একটু বেশী প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন—বিশ্বস্তও বটে। স্কুলের টাকাকড়ির যে ভার তাঁহার ব্যক্তিগত সেটা তিনি সম্পূর্ণই অক্ষয়ের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সাধন-ভজন করিতেছিলেন। এই অবসরে অক্ষয় স্কুলের অনেকগুলি টাকা ভাঙ্গিয়াছেন, সম্ভবত বহু দিন ধরিয়াই তিনি কিছু কিছু করিয়া খরচ করিয়াছেন। আরও ঢের আগেই ধরা পড়িবার কথা কিন্তু ভবদেববাবু ইতিমধ্যে একবারও হিসাব দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। বৎসর শেষ হওয়ার অনেক পরেও যখন হিসাব-নিকাশ শেষ হইল না তখন সেক্রেটারী তাগাদা দেওয়ায় ভবদেববাবু হিসাবটা দেখিতে চান—সে সময়ে আর কথাটা চাপিয়া রাখা সম্ভব হয় না। অক্ষয়বাবু পলাইয়া যান এবং কর্তারা দুইজনে মিলিয়া অনেক কষ্টে সেই হিসাব উদ্ধার করেন। স্কুলের টাকা তছরূপের ব্যাপার—অগত্যা শেষ পর্যন্ত পুলিশেও খবর দিতে হইল। অক্ষয়বাবু বেচারা কোন মতেই টাকাটার যোগাড় করিতে না পারিয়া জেলে যাইবার ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন।

ইহার পরের ব্যাপারটাও কম অপ্রীতিকর নয়। টাকাটা ভবদেববাবু নিজে নেন নাই সত্য কথা (যদিও যতীনবাবুর সে বিষয়ে একটা সন্দেহ থাকিয়াই গেল—তাঁহার বিশ্বাস, 'ঐ বেটা ভণ্ডই অক্ষয়কে জড়িয়েছে, ও কম নাকি!')—তবু দায়িত্বটা যে তাঁহারই, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং অনেক টানা-হেঁচড়ার পর তিনি জেলটা যদি-বা এড়াইলেন, চাকরিটা আর রহিল না। চুরি ধরা পড়িবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল—তাঁহার বদলে অপূর্ববাবু এক্‌টিনি করিতে লাগিলেন এবং সংবাদপত্রে নূতন হেডমাস্টারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

ভবদেববাবু কয়েকদিন হোস্টেলে রহিলেন—ব্যাপারটা না মেটা পর্যন্ত তাঁহাকে বাড়ি যাইতে দেওয়া হইল না। যে শিক্ষক মহাশয়রা এত দিন তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া চলিতেন, তাঁহারাই সুযোগ-সুবিধা পাইয়া উদ্ধত ও অপমান-সূচক ব্যবহার করিতে ছাড়িলেন না। বিশেষত ছেলেদের মধ্যেও কথাটা ছড়াইয়া পড়িল, তাহারা প্রকাশ্যেই আলোচনা করিতে লাগিল। সে লজ্জা যেন ভবদেব-বাবুর চেয়ে অনেক বেশী বাজিল ভূপেনকে—কিন্তু উপায়ই বা কি! সে অপমানের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না বটে, তবে যতটা সম্ভব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। আগে সে বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে কখনও ভবদেববাবুর ঘরে যাইত না, এখন একমাত্র সে-ই প্রত্যহ তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিল এবং যতটা সম্ভব আলোচনাটা বৈষ্ণবশাস্ত্র ঘেঁষিয়া চালাইতে লাগিল। ভবদেববাবু খুব মুষড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, গুম্ খাইয়াই বসিয়া থাকিতেন অধিকাংশ সময়—কেবল ঈশ্বর উপাসনার এই বিশেষ ধারাটির প্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি একটু তাতিয়া উঠিতেন, সেই সময়ই শুধু তাঁহাকে সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ দেখাইত; সেইজন্য ভূপেন প্রাণপণে চেষ্টা করিত যাহাতে ঐ বিষয়েই কথাটা আবদ্ধ থাকে।

বিদায়ের দিন ভবদেববাবু সজল নেত্রে ভূপেনের হাতটা ধরিয়া বলিলেন, বিপদে না পড়লে বন্ধুকে চেনা যায় না ভূপেনবাবু। বিপদে ফেলে রাধারাণী আপনাকে চিনিয়ে দিলেন। হয়ত অবস্থাগতিকে আপনার ওপর অবিচারই করেছি সময়ে সময়ে, পারেন ত আমাকে মাপ করবেন।

তাহার পর বাক্স খুলিয়া এক খণ্ড 'হরিভক্তিবিলাস' তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, বইখানা বড় ভাল বই, মধ্যে মধ্যে পড়বেন। আর ত আমার কিছুই নেই, এইখানা রেখে দিন, তবু আমার কথা মনে পড়বে।

বৃদ্ধের অসহায় ও করুণ মুখের দিকে চাহিয়া ভূপেনের চক্ষুও সজল হইয়া আসিয়াছিল—সে একটি কথাও বলিতে পারিল না, বইখানি তাঁহার হাত হইতে লইয়া নীরবে শুধু একটা নমস্কার করিল।

॥ ১৮ ॥

নূতন হেডমাস্টারের জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে দরখাস্ত আসিল একশতেরও বেশী, তাহারই মধ্য হইতে বাছিয়া একজনকে নিয়োগ করা হইল বটে কিন্তু সে ভদ্রলোককে নিয়োগ-পত্র পাঠানো হইল দেড় মাস পরের তারিখ হইতে। অর্থাৎ সামনেই গ্রীষ্মের ছুটি—আর দিন দশ-বারো মাত্র বাকী আছে, মিছামিছি এই কয় দিনের জন্য আর ছুটির বেতন দেওয়া হয় কেন! স্থির হইল, অপূর্ববাবুই এই কদিন কাজ চালাইবেন।

ভবদেববাবুর লাঞ্ছনার সময় অপূর্ববাবু সেক্রেটারীর বাড়ি খুব হাঁটাহাঁটি করিয়াছিলেন, তাঁহার আশা ছিল যে শেষ পর্যন্ত তিনিই হয়ত হেডমাস্টারীটা পাইবেন। কিন্তু তিনি ইংরেজীর লোক নন, এমন কি বি-টি পাসও করেন নাই, এই জন্য তাঁহার দাবী শেষ পর্যন্ত টিকিল না, স্কুল কমিটির কোন মেম্বারই

সে প্রস্তাব কানে তুলিলেন না। অপূর্ববাবু ঐ মর্মে একটা দরখাস্তও করিয়াছিলেন—তাহাতে আবার এক মেম্বার একটু ধমক দিয়াছেন, আপনার কি মাথা খারাপ না কি! জানেন না, হেডমাস্টারীর কোয়ালিফেকেসন্ আপনার একটাও নেই?

অপূর্ববাবু অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইলেন। শুধু যে পদোন্নতি হইল না সে জন্যও নয়, নূতন হেডমাস্টার আসিলে তাঁহার এত প্রতাপ থাকিবে কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ রহিয়াছে—হয়ত বা হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টগিরির কয়টা অতিরিক্ত টাকাও চলিয়া যাইবে। সুতরাং ক্ষোভে ও আশঙ্কায় যত তিনি জ্বলিতে লাগিলেন ততই তাঁহার সমস্ত ঝালটা আসিয়া পড়িল ভূপেনের উপর। আরও রাগের কারণ, ভূপেনের কোচিং ক্লাসটা সেক্রেটারীকে অনেক বলিয়াও বন্ধ করিতে পারেন নাই, ফলে তাঁহার মাসিক চার-আনা বেতনের কোচিং ক্লাসের ছাত্রগুলি বিনা মাহিনার অথচ ভাল কোচিং ক্লাসের দিকে ঝুঁকিতে শুরু করিয়াছে। একটা দৈববল এই যে, ভূপেন ভাল ছাত্র ছাড়া তাহার কোচিং ক্লাসে নেয় না। তবু ত দেখিতে দেখিতে গুটি আষ্টেক ছেলে সে লইয়াছে, হঠাৎ যদি সংখ্যা বাড়াইয়া দেয়, বিশ্বাস কি?

অপূর্ববাবুর অত্যাচারে ভূপেনের তিষ্ঠানো প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল বটে, তবে একটা সুবিধা এই যে, অপূর্ববাবুর ক্ষমতা বেশী দিন নয় এটা বুঝিতে পারিয়া অন্য মাস্টার মহাশয়রা কেহ সেদিকে যোগ দিলেন না। এবং সে-ও অল্প সময়ের ব্যাপার জানিয়া প্রাণপণে দাঁতে দাঁত দিয়া সব কিছুই সহিয়া গেল। তাহার সহ্য গুণ দেখিয়া আজকাল সে নিজেই অবাক্ হইয়া যায়—দিনে-রাত্রে, সহস্রবার ইচ্ছা হয় কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে, আবার নিজেকে সংযত করিয়া নেয়। মনকে প্রবোধ দেয়, দারিদ্র্যের মধ্যে যখন সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, দাসত্ব করিয়াই যখন জীবনধারণ করিতে হইবে তখন চামড়া অত পাতলা রাখিলে চলিবে কেন? সবকিছু সহ্য করিতে হইবে। আত্মসম্মান জ্ঞান বা অভিমান রাখিবার মত ভাগ্য তাহাদের নয়।...

গরমের ছুটিতে সকলেই বাড়ি চলিয়া যাইবে, ঠাকুর-চাকররা পর্যন্ত—হোস্টেল বন্ধ থাকিবে। ভূপেন কিন্তু বাড়ি যাইবে না বলিয়াই স্থির করিল। তাহার সামান্য বেতন হইতে বাড়িতেও কিছু টাকা পাঠাইতে হয়—এখানকার খরচ আছে, তাহার উপর বিজয়বাবুকে আগামী মাস হইতে কিছু কিছু সাহায্য করিতেই হইবে। তাহার মনের মধ্যে একটা গোপন আশা ছিল যে, সন্ধ্যা হয়ত নিজে হতেই বিজয়বাবুদের খোঁজ লইবে, তাহাদের সাহায্য করিবার কথা পাড়িবে। কারণ, এ শ্রেণীর মাসিক সাহায্য মোহিতবাবুর অনেকগুলিই আছে—সে সংখ্যা একটা বৃদ্ধি হইলে কিছুই আসিয়া যাইবে না। ভূপেন অবশ্য নিজের মনকে এই বলিয়াই সে চিন্তার সময় প্রবঞ্চনা করিত যে, উহারা সাহায্য করিতে চাহিলেও সে সহজে লইবে না, বিজয়বাবুদের ভার সে নিজেই বহন করিবে, যেমন করিয়া হউক—অথচ সে যে এই আশাটার উপর কতখানি ভরসা করিয়াছিল তাহা নিজের মনের কাছে একদা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, যখন পরপর তিনখানি চিঠির মধ্যেও সন্ধ্যা সে কথার

কোন উল্লেখ করিল না। বিজয়বাবুদের কুশল প্রশ্ন সে করে, কিন্তু কোন প্রকার সাহায্যের কথা বা কি করিয়া তাঁহাদের দিন চলিতেছে, সে কথার উল্লেখ পর্যন্তও করে না।

ইদানীং সন্ধ্যার চিঠিও আসে কম—যেগুলি আসে তাহারও বক্তব্য ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ভূপেন মনে মনে একটা অভিমান বোধ করে। কিন্তু সে নিজে যে সন্ধ্যার দুইখানা চিঠি এড়াইয়া গিয়া তৃতীয়খানার জবাব দেয়, এবং সে চিঠির দৈর্ঘ্য যে সন্ধ্যার সংক্ষিপ্ত চিঠির চেয়েও কম, সে কথাটাও মনে মনে স্বীকার না করিয়া পারে না। তবু মানুষের সহজ স্বার্থপরতায় দেওয়ার কথাটা ভুলিয়া সে পাওয়ার দিকটাই দেখে এবং সন্ধ্যার চিঠিতেই ইদানীং যে একটা সূক্ষ্ম অভিমানের সুর বাজে তাহার কোন কারণই খুঁজিয়া পায় না। সে অভিমান প্রকাশ পায় ছোট ছোট বিদ্রূপে, খোঁচা দেওয়া ইঙ্গিতে। এ যেন আর এক সন্ধ্যা—তাহার সহজ, সুন্দর, সপ্রশ্ন অন্তঃকরণকে যেন আর আগেকার মত চিঠির লাইনে লাইনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষত একটা চিঠি সম্বন্ধে ভূপেনের প্রবল আপত্তি ছিল। যে চিঠির বক্তব্যকে অকারণ নীচতা বলিয়াই মনে হইয়াছিল ভূপেনের। সে লিখিয়াছিল, 'কল্যাণীদির আপনার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, একথা বললে তাঁর মনোভাব কিছুই প্রকাশ করা হয় না। আপনার কথা বলতে গেলেই তাঁর চোখ ছল্ ছল্ ক'রে ওঠে, দৃষ্টি চলে যায় কোন্ অতলে, যে দেবতাকে ধ্যান করতেও ভয় করে—সেই সুদূর অথচ অন্তরবাসী দেবতার খোঁজে। আর সে সময়ে এমন একটি দীপ্তি ওঁর মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে ওঁর মত সাধারণ চেহারার মেয়েকেও সুন্দরী দেখায়। আপনার ভাগ্য ভাল মাস্টারমশাই, অনেকেরই অন্তরের পূজো এজন্মে আপনি পেয়ে গেলেন।…আচ্ছা, বিজয়বাবুরা আপনাদেরই সজাতি, না?' তাহার পরই সে প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া গেছে বটে কিন্তু শেষের এই খাপছাড়া প্রশ্নটির মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তাহাতে ভূপেন বিরক্তই হইয়াছে।

সুতরাং ইহার পর নিজ হইতে মোহিতবাবুর কাছে কল্যাণীদের কথা তোলা কোনমতেই সম্ভব নয়—সে নিজেই চালাইবে যেমন করিয়াই হউক। তাহার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয় করিবে। সেই জন্য সে কলিকাতায় যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিল। যাওয়া-আসার গাড়ি ভাড়া ত আছেই, তা ছাড়া শহরে গেলে সমস্ত পুরাতন অভ্যাস যেন একসঙ্গে মাথা চাড়া দেয়, সহস্র রকমের খরচ সামনে আসে। মা-বোনেরা খুবই ক্ষুণ্ণ হইবেন সত্য কথা কিন্তু উপায় নাই। তাঁহাদের চিঠি লিখিয়া দিল যে, এই ছুটিটা নির্জনে থাকিয়া এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে। কথাটা খুব মিথ্যা নয়, সে সংকল্প তাহার ছিলই।

সন্ধ্যার চিঠির জবাবেও সেই কথাই সে লিখিয়াছিল, কারণ সত্য কথা লিখিলে পরোক্ষভাবে তাহার কাছে সাহায্য চাওয়াই হইবে। পরীক্ষার কথা লিখিয়া শেষে লিখিল, 'কষ্ট খুবই হবে তাতে সন্দেহ নেই। এখন থেকেই মাঠে যেন আগুন-বৃষ্টি হ'তে শুরু হয়েছে, জ্যৈষ্ঠ মাসে যে কী হবে তা ভাবতেও পারি না। তবে নতুন একটা অভিজ্ঞতাও হবে বৈ কি; একেবারে এই নির্জন জায়গায় এক মাস বাস

করা, ভাবতে ভালই লাগছে। একেবারে রীতিমত তপস্যা! কী বলো?'

সে স্থির করিয়াছিল হোস্টেলে বাস করিবে এবং যে চাকরটি থাকিবে ইস্কুল ও হোস্টেল-বাড়ি পাহারা দিবার জন্য, তাহার সহিতই একটা বন্দোবস্ত করিবে আহারাদির। কিন্তু কল্যাণীর কাছে কথাটা পাড়িতে সে প্রবল আপত্তি জানাইল, কহিল, তাই কখনও হয়। একা ঐ তেপান্তরের মাঠে পড়ে থাকবেন? অসুখ আছে বিসুখ আছে—তাছাড়া আমরা থাকতে আপনি চাকরের হাতে খাবেন? যদি থাকতেই হয় ত আপনি এখানে এসেই থাকুন। আমাদের ভাঙা বাড়ি, থাকতে কষ্ট হবে, তবু চোখের সামনে থাকবেন, সেবাযত্ন ত করতে পারব।

ভূপেন লেখা-পড়ার কথা তুলিয়া কী একটা আপত্তি জানাইতে গেল, বাধা দিয়া কল্যাণী বলিয়া উঠিল, আপনার পড়াশুনোর কোন ব্যাঘাত হবে না, আমি কথা দিচ্ছি, ভাইদের আমি সামলে রাখব। দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি, আর অন্য মত করবেন না। আপনি যদি ওখানে একা পড়ে থাকেন তাহ'লে আমি অন্নজল ত্যাগ করব, তা বলে রাখলুম।

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর যেন একটু বেশী রকমের ব্যাকুল শোনাইল। ভূপেন সে আকুলতায় বিস্মিত হইলেও ঠিক সে-দিকে তাহার মন ছিল না, ভাবিয়া দেখিল এই বন্দোবস্তই সুবিধা। এমনি ত একা থাকার অসুবিধা আছেই, তা ছাড়া একেবারে হাত পাতিয়া টাকাটা লইতে গেলে ইহাদের মাথা কাটা যাইবে, বাড়িতে থাকিলে বাজার করার অছিলায় তাহার যাহা দেয়, আস্তে আস্তে দিতে পারিবে। এই এক মাসে ব্যাপারটা সহিয়া গেলে পরের মাস হইতে হয়ত অত লজ্জায় বাধিবে না। যাহারা কখনও পরের দয়ায় জীবন ধারণ করে নাই, প্রথম সাহায্যটা তাহাদের বড়ই আঘাত দেয়।

কল্যাণী ব্যগ্রভাবে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার উত্তর আশা করিতেছিল, ভূপেনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, সন্ধ্যাদি আপত্তি করবেন, তাই ভাবছেন?

তাহার কণ্ঠে কোথায় যেন একটা অভিমানের সুর। ভূপেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জবাব দিল, আমি সমস্ত কাজ সন্ধ্যার মত নিয়ে করি, এমন কথা তোমার মনে এল কি ক'রে?

ভূপেন সত্যই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিক্ততা তাহার গোপন করিবারও চেষ্টা ছিল না। কল্যাণী কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন মাথা নত করিয়া কহিল, না, আমার অন্যায় হয়েছে ও কথা বলা। কিন্তু থাকবেন ত এখানে? নইলে—নইলে বাবা বড় দুঃখ পাবেন। ভাববেন, আমরা বড় গরীব বলেই—

কণ্ঠস্বরে অকারণ জোর দিয়া ভূপেন কহিল, না এখানেই থাকব।

কল্যাণীর মুখ একবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াই আবার ম্লান হইয়া গেল; একটু যেন ভয়ে ভয়েই বলিল, আপনার কিন্তু অসুবিধা হবে—

হোস্টেলে একা থাকলে আরও অসুবিধা হ'ত।

আর বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়া ভূপেন বাহির হইয়া পড়িল। সেই

দিনই সকালে স্কুলের ছুটি হইয়া গিয়াছিল। সে বৈকালে যখন কল্যাণীদের বাড়ী যায় তখনই দেখিয়া গিয়াছে যে হোস্টেল ফাঁকা—অধিকাংশ ছাত্র ও শিক্ষকই ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। যে দুই-একজন ছিলেন, রাত্রে ফিরিয়া দেখিল তাঁহারাও কেহ নাই। এ হোস্টেলে থাকিবার মধ্যে আছেন অপূর্ববাবু আর ঠাকুর-চাকর। অপূর্ববাবুর হিসাব-নিকাশ মেটে নাই বলিয়াই রাতটা থাকিতে হইয়াছে, তাঁহারা কাল ভোরেই রওনা হইবেন। আর নাকি ও-হোস্টেলে সালেক এখনও আছে। তাহার কি একটা প্রয়োজন আছে, সেও কাল সকালে চলিয়া যাইবে।

ভূপেনের ইচ্ছা হইল সালেককে একবার ডাকিয়া পাঠায় কিন্তু অপূর্ববাবুর কথাটা মনে পড়িয়া বিরত হইল। সে বেচারা সে-ই যে সেদিন ম্লানমুখে চলিয়া গিয়াছে, আর এক দিনও ভূপেনের সঙ্গে একা দেখা করে নাই। কোচিং ক্লাসে আসিলেও কোন কথা বলে না, শুধু ভূপেন প্রশ্ন করিলে প্রয়োজন-মত জবাব দেয়। এমন কি, সে যেন তাহার চোখে চোখ পড়িবার ভয়েই সর্বক্ষণ মাথা নিচু করিয়া থাকে। এ যে তাহার অভিমান তা ভূপেন বোঝে কিন্তু সে নিরুপায়। ঐ নির্মল সরল ছেলেটিকে সে কী করিয়া সব কথা বোঝাইবে? তার চেয়ে ও যা বোঝে তাই বুঝুক, মোটের উপর দূরে থাকিলেই ভাল। কাছে ডাকিয়া সান্ত্বনা দিতে গেলেও হয়ত তাহার কদর্থ হইবে। কাজ নাই আর ঝামেলা বাড়াইয়া।… আজও সেই জন্যই সে ইচ্ছাটা চাপিয়া গেল; বরং এক মাস যদি এখানে একা থাকিতেই হয় ত সেই সময় একদিন সালেকদের বাড়ি গেলেই চলিবে।

আহারাদির পর অপূর্ববাবুর সঙ্গে দুই-একটি কথা সারিয়া সে ঘরে আসিয়া বসিল। তাহারও জিনিসপত্র ঠিক করিয়া লওয়া দরকার। কথা আছে হোস্টেলের চাকরই ভোরবেলা তাহার বাক্স-বিছানা বিজয়বাবুদের বাড়ি পেঁাছাইয়া দিয়া আসিবে।

সে বই-কাগজ-পত্রগুলি গুছাইয়া রাখিয়া আরও কিছুক্ষণ প্রায় ঘণ্টাদেড়েক বসিয়া একখানা বই পড়িল। ততক্ষণে হোস্টেল নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, অপূর্ব-বাবুও বোধ করি হিসাবের কাজ সারিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন—ঘরে ও বাহিরে কয়েকটা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া কোন শব্দ নাই। এ নিস্তব্ধতায় মন ভারি হইয়া ওঠে, শহরের মানুষ ভয় পায়।

ভূপেন আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সহজে তাহার ঘুম আসিল না। অপূর্ববাবুর বিদায়-সম্ভাষণটা বার বার মনে পড়িতেছিল। কথাগুলি ভদ্র, সাধারণ অর্থে ভালই—তিনি বলিয়াছেন, 'তাই ত, আপনার তাহ'লে দেশে যাওয়া হ'ল না ভূপেনবাবু।…রাঢ়ের মায়া আপনাকে বেঁধেছে বটে। নইলে এই গরমে —আমরা ঝলসে যাচ্ছি, আর আপনি ঘর-বাড়ি থাকতেও—। অবিশ্যি বিজয়বাবুর বাড়িতে আপনার কোন কষ্ট হবে না, মেয়েটি শুনেছি ভালই, যত্ন-আত্তি করে খুব। তা ছাড়া, এখন ত প্রকৃতপক্ষে আপনিই ওদের অভিভাবক।…বাস্তবিক বিজয়বাবু আপনাকে পেয়ে বেঁচে গেলেন, আমরা ত ও'র কোন উপকারেই আসতে পারলুম না—তবু আপনি ছিলেন তাই। ভগবান যে কাকে দিয়ে কী করান।' ইত্যাদি—

কিন্তু এই কথার মধ্যে কণ্ঠস্বর এবং দৃষ্টিতে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস ছিল—সেইটাই ভূপেনের অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ঠিক যে তিনি বিদ্রূপই করিতে চাহিয়াছেন এমন কথাও সে হলপ করিয়া বলিতে পারে না, অথচ কী যে, তাহাও বলা শক্ত। মোটের উপর, এখন যদি ব্যবস্থাটা বদল করা চলিত ত সে বোধ হয় রাজী ছিল, কিন্তু সে পরিবর্তনটা নিতান্ত অপূর্ববাবুর ভয়েই করিতে হইবে, এই লজ্জায় সে আর কিছু করিল না।

সে জোর করিয়া মনকে শান্ত করিল বটে, কিন্তু অস্বস্তিটা যেন আর কিছুতেই যাইতে চায় না। কী যেন একটা নোংরা ক্লেদাক্ত, জিনিস সে স্পর্শ করিয়াছে, এমনি একটা অনুভূতি বহু রাত্রি পর্যন্ত তাহাকে অতন্দ্র রাখিল। অবশেষে এক সময় যখন সমস্তটা আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন হঠাৎ কী একটা শব্দে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দেখিল, তাহার খোলা জানালাটার কাছে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া প্রশ্ন করিল, কে?

খুব চুপি চুপি কে উত্তর দিল, আমি!

কে, সালেক? বিস্মিত হইয়া ভূপেন উঠিয়া বসিল—কী রে?

সালেক যেন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি বলিল, আমি, আমি একটু আপনার কাছে আসব?

আয়, আয়। ভূপেন উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সালেক নিঃশব্দে ব্লক পার হইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তত রাত্রে কেহই জাগিয়া নাই, তবু সে ঘরে ঢুকিবার আগে একবার সসংকোচে অপূর্ববাবুর ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল।

ভূপেন আবার কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, যা বিছানায় গিয়ে বোস—

সালেক কিন্তু গেল না; রাজ্যের লজ্জা এবং সংকোচ যেন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অবশ করিয়া দিয়াছিল, কোন মতে গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা না ক'রে কিছুতেই বাড়ি যেতে পারলাম না। আপনি, আপনি কি আমার ওপর রাগ করলেন?

ছি! রাগ করব কেন? আয় আয়—। ভূপেন তাহার একটা হাত ধরিয়া টানিতেই সে সহসা একেবারে ভূপেনের বুকের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তার পর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সালেকের সে কী কান্না! এত দিনের সমস্ত বেদনা ও অভিমান যেন জমাট হইয়া ছিল, আজ ভূপেনের স্নেহের উত্তাপে গলিয়া অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—কোন লজ্জা, কোন ভয়ের বাধা মানিল না?

ভূপেনের খালি গা তাহার চোখের জলে ও দেহের ঘামে ভিজিয়া উঠিল কিন্তু সে বাধা দিল না, বরং এক হাতে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আর এক হাত তাহার মাথায় পিঠে বুলাইতে লাগিল! এই মুহূর্তে সেই শীর্ণকায়, শ্যাম-বর্ণ মুসলমান বালকটি তাহার অন্তরের মহিমায় ভূপেনের চোখে যেন এক অপূর্ব দীপ্তিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারও এই শ্রদ্ধাবান ছাত্রটি সম্বন্ধে যত স্নেহ এত দিন প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পায় নাই, আজ সমস্তটাই যেন নীরবে তাহার সর্বাঙ্গে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ, কিছুটা লজ্জিত হইয়া সালেক তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, আমি তবে যাই মাস্টারমশাই—

ভূপেন মাথা নাড়িয়া কহিল, না, এখন আর ও হোস্টেলে ফিরে যেতে হবে না। আমার কাছেই থাক্। ভোরে উঠে চলে যাস—

না মাস্টারমশাই, আমি ফিরেই যাই।

তাহার সংকোচের কারণটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সস্নেহে পিঠের ওপর একটা হাত রাখিয়া ভূপেন প্রশ্ন করিল, কেন রে? ভয় করছে? থাক্ না একটু আমার কাছে।

সালেক যতীনবাবুর খালি চৌকিটার দিকে চাহিয়া রাজী হইয়া গেল। কহিল, আচ্ছা, আমি ঐ চৌকিটার ওপর থাকব এখন। ও-ত কাঠের চৌকি, ওতে কি দোষ হবে?

ও হরি! তুই বুঝি ঐ কথা ভাবছিস্? তাই এতক্ষণ বিছানায় বসিস্ নি? মানুষের বিছানায় মানুষ বসলে কোন দোষ হয় না রে। নোংরা মানুষ হলেই ঘেন্না করে—নইলে করবে কেন?

সে এক-রকম জোর করিয়াই সালেককে তাহার বিছানায় শোয়াইয়া দিল, তার পর নিজেও তার পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া সেই সংকীর্ণ শয্যার উপরই আশ্রয় লইল। সে রাত্রে তাহাদের কাহারও ঘুম হইল না, সালেক ছেলেমানুষের মতই দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া গল্প করিয়া যাইতে লাগিল। অত গরমে ঐ ভাবে শুইয়া থাকিতে ভূপেনের খুব কষ্ট হইলেও, সে তাহার উৎসাহে বাধা দিল না বরং সারা রাত সে-ও উৎসাহের সহিতই বকিয়া চলিল। সালেক মধ্যে মধ্যে বলে, পাখাটা দিন মাস্টারমশাই, আপনাকে একটু হাওয়া করি—আপনার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে কথা ভুলিয়া নূতন কোন প্রশ্নে চলিয়া যায়। এমনি করিয়া কোথা দিয়া রাত কাটিয়া গেল তাহা দুজনের একজনও জানিতে পারিল না—একেবারে পূর্বাকাশ ফরসা হইয়া উঠিতে চৈতন্য হইল। সালেক তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভূপেনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, তাহ'লে একদিন যাবেন ত মাস্টারমশাই—ঠিক? আমি কিন্তু আপনার পথ চেয়ে থাকব।

পায়ের উপর হইতে তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া ভূপেন হাসিয়া জবাব দিল, যাবো রে যাবো।

॥ ১৯ ॥

বিজয়বাবুদের দারিদ্র্যের চেহারাটা সম্বন্ধে ভূপেন যত কিছুই অনুমান করিয়া থাক, এখানে বাস করিতে আসিয়া দেখিল যে, তাহার কোনটাই আসলের সহিত মেলে না। কল্যাণী সযত্নে গোপন করিবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু একই বাড়িতে বাস করিতে গেলে সবটা গোপন করা যায় না। ডাল এবং যে-কোন একটা ব্যঞ্জন হয় শুধু বিজয়বাবু, তাঁহার দিদি আর ভূপেনের জন্য। তাহাদের ভাতের ফ্যানও গালা হয়; বাকী ভাতের সহিত সমস্ত ফ্যানটা মিশাইয়া একটু নুন দিয়া কল্যাণী ও তাহার ভাই বোনেরা খায়। তাও পরিমাণে যে পর্যাপ্ত নয় তাহা ছেলেমেয়েগুলির

অপরিসীম কৃশতার দিকে চাহিলেই বোঝা যায়।

ভূপেনের হাতে যে টাকা ছিল তাহাতে কিছু কিছু বাজার-হাট সে করিতে পারিত কিন্তু কলিকাতা হইতে আসিয়া দীর্ঘ দিন এখানে থাকিবার ফলে মানুষের বড় অভাব কোন্‌টা তাহা সে বুঝিতে শিখিয়াছিল। তাই কোন প্রকার রসনা-তৃপ্তির আয়োজন না করিয়া সে একেবারে মণ-দুই চাল ও সব চেয়ে সস্তা যে ডাল—খ্যাসারি ও মটর, তাই দশ সের হিসাবে কিনিয়া দিল। কল্যাণী কী একটা মৃদু অনুযোগ করিতে গিয়াও চাপিয়া গেল। আজ হউক কাল হউক যখন এই লোকটির কাছে হাত পাতিতেই হইবে তখন আর সংকোচ করিয়া লাভ কি। তবু সে পুরা একটি দিন কিছুতেই যেন আর ভূপেনের চোখের দিকে চাহিতে পারিল না।

কল্যাণী তাহাকে পড়াশুনা সম্বন্ধে যে আশ্বাস দিয়াছিল, তাহা পুরাপুরিই সে মিলাইয়া পাইল। একটা ঘর সম্পূর্ণ ভূপেনকে ছাড়িয়া দিয়া তাহারা সকলে অপর একখানি ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল। তা ছাড়া সকালে ও সন্ধ্যায় ভূপেনের পড়াশুনার সময় কোন ভাই-বোন না ঘরে ঢোকে কিংবা ঘরের সামনে না চেঁচামেচি করে, সেদিকেও কল্যাণীর প্রখর দৃষ্টি থাকিত। তাহার ছোটখাটো যত্ন এবং সেবার ত তুলনাই হয় না। ভূপেন চিরদিন আরাম-প্রিয়, চিরকাল বোনদের কাছ হইতে সেবা লওয়াই তাহার অভ্যাস; তবু তাহার মনে হয় এ সেবার তুলনা নাই। শান্তি খুবই বুদ্ধিমতী—কিন্তু তাহাকেও ইচ্ছাটা মধ্যে মধ্যে জানাইতে হইত কিন্তু কল্যাণী প্রত্যেকটি কাজ তাহার মন বুঝিয়া আগে হইতে করে। এমন কি, দূরে থাকিয়াও যেন সে বুঝিতে পারে কখন কি প্রয়োজন ভূপেনের হইবে। এই দেবতার মত সেবায় সে একটু সংকোচ অনুভব করে, বিশেষত একটি ব্যাপারে তাহার লজ্জা যেন দুর্নিবার হইয়া ওঠে—এ বাড়িতে জলখাবারের পাট কাহারও নাই কিন্তু কল্যাণী প্রাণপণ চেষ্টায় যেমন করিয়াই হউক, দুই বেলাই তাহার একটা কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। অতগুলি বুভুক্ষু বালকের মধ্যে বসিয়া মুড়ি খাইতেও যেন তাহার গলায় বাধে, অথচ উপায়ই বা কি? পর্যাপ্ত ভাতই যাহাদের কাছে বিলাস, তাহাদের সম্বন্ধে জলখাবারের কথা চিন্তা করাও বাতুলতা; তবু কল্যাণী এই পর্বটাব আগে সকলকে সরাইয়া দেয় এবং বরাবরই তাহার ঘরে খাবার পৌঁছাইয়া দিয়া আসে।

এমনি করিয়া ভূপেনের দিন রাত্রি কাটে, সুখে না হোক আরামে। কলিকাতার কথা যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শান্তি অনুযোগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া চিঠি লেখে—'কত দিন তোমাকে দেখি নি, মা রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেন। দুদিনের জন্য এলেও কি পড়ার ক্ষতি হ'ত? ঐ গরমে—শুনেছি বীরভূমের গরম কাশী-টাসীর চেয়েও বেশী—যদি অসুখ-বিসুখ করে?' ইত্যাদি। আর লেখে সন্ধ্যা—দুই-চার ছত্র চিঠি, তবে তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ সন্ধ্যারও কম নয়, 'অত গরম কি সহ্য করতে পারবেন? অসুখ-বিসুখ না হ'লেই বাঁচি'—এ ছাড়া অন্য কোন যোগসূত্রই নাই তাহার বাহিরের পৃথিবীর সহিত। স্কুল বন্ধ থাকায় বিজয়বাবুদের বাড়ি কেহ আসে না, সে-ও কাহারও সহিত

দেখা করিতে যায় না। রৌদ্রের তাপ এত বেশী যে, সকাল ন'টার পর আর বাহির হওয়া যায় না, এধারেও তাপ কমিতে কমিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। গ্রামে জলকষ্টও অত্যন্ত, বার বার ত নয়ই, একবার স্নান করাই কষ্টকর। প্রায় সব কুয়াতেই জল শুকাইয়া আসিয়াছে, একটি কুয়ায় কিছু জল জমে—সারা রাত ধরিয়া পাড়ার মেয়েরা সেই কুয়া হইতে জল সংগ্রহ করে, কল্যাণীও ছোট ভাইকে সঙ্গে করিয়া সেইখানে যায়, কোন দিন তিন বাল্‌তি কোন দিন বা দুই বাল্‌তি জল পায়। তাও এক-একদিন শেষের দিকে যাওয়ার জন্য কাদা ঘোলা থাকে, থিতাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। সুতরাং সে জলে স্নান করিবার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। নিকটেই একটি পুকুরে কিছু জল আছে—সেইখান হইতে পানা সরাইয়া কল্যাণী ঘড়া করিয়া জল আনিয়া দেয়—কোন মতে তাহাতেই একবার স্নান সারিতে হয়। সব বিলাসিতাই তাহার গিয়াছে, কিন্তু পুকুরে নামিয়া পানা সরাইয়া স্নান করিতে এখনও যেন কোথায় বাধে। অথচ এত কষ্টের তোলা-জলে দুইবার স্নান করিবার কথা ভাবিতেও লজ্জা হয়—সে অধিকাংশ সময়ই রৌদ্র ও ধুলা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া ঘরে বসিয়া থাকে, যাহাতে দ্বিতীয় বার স্নান করিবার প্রয়োজন না পড়ে।

দুপুরে খুবই গরম, তবে সকাল হইতে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঘরটাকে ঠাণ্ডা রাখা হয়। ফলে রৌদ্রের ঝাঁজটা আসে না বটে, ঘাম হয় অতিরিক্ত। তবু তাহারই মধ্যে ঘুম তাহার ভালই হয়। অবশ্য কেন যে হয়, সে কারণটা একদিন আবিষ্কার করিয়া সে দস্তুরমত লজ্জিত এবং শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সহসা একদিন কী কারণে ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গিয়া দেখিল যে, কল্যাণী তাহার তক্তপোশের পাশে দাঁড়াইয়া যতটা সম্ভব সন্তর্পণে এবং নিঃশব্দে বাতাস করিতেছে। ফলে ভূপেন আরামে ঘুমাইতেছে বটে কিন্তু কল্যাণী নিজে যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—আরে তুমি কি রোজ এমনি বাতাস করো নাকি? এ কি কাণ্ড! ছি, ছি, এ ভারি অন্যায়।

কল্যাণী লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া কহিল, না, না, রোজ নয়। এমন, হঠাৎ একটা কাজে এসে পড়েছিলুম, দেখলুম আপনার বালিশ-বিছানা ভিজে উঠেছে একেবারে, তাই—

সে আর দাঁড়াইল না, কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই এক প্রকার ছুটিয়া পলাইয়া গেল।...

সে অস্বীকার করিল বটে কিন্তু ভূপেনের বিশ্বাস, সে এমনি রোজই বাতাস করে আর সেই জন্যই এত গরমের মধ্যেও তাহার বেশ ঘুম হয়। পরের দিন সে সতর্ক হইয়া শুইয়া রহিল, খানিকটা ঘুমের ভান করিয়াও রহিল—কিন্তু সেদিন আর কল্যাণী আসিল না। ধরা পড়িয়া যথেষ্ট লজ্জা পাইয়াছে মনে করিয়া ভূপেন নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু তিন চার দিন পরে আবার একদিন কী একটা শব্দে সহসা জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, কল্যাণী তেমনি দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছে। তাহার যে ঘুম

।

ভাঙ্গিয়াছে কল্যাণী বুঝিতে পারে নাই—ভূপেন সহসা তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া কহিল, রোজ রোজ এ কী অত্যাচার বলো ত। এমন করলে কিন্তু আমি আজই হোস্টেলে চলে যাব।

হাতটা ছাড়াইয়া লইবার খানিকটা বৃথা চেষ্টা করিয়া কল্যাণী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেন, কি করেছি।

—কী করেছ! একটা লোক আরামে ঘুমোবে, আর তুমি এই গরমে দাঁড়িয়ে বাতাস করবে। বা-রে!

কল্যাণী মাথা নিচু করিয়া কহিল, মানুষের জন্যে কি মানুষ করে না? আমার বাবা, ভাইদেরও ত আমি বাতাস করি, শুধু ত আপনাকে না।

ভূপেন নিজের কোঁচার খুঁট দিয়া তাহার ললাট ও কণ্ঠের ঘাম মুছাইয়া দিয়া জোর করিয়া কল্যাণীর হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া লইয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, বেশ তাহ'লে এখন আমি তোমাকে খানিকটা বাতাস করি, তুমি ঘুমোও—

কল্যাণী প্রাণপণে তাহার মুঠির মধ্য হইতে নিজের হাতটা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, ওমা, ও কি! ছি, ছি, ছাড়ুন—ওতে যে আমার পাপ হয় —ছি, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—

—কেন?—বিদ্রুপের সুরে ভূপেন কহিল, মানুষের জন্যে কি মানুষ করে না?

দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া বাঁকিয়া চুরিয়া কোনমতে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কল্যাণী ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ভূপেন হাসিয়া পিছন হইতে ডাকিয়া কহিল, মনে থাকে যেন!

ইহার পর তিন-চার দিন ভূপেন একেবারেই দুপুরে ঘুমাইল না। এত গরমে আহারের পর অন্ধকার ঘরে চোখ আপনিই বুজিয়া আসিতে চায়—রাজ্যের ঘুম আসিয়া যেন আক্রমণ করে কিন্তু তবু ভূপেন বহু চেষ্টা করিয়া জাগিয়াই রহিল। সে বুঝিয়াছিল যে, ঘুমাইয়া পড়িলেই কল্যাণী আবার অমনি বাতাস করিতে আসিবে। তাহার কষ্ট হইতেছে কল্পনা করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবে না।...কল্যাণীর এই নিঃশব্দ সেবায় সে মুগ্ধও হয় বৈকি।...এখানকার এই সহস্র অসুবিধা, দারিদ্র্যের বীভৎস নগ্ন রূপের মধ্যেও এক-এক সময় যে তাহার মনে হয় 'বেশ আছি'—ইস্কুলের ছুটি ফুরাইয়া আসিবার কথা মনে পড়িলে মনটা খারাপ হইয়া যায়, এখান হইতে নড়িতে ইচ্ছা করে না—তাহার মূলেও আছে একমাত্র এই মেয়েটিরই অক্লান্ত এবং সজাগ সেবা, সে কথা ভূপেন আর নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারে না। কল্যাণীর অন্তরের সমস্ত চিন্তা যে তাহার দিকে একাগ্র হইয়া আছে, সে কথা মনে করিয়া হয়ত শঙ্কিত হওয়ারই কথা কিন্তু সে যেন কেমন একটা পুলকও অনুভব করে। এই পূজার মধ্যে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিবার যে কারণ আছে, তাহা পৌরুষের অহঙ্কারে সুড়সুড়ি দিয়া মনে মনে যেন নেশার আমেজ ধরাইয়া দেয়। তবু মনের দুর্বলতার চেয়ে কর্তব্যবুদ্ধিই প্রবল হইল, সে আর কিছুতেই দুপুরে ঘুমাইয়া এই ঘটনার পুনরা-

বৃত্তির সুযোগ দিবে না স্থির করিল। নিজের দৈহিক আরামের জন্য অপরকে এত কষ্ট দিবার তাহার অধিকার নাই, তা হউক না কেন সে কষ্টস্বীকার স্বতঃ· প্রবৃত্ত!

তবে দুপুরের ঘুমটা ছাড়িয়া দিয়া অসুবিধা হইল এই যে, মোটের উপর ঘুমটাই তাহাকে কমাইয়া দিতে হইল। কারণ, রাত্রে গরমটা তাহার বেশী লাগিত বলিয়া অনেকখানি সময়েই তাহাকে এপাশ-ওপাশ করিয়া, হাওয়া ও জল খাইয়া জাগিয়া থাকিতে হইত—সে ঘুমটা আগে পোষাইয়া লইত দুপুরে। রাত্রে বাকী সকলেই বাহিরের দাওয়ায় শোয়, কিন্তু তাহাকে কিছুতেই কল্যাণী বাহিরে থাকিতে দেয় না। এ দেশে গরমে নাকি ভয়ানক সাপের উপদ্রব হয়—কল্যাণী তাহার বাবা ও ভাইদের হাতে শ্বেত করবীর ডালের মাদুলী করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সাপের ভয় থাকে না, কল্যাণীর অন্তত তাই বিশ্বাস। ভূপেন মাদুলী পরিতে কোনমতেই রাজী হয় নাই—কল্যাণীও তাহাকে বাহিরে শুইতে দেয় নাই। একমাত্র সে-ই ঘরে চৌকির উপর শয়ন করিত। ফলে তাহার কষ্ট হইত সব চেয়ে বেশী। আর এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়াই সে-দিন এক অঘটন ঘটিয়া গেল—

ভূপেন যখন পড়াশুনা বন্ধ করিয়া শোয়, কল্যাণীর জল-তোলা তখনও শেষ হয় না বলিয়া—তাহার ঘরের দরজা খোলাই থাকিত। কাজ সারা হইলে কল্যাণী এ দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দু'টি ঘরের মধ্যবর্তী দরজা দিয়া ওঘরে যাইত এবং ও-ঘরের কপাটে বাহির হইতে তালা লাগাইয়া সে পিসীমার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িত। প্রতিদিনই এই ব্যাপার চলে বলিয়া ভূপেন ইদানীং আলোও নিভাইত না, সে কাজটাও কল্যাণী সারিয়া চলিয়া যাইত। আগে আগে ভূপেন তখনও জাগিয়া থাকিত প্রায়ই, কল্যাণী চলিয়া যাইবার সময় হয়ত দু'একটা কথাও কহিত—কিন্তু এখন দিনের বেলা ঘুমটা বাদ দেওয়ার ফলে প্রথম রাত্রিতে যত গরমই থাক্ সে ঘুমাইয়া পড়ে খুব তাড়াতাড়ি। এদিনও সে ঘুমাইতেছিল অগাধেই—কল্যাণীর আগমন তাহার টের পাইবার কথা নয় কিন্তু হঠাৎ কি কারণে তন্দ্রার ঘোরটা কাটিয়া গেল; চৈতন্য ফিরিতে সে চোখ বুজিয়া বুজিয়াই অনুভব করিল যে ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে—তখন ধীরে ধীরে চোখ খুলিতে প্রথমেই নজরে পড়িল তাহার বিছানার অত্যন্ত কাছে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে কল্যাণী। হয়ত কাজ সারা হইয়া গিয়াছে—আলোটা নিভাইবার জন্য এখানে আসিয়া ঘুমন্ত ভূপেনের দিকে চাহিয়া থাকিবার লোভটা সামলাইতে পারে নাই। তাহার চমকিয়া উঠিবারই কথা কিন্তু কী একটা অদ্ভুত কারণে ভূপেন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, এমন কি সে যে জাগিয়া চোখ মেলিয়াছে, সে কথাটাও প্রায়-নিবন্ত লণ্ঠনের অল্প আলোয় কল্যাণী বুঝিতে পারিল না। আরও মুহূর্ত কয়েক তেমনি চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে নিঃশব্দে আরও খানিকটা কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া আঁচলের কাপড় দিয়া সন্তর্পণে তাহার কণ্ঠ-ললাট-বুক মুছিয়া লইল।

লণ্ঠনের আলো সামান্যই, ভূপেনের চক্ষুও অর্ধ নিমীলিত, তবু সে মুহূর্তে ঐ মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার যেন বহুদিন পূর্বের দেখা কোন্ এক

স্বপ্নের কথাই মনে পড়িয়া গেল। বোধ করি অর্ধাশনক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে সেবা ও প্রেমের একটি অনির্বচনীয় দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়া তাহার সেই অতি-সাধারণ মুখকেও রমণীয় ও লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। আত্মনিবেদনের এই গোপন এবং নিঃশব্দ প্রকাশে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভূপেনের মাথায় যেন সব গোলমাল হইয়া গেল—তাহার যাহা কিছু শিক্ষা, সংস্কার, আদর্শ সব যেন একাকার হইয়া আবেগের বন্যায় কোথায় ভাসিয়া তলাইয়া গেল ; সে সহসা কল্যাণীকে দুই হাতে ধরিয়া বুকের উপর টানিয়া লইল।

ঘটনাটা এমনই অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য, আর অতর্কিত যে, কল্যাণী ত বাধা দিতে পারিলই না—ব্যাপারটা অনুভব করিতেই তাহার একটু দেরি লাগিল। তাছাড়া যে বস্তু ছিল তাহার সুদূরতম কল্পনায় দুঃসাহসিক স্বপ্ন হইয়া—সেই প্রিয়তমের আকস্মিক স্পর্শ—কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে বিহ্বল করিয়া দিল। সে তাই ভূপেনের বুকের উপর তেমনিই পড়িয়া রহিল। এমন কি, অন্তর যে তাহার কাজ আপনিই করিয়া যাইতেছে, বহু দিনের বেদনা যে দয়িতের স্নেহের স্পর্শে অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই—একেবারে সম্বিৎ ফিরিল ভূপেনের তপ্ত চুম্বন যখন তাহার সমস্ত দেহে বিদ্যুতের শিহরণ সঞ্চারিত করিয়া দিল। সে অস্ফুটকণ্ঠে 'মা গো !' বলিয়া একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া সবেগে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

॥ ২০ ॥

তাহার পরদিন ভূপেন আর কিছুতেই মুখ তুলিয়া কল্যাণীর দিকে চাহিতে পারিল না। শুধু যে একটা অন্যায় করিয়াছে সে জন্যই নয়—কাজটার বহুদূরপ্রসারী ফলাফল চিন্তা করিয়াও বটে। দরিদ্রের রূপহীনা কন্যার মনে যে আশা কখনও জাগিত না, জাগিতে সাহস করিত না—যে অনুরাগ শুধু মাত্র থাকিত একতরফা, যাহার কোন প্রতিদান না পাইলেও আশাভঙ্গের বেদনা সহ্য করিতে হইত না—সেই আশা ও অনুরাগকে অকারণে প্রশ্রয় দিবার কোন অধিকার পর্যন্ত তাহার নাই। কল্যাণীও লজ্জায় সঙ্কোচে প্রাণপণে সারাদিন তাহাকে এড়াইয়া চলিল। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগেই ভূপেন বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া, সাময়িক ভাবে অন্তত, এই দুর্নিবার লজ্জা ও আত্মগ্লানির হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। যাইবার সময় শুধু রাখুকে বলিয়া গেল, আমি সালেকদের বাড়ি যাচ্ছি, রাত্রে আর ফেরা হবে না।

সালেকদের বাড়ি নিশ্চয় একদিন যাইবে, কথা দিয়াছিল ; কিন্তু এতদিন একটা সুগভীর আলস্য ও আরামে এমনই জড়ত্বের মধ্যে দিন কাটিয়াছে যে, যাই-যাই করিয়াও কিছুতেই যাওয়া ঘটিয়া ওঠে নাই। এধারে ছুটিরও এক মাস কাটিয়া গিয়াছে, আর চার-পাঁচ দিন বাদেই স্কুল খুলিবে, এখন আর না গেলে প্রতিশ্রুতিটা রাখা যায় না। সুতরাং সেজন্যও কতকটা তাহাকে মরীয়াভাবে বাহির হইতে হইল।

সালেক এতদিনে আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিল, সহসা ভূপেনকে দেখিয়া সে প্রায়

নাচিতেই শুরু করিয়া দিল। গফুর মিঞাও যথেষ্ট ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—তখনই হিন্দুপাড়া হইতে লুচি ভাজাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিলেন; ঘরে শুরু গরু দুইয়া ক্ষীর হইল অর্থাৎ তাহার জাতিটা রক্ষা করা চাই-ই। এমন কি তাহার স্নানের জল পর্যন্ত তিনি হিন্দুকে দিয়াই তোলাইয়া দিলেন।

আহারাদির পর বাহিরেই চৌকি পাড়ল। সেদিনও সালেক আসিয়া বসিয়াছিল—তাহার পদসেবা করিতে। কিন্তু ভূপেন তাহাকে পায়ে হাত দিতে দিল না, জোর করিয়া কাছে টানিয়া আনিল। তারপর চলিল গল্প—অধিকাংশ লেখাপড়ার কথা। সালেক কি কি পড়িয়াছে এই ছুটির মধ্যে, কোন্‌টি কোন্‌টি বুঝিতে পারে নাই—তাহারই বিবরণ। শেষ পর্যন্ত উৎসাহের আতিশয্যে রাত দুটা নাগাদ সালেক উঠিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া এবং বই-খাতা লইয়া রীতিমত পড়িতে বসিল। একেবারে যখন দুজনেরই হুঁশ হইল তখন পূর্বাকাশ রীতিমত লাল হইয়া উঠিয়াছে। সালেক একটু লজ্জিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল কিন্তু তখন আর নূতন করিয়া ঘুমাইতে ইচ্ছা হইল না ভূপেনের, সে একেবারে মুখ-হাত ধুইয়া বিদায় লইল।

বিজয়বাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া তাহার তখনও লজ্জাই বোধ হইতেছিল; কিন্তু কল্যাণী আজ তাহার সহিত সহজভাবেই কথাবার্তা বলিল। স্নানের ব্যবস্থা করা, জলযোগের আয়োজন—সবই নিত্যকার মত চলিতে লাগিল, যেন কোথাও কোন সংকোচের কারণ ঘটে নাই। বোধ হয়, সে মনে করিয়াছিল যে, তাহার আগের দিনের অপ্রতিভ ভাবটাই ভূপেনকে বাড়িছাড়া করিয়াছে, সেই জন্য আজ সে জোর করিয়াই সহজ হইল।

ভূপেনেরও ক্রমে ক্রমে লজ্জাটা কাটিয়া গেল, যদিও রাত্রে সে অত্যধিক গরমের অজুহাতে কল্যাণীর কোন নিষেধ না শুনিয়া, একরকম জোর করিয়াই, বাহিরে বিজয়বাবুর পাশে শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইল।

চার-পাঁচদিনের মধ্যেই ছুটি শেষ হইল, নূতন হেডমাস্টারও আসিয়া পেঁছাইলেন। এ ভদ্রলোকের নাম ললিতবাবু—ইঁহার বয়স বেশী না হইলেও ইতিমধ্যে অনেক ঘাটের জল খাইয়াছেন, ঘুরিয়াছেন বহু ইস্কুল। সে জন্য বিশ্বাস করেন না কাহাকেও, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও হুঁশিয়ার। তাহার উপর ভবদেববাবুর চাকুরি কেন গিয়াছে, সে খবরটা তিনি ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন, ফলে সতর্কতার মাত্রা আরও বাড়িয়াছে। অবশ্য বিশ্বাস যেমন পরকেও করেন না, তেমনি নিজের সহজ বিচার-বুদ্ধিকেও না। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই আগে আইন খুঁজিতে বসেন, অর্থাৎ ইস্কুলে কী নিয়ম চলিয়াছে এতদিন। যেখানে সে রকম কিছু খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, সেখানে সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করিয়া পাঠান; চারটি পয়সা খরচাও তিনি নিজের দায়িত্বে করেন না, একটি বেয়ারিং চিঠি রাখিবেন কিনা, একদিন এ অনুমতির জন্যও সেক্রেটারীর কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন।…শিক্ষকরা কর্মব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন।

সুতরাং বিপদ বাধিল তাঁহার সব চেয়ে ভূপেনকে লইয়া। তাহার ধরন-ধারণ, পড়াইবার পদ্ধতিও সব যেন নূতন, সেজন্য তাঁহার প্রথম প্রথম দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। পরে যখন জানিলেন যে, এ ব্যাপারে সেক্রেটারীর অনুমোদন আছে, তখন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, যদিও অস্বস্তিটা কিছুতেই গেল না। একদিন এই প্রসঙ্গে ভূপেন তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, ছাত্ররা পড়িতেই আসে এখানে, সে সম্বন্ধে শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেকখানি। পড়ানোটা কেমন করিযা ভাল হয়, সেইটাই সর্বাগ্রে দেখা প্রয়োজন তাঁহাদের, আর সেজন্য যদি নূতন কোন পদ্ধতি ভাল বলিয়া মনে হয় কিম্বা সেটার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান ত, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে ক্ষতি কি? কিন্তু ললিতবাবু দায়িত্বটা ষোল আনা মানিয়া লইলেও নূতন কোন পথ পরীক্ষা করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে, এ কথাটা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, সেখানে কোন যুক্তিই তাঁহাকে ভূপেনের সহিত একমত করিতে পারিল না। যুক্তির জবাব দিতে পারেন না এটাও যেমন ঠিক, তেমনি কথাটা যে মানিয়া লইতে পারেন না এটাও ঠিক। বহু দিনের অনভ্যাসে তাঁহার বিচার-বুদ্ধি যেন একেবারেই অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে। মন কোন কাজকে সঙ্গত মনে করিলেও সেটাকে করিতে সাহস করেন না, যতক্ষণ না উপরওয়ালাদের কাছ হইতে অনুমোদন আসে। তাঁহার সেই এক বুলি, ভাল-মন্দ বুঝিনে মশাই, যা চলে আসছে, তাই চলুক। কী দরকার অত ঝামেলায়?

এটা যদি শুধু তাঁহার নিজেরই সব কাজে প্রযোজ্য হইত ত ভূপেন অতটা উদ্বিগ্ন হইত না। সে এতদিনের চেষ্টায় অন্য মাষ্টার মহাশয়দের শিক্ষকতার দায়িত্ব সম্বন্ধে কতকটা সচেতন করিয়া আনিয়াছিল, এখন আবার তাঁহারা গা ঢালিয়া দিলেন। তাঁহাদের যুক্তিও প্রায় অকাট্য, আমাদের ওপরও'লা যদি আমাদের কাছে ফাঁকিই চায় ত, কি দরকার ভাই বেশী পরিশ্রমে?

একা ভূপেন প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজের কর্তব্য পালন করিতে কিন্তু মনে মনে একটা ক্লান্তি, একটা হতাশাও যেন অনুভব করে। মনে হয়—হয়ত এ অসম্ভব, এদেশে আর কিছুতেই কিছু করা যাইবে না।

এধারে সহসা আর এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রামটি খুবই ছোট বলিয়া এখানে কোন বেশ্যা-পল্লী ছিল না। সহসা আষাঢ়ের শেষের দিকে দুই ঘর হাড়ি আসিয়া ইস্কুলের ওধারের ডাঙ্গাটায় ঘর বাঁধিতে শুরু করিল। ভূপেন এসব খবর কিছুই জানিত না, সংবাদটা দিলেন পণ্ডিতমশাই। এ অঞ্চলে নাকি এই ডোমপাড়া বা হাড়িপাড়া এক সাংঘাতিক স্থান। ইহারা গৃহস্থের মত সংসারও করে আবার ইহাদের স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্যেই বেশ্যাবৃত্তি করে। এখানকার অপেক্ষাকৃত বর্ধিষ্ণু গ্রাম যে সব, সেখানকার বহু কিশোর এবং তরুণেরই নাকি বহু সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে এই হাড়িপাড়ায়। শুধু যে নৈতিক সর্বনাশ হইয়াছে তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দৈহিকও। এমন সব কুৎসিত ব্যাধি ইহাদের কাছ হইতে আসে, যাহার আর কোন চিকিৎসাও সম্ভব হয় না—ফলে বংশপরম্পরায় নানা রকমের রোগ ও অকালমৃত্যু চলিতে থাকে।

সব সংবাদ ও তথ্য শেষ করিয়া রাধাকমলবাবু শুষ্ক মুখে বলিলেন, তোমার

এত শখ ভাই ছেলেদের মানুষ ক'রে তোলবার, কিন্তু আর বোধ হয় পারলে না। এই যা ঘা, এতেই সব যাবে।...

ভূপেন উত্তেজিত হইয়া কহিল, কিন্তু এর একটা ব্যবস্থা করবেন না আপনারা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সর্বনাশটা দেখবেন?

—কি করবো ভাই? আমি একা কি করতে পারি? তাছাড়া শহর বাজারের তারাই পারলে না কিছু করতে—তা আমরা—

ভূপেন হেডমাস্টারের কাছে গেল। কহিল, এর একটা বিহিত করবার চেষ্টাও করবেন না স্যার। এমন একটা কাণ্ড বিনা-বাধায় ঘটবে?

ললিতবাবু বলিলেন—বিলক্ষণ। একে আমি নতুন লোক, তায় মাস্টার। মাস্টারদের কথা কি কেউ শোনে মশাই? কেউ শোনে না। আর ওরা ঘর বাঁধছে অত দূরে, আপনার ছাত্রদের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক বলুন। আপনারাই না হয় একটু সাবধানে থাকবেন।

ভূপেন তবুও যখন জেদ্ করিতে লাগিল তখন তিনি পরিষ্কারই বলিলেন, ওসব আমার দ্বারা হবে না মশাই, সাফ কথা। আমি এসেছি চাকরি করতে—সোস্যাল রিফর্ম করতে ত আসি নি। কার এত দায় যে ঐ সব ক'রে বেড়াব এখন। আর তাছাড়া কেউ যে কাজ করতে পারলে না, আমি কী এমন মহাবীর যে সেই গন্ধমাদন ধারণ করব।

তার পর একটু থামিয়া যেন ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, সেক্রেটারী ত আপনার হাত-ধরা, তাঁকেই বলুন না?

—তাঁকেই বলব।—সংক্ষেপে উত্তর দিয়া ভূপেন চলিয়া গেল। কাছেই ছিলেন অপূর্ববাবু, হাসিয়া কহিলেন, ওরা কলকাতার ছেলে মাস্টার মশাই, ওরা সব পারে। দেখুন না, আপনাকেই শাসিয়ে গেল। 'সেক্রেটারীকে বলব' কথাটার মানে বুঝলেন না?

অপূর্ববাবু আবার মিষ্টভাবে হাসিলেন।

শুধু একটা 'হুঁ' বলিয়া ললিতবাবু মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

সেক্রেটারীর কাছে কথাটা পাড়িতে তিনি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। কহিলেন, মশাই, যত ঝঞ্ঝাট কি আপনাকে নিয়ে। আমার ও ডাঙ্গাটা অনেক দিন ধরে পড়ে ছিল—ভাবলুম যাহোক দু'ঘর প্রজা বসল। তা ছাড়া ওরা যেখানে থাকে দু-এক ঘর থাকে না, দেখতে দেখতে আরও দু-চার ঘর এসে পড়বে। আমার আয় বাড়ল এই কথাই ভাবছি, তা আপনি আবার সেখানেও এলেন বাগড়া দিতে।

ভূপেন কহিল, কিন্তু আপনার আয় ওতে সামান্যই বাড়বে, অথচ কতগুলো ছেলের সর্বনাশ হ'তে পারে একবার ভেবে দেখুন দিকি। আমি ত এখানে নতুন লোক, কিছুই জানি না, কিন্তু আপনি ত সব খবর রাখেন—কত ছেলের ইহকাল পরকাল ওরা নষ্ট ক'রে দিয়েছে, আপনিই বলুন।

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সেক্রেটারী জবাব দিলেন, তা অবশ্য বটে। অতটা আমি ভেবে দেখি নি। ওরা ত প্রায় সব জনবসতির ধারেই থাকে, যারা নষ্ট হবার তারাই হয়—যারা ভাল থাকবার তারা ঠিকই থাকে, এই কথাই ভেবেছিলুম। …আমারই এক শালীর ছেলে মশাই, fine young man, বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে, অগাধ বিষয়। ইস্কুলে পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়েছিল, বৌও খুব সুন্দরী —অথচ কলেজে পড়বার সময় কী যে দুর্মতি হ'ল, দু-তিনজন বদ্ বন্ধুর সঙ্গে হাড়িপাড়ায় যেতে শুরু করলে। ব্যস্।…বছর তিনেক ভুগে মারা গেল। কত পয়সা খরচ করা হ'ল—কিছুতেই কিছু হ'ল না। বোলপুর শহরে তিন মহল বাড়ি খাঁ খাঁ করছে—শুধু দুটি বিধবা থাকে।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু এসব জেনেও এই সর্বনাশ করবেন আপনি?

—তাই ত। সেক্রেটারী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু দলিল-টলিল সব হয়ে গেছে, তা-বাদে আমার ত একলার জমি নয়, অন্য সরিকরাও আছেন, এখন কি আর কিছু করা সম্ভব হবে?

কিছু একটা করতেই হবে আপনাকে। দুই হাত জোড় করিয়া ভূপেন কহিল, দোহাই আপনার! আমার নিজের দেশ নয়, আজ আছি কাল হয়ত থাকব না, কিন্তু এ আপনারই ত দেশ, আপনারও ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের কথা ভাবুন।

আরও বার-কয়েক শুধু 'তাই ত' বলিয়া একসময় সেক্রেটারী উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন, দেখি, কি করতে পারি। একবার এস-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে, যা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আপনি যান, যা হয় একটা কিছু করা যাবে।

উজ্জ্বল মুখে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদটা দিতে ললিতবাবুর কালিমাখা মুখে কে যেন আরও খানিকটা কালি মাড়িয়া দিল। তিনি কোন কথাই কহিলেন না, শুধু অপূর্ববাবু জবাব দিলেন, দুর্নীতি আর কত বাঁচাবেন ভূপেনবাবু! আমাদের সকলেরই ত ঐ অবস্থা। সমাজের চারিদিকেই ঘুণ ধরেছে। বলি, ভদ্র-লোকের বাড়ির মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করার চেয়ে ত বেশ্যাবাড়ি যাওয়া ভাল। কি বলেন আপনি?

অপূর্ববাবু শেষের কথাগুলি বলিয়া যেন কী এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার এই বক্রোক্তির ঠিক অর্থটা না বুঝিলেও অকস্মাৎ ভূপেনের সর্বাঙ্গে যেন কে বিষ ছড়াইয়া দিল, সে আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া কহিল, তাই বা জোর ক'রে বলি কি ক'রে বলুন। ওতে অন্তত রোগের হাত থেকে ত বাঁচা যায়। কিন্তু এসব প্রসঙ্গ থাক্—খারাপ যা তার সবটাই খারাপ, প্রয়োজন হ'লে সবটার সঙ্গেই লড়াই করতে হবে।

সে আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সোজা হোস্টেলের পথ ধরিল।

অপূর্ববাবুর বাঁকা মন্তব্যের সোজা অর্থটা বোঝা গেল কয়েক দিন পরেই।

ছুটির পর হোস্টেলে ফিরিয়া আসিলেও ভূপেন প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই বিজয়-বাবুদের বাড়ি যাইত এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া গল্প-গুজব করিত। ইতি-মধ্যে মাহিনার টাকা পাইয়া উঁহাদের আরও কিছু চাল-ডাল-আটা কিনিয়া দিয়াছে

সে। এবারও কল্যাণী কোন আপত্তি করে নাই ; কারণ, করিবার উপায় নাই তাহা সে ভাল করিয়াই জানে, শুধু মাথাটা তাহার আরও নত হইয়া গিয়াছে মাত্র।

অর্থাৎ এক কথায় ইহাদের পরিবারের সম্পূর্ণ ভারই সে নিজের হাতে তুলিয়া লইল। যদিও তাহার ফলে বাড়িতে সে যে টাকা পাঠাইত তাহার পরিমাণটা অত্যন্ত কমিয়া যাওয়াতে, সেখান হইতে পিতৃদেবের অত্যন্ত কড়া এবং করুণ চিঠি আসিয়া তাহাকে বিব্রতই করিয়া তুলিয়াছে। এসব ক্ষেত্রে স্বভাবতই মনে পড়ে সন্ধ্যার কথা, কিন্তু ধনী-দুহিতা সন্ধ্যার চিঠি আজকাল সংখ্যায় ও আকারে এতই কমিয়া আসিয়াছে যে, সে চিন্তাটা শুধু অভিমান নয়, ব্যথারও কারণ হইয়া উঠিয়াছে ভূপেনের কাছে। তাই সে সন্ধ্যার চিঠিতে সে কথাটার আভাস পর্যন্ত দেয় না।

সে যাই হোক্—সে দিনও ছুটির পর সে অভ্যাস-মত বিজয়বাবুর বাড়ি উপস্থিত হইল। কিন্তু আজ আর বিজয়বাবু অন্য দিনের মত কলরব করিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন না—বরং অভ্যর্থনার বাণী উচ্চারণ করিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন করুণ ও গম্ভীর শোনাইল। শুধু তা-ই নয়, অন্য দিন তাহার গলা পাইলেই কল্যাণী ছুটিয়া আসে—চা করিয়া দিবার চেষ্টা করে, হাসিতে, গল্পে মুখরিত হইয়া ওঠে, কিন্তু আজ কোথাও তাহার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। সে-যে ইচ্ছা করিয়াই বাহির হইল না—এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল।

অর্থাৎ কিছু একটা ঘটিয়াছে। কিন্তু সেটা যে কি তাহা কিছুতেই সে অনুমান করিতে পারিল না। শেষে বিজয়বাবুর সহিত মিনিট-কয়েক গল্প জমাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া একসময় সে সোজাসুজি প্রশ্ন করিল, কল্যাণীকে দেখছি না কেন ? তার অসুখ-বিসুখ করে নি ত ?

—না-না। বিজয়বাবু যেন মুহূর্ত কয়েক ইতস্তত করিলেন, তাহার পর উত্তর দিলেন, ভালই আছে, রান্না করছে বোধ হয়।

—দেখি তার ব্যাপার কি। এতক্ষণের মধ্যে একবারও তার টিকি দেখা গেল না—এত কী রান্না করছে সে।

ভূপেন উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াইল। উনানে কিছুই নাই—কিন্তু তাহারই সামনে স্তব্ধ হইয়া নতমুখে বসিয়া আছে কল্যাণী। দরজার দিকে পিছন ফেরা বলিয়া মুখটা দেখা গেল না বটে, তবু তাহার বসিয়া থাকিবার ভঙ্গিটাই যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ভূপেন আশা করিয়াছিল, তাহার পদশব্দে কল্যাণী নিজেই মুখ তুলিয়া চাহিবে কিন্তু মিনিট দুই দ্বারপথে দাঁড়াইয়া থাকিবার পরও যখন ও পক্ষ হইতে কোন সাড়া মিলিল না, তখন সে নিজেই ডাকিল, কল্যাণী।

কল্যাণী যেন সে ডাকে একবার শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু মাথাও তুলিল না কিংবা সাড়াও দিল না।

ভূপেন পুনশ্চ ডাকিল, কী হয়েছে কল্যাণী ?

তবুও কোন সাড়া নেই।

এতক্ষণে ভূপেনের সন্দেহ হইল যে কল্যাণী নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে তখন জুতা খুলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পিছন হইতে জোর করিয়া তাহার মুখখানা

তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। দেখিল, তাহার অনুমানই ঠিক, বহুক্ষণ রোদনের ফলে কল্যাণীর শীর্ণ মুখখানি প্লাবিত হইয়া বুকের আঁচল পর্যন্ত অনেকখানি ভিজিয়া উঠিয়াছে। এতখানি বেদনার কি এমন কারণ ঘটিতে পারে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কতকটা হতভম্বের মতই ভূপেন প্রশ্ন করিল, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না কল্যাণী, কি হয়েছে বলবে না? কোন বিপদ-আপদের খবর এসেছে কি?

কল্যাণী যেন কি একটা উত্তর দিতে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার কণ্ঠ ভেদিয়া কোন স্বরই বাহির হইল না, বরং এই চেষ্টাতেই সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অকস্মাৎ সেই মেঝের উপরই লুটাইয়া পড়িয়া ভূপেনের দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

ভূপেন বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল; কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল, ছি, ছি, কল্যাণী, লক্ষ্মীটি, অমন ক'রে কাঁদে না। তুমি ত অত দুর্বল নও, তুমি এমন ছেলেমানুষি করলে চলে কি ক'রে? বলো আমায় কি হয়েছে—খুলে না বললে যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ওঠো, লক্ষ্মীটি ওঠো—

অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া কল্যাণী উঠিয়া বসিল বটে কিন্তু একটি কথাও কহিতে পারিল না, মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে বিজয়বাবু যেদিকে বসিয়া ছিলেন, বাহিরের সেই দিকটা শুধু দেখাইয়া দিল।

ভূপেনও তাহার অবস্থা বুঝিয়া আর পীড়াপীড়ি করিল না, সান্ত্বনা দিবারও বৃথা চেষ্টা করিল না, ফিরিয়া আসিয়া বিজয়বাবুরই চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিল, ব্যাপার কি বলুন ত? কি হয়েছে? কল্যাণী ছেলেমানুষ, সে বলতে পারলে না, কিন্তু আপনিও যদি ইতস্তত করেন তাহলে চলে কি ক'রে?

তবুও বিজয়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, ভাই, এ কথাটা মুখ দিয়া উচ্চারণ করার আগে মৃত্যু হওয়াই ভাল ছিল বোধ হয়, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই বড়, তিনি মৃত্যু না দিলে ত মরতে পারব না।

তারপর আর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, তোমার কাছ থেকে আর কোন সাহায্য নেওয়া ভাই আমাদের সম্ভব হবে না। এতে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি যা হচ্ছে সে আশংকার চেয়ে বড় আশংকা আমার এই যে, তুমি আমাদের কত না অকৃতজ্ঞ ভাববে কিন্তু তবু এইটেই বলতে হ'ল।

ভূপেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কথাটা যে এই দিক ঘেঁষিয়া যাইবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। তাহার অপরাধী অন্তরে একটা কথা বার বার উঁকি মারিতে লাগিল, তবে কি সে-রাত্রের কথাটাই কোনমতে বিজয়বাবু জানিতে পারিয়াছেন? সে মুহূর্ত-কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু কেন তাও কি আমাকে বলতে পারবেন না? মনে হচ্ছে অন্যায়টা আমারই—অপারাধীর অপরাধের কথাটা না জানিয়ে শাস্তি দেওয়াটা কি উচিত?

—ছি ছি। বিজয়বাবু ব্যাকুলভাবে সোজা হইয়া বসিলেন, ও-কথা বলতে

নেই ভাই। তোমার পক্ষে যে কোন অপরাধ করা সম্ভব নয় তা আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না।...সে বড় নোংরা কথা ব'লেই বলতে চাই নি—যাঁরা বলেছেন তাঁরা হয়ত সত্য ব'লে বিশ্বাস করেন ব'লেই বলেছেন, তবু সে কথাটা নোংরাই। ...পাড়ায় নাকি কথা উঠেছে—পাড়ায় কেন সমস্ত গ্রামেই—যে আমি, আমার কন্যাকে বেচে খাচ্ছি। এর চেয়ে মৃত্যু যে অনেক ভাল ভাই!

অসহায়ভাবে অন্ধ চোখ দুইটি মেলিয়া বিজয়বাবু চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার দুই চোখের কোল বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে, যেন চুপি চুপি কহিলেন, আমার জন্য ভাবি না, এমন কি কল্যাণীর জন্যেও না—কিন্তু তোমার মত দেবতার গায়েও যদি কালি লাগে ত সইব কেমন ক'রে? তোমার সাহায্যের যদি এই কদর্থ হয়—। শুনেছি আমার সহ-কর্মীরাও এই কথা বিশ্বাস করেন, কেমন ক'রে তা সম্ভব হ'ল তাই ভাবছি।

তাঁহার ভগ্ন-কণ্ঠ যেন একেবারেই বুজিয়া আসিল, কিন্তু ভূপেনও কোন কথা কহিতে পারিল না। শুধু পায়ের যেখানটা তখনও কল্যাণীর অশ্রুতে ভিজা, সেখানটায় যেন একটু বেশী রকমের হিম হিম বোধ হইতে লাগিল। এসব কথা কাহাকেও বলিবার নয়, অন্য লোকে কল্পনা পর্যন্ত করিতে পারিবে না, কিন্তু কল্যাণীর এই কান্নার সম্পূর্ণ অর্থটা তাহার বোধগম্য হইয়া ভূপেনকে কিছুক্ষণের জন্য যেন জড়, অনড় করিয়া দিয়া গেল।

সে বহুক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া থাকিবার পর কোনমতে শুধু প্রশ্ন করিল, আচ্ছা আমি যদি নিজে আর না আসি, অন্য কোন লোক মারফৎ কিছু পাঠাই তা'হলেও কি নিতে পারেন না?

অতি শান্ত কণ্ঠে বিজয়বাবু উত্তর দিলেন, না ভাই, তাতে ক'রে আমি তোমার কাছে নিজেকে অপরাধী বোধ করব। সেটা অন্যায় হবে।

একবার ভূপেনের মনে হইল, সে প্রশ্ন করে, তাহলে উপায়? কিন্তু পরক্ষণেই সে প্রশ্নের মূঢ়তাটা নিজের কাছেই ধরা পড়িয়া যাওয়াতে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া গেল। বিজয়বাবু নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানকে দেখাইয়া দিবেন।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে এক সময়ে উঠিয়া পড়িল।

॥ ১২ ॥

এত তাড়াতাড়ি এমন একটা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা ভূপেন একবারও ভাবে নাই। বিজয়বাবু ঈশ্বরের উপর বরাত দিয়া যতটা সহজে নিশ্চিন্ত হইলেন, ততটা সহজে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে কৈ? প্রায় সওয়া একমাস ইঁহাদের ঘরে বাস করিয়া দারিদ্র্য ও অভাবের যে চেহারাটা সে দেখিয়াছে, তাহার পরও চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আর ইচ্ছা-পূর্বক মৃত্যুর মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া একই ব্যাপার। এক-একবার সে মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, সে ত কল্যাণীদের কেহ হয় না। সেও যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, তেমনি ভাবেই হয়ত আর কেহ আসিয়া পড়িবে, ভগবান কাহার মারফৎ কখন কি সাহায্য পাঠান তা কে বলিতে পারে? কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। কেমন

যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়—কেমন যেন সর্বদা নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হয়। রোরুদ্যমান সেই শীর্ণ মুখে সেদিন যদি কোন অভিযোগ থাকিত, কোন ভর্ৎসনা থাকিত কিংবা কোন আশাও থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ভূপেনকে এতটা চঞ্চল করিতে পারিত না। অভিযোগের মধ্যে যে আশাভঙ্গের কথাটা আছে সেটুকু আশাও সে মেয়েটি রাখে না, সে জানে এটা কত অসম্ভব। ভূপেন তাহাকে লইয়া যদি আরও খানিকটা খেলা করিত তাহা হইলেও বোধ হয় কল্যাণীর মনে অন্য কোন সম্ভাবনা, কোন আশা দেখা দিত না; সে জানে এ আশা তাহার অন্যায়, এ কল্পনাও অসম্ভব। ভূপেন অনেক উঁচুতে, ভূপেন অনেক সুদূর—কল্যাণীর মত মেয়ের কোন তপস্যাই তাহাকে কোন দিন ধরিতে পারিবে না।…তাই সেদিন তাহার চোখে শুধু নিরতিশয় বেদনা ও দুঃখেরই একটা মর্মান্তিক অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই দুঃখই সে শুধু নিবেদন করিয়াছিল ভূপেনের পায়ে মাথা রাখিয়া—অবোধ, মূক এক প্রকারের দুঃখ, যাহা প্রতিকার খোঁজে না, দেবতার পায়ে নিবেদিত হইয়া নিশ্চিন্ত হয়।

উপায় অবশ্য আছে একটা। এই দুর্নামটাকে স্বীকার করিয়া লইয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিলে কোন কথাই কাহারও বলিবার থাকে না।

কিন্তু বিবাহ করা? এখন? ঐ মেয়েটিকে?

তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বলিয়া ওঠে—না, না, এ অসম্ভব। এ কখনও হইতে পারে না। এত তাড়াতাড়ি এ বন্ধন সে মানিয়া লইতে পারিবে না।

একদিন শিক্ষকতার কাজ সে লইয়াছিল নিতান্তই সাময়িকভাবে, উন্নতির পথে সোপান হিসাবে, কিন্তু আজ তাহার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়াছে, আজ বুঝিয়াছে যে ঈশ্বর বা অদৃষ্ট—যদি ঐ রকম কোন একটা শক্তি থাকে ত সেই শক্তিই তাহাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। তাহার দেশের, তাহার জাতির যত কিছু দৈন্য, যত কিছু ত্রুটির মূল কারণটা সে বুঝিতে পারিয়াছে, আসল গলদটা আর তাহার অজানা নাই। সেই ত্রুটি, সেই গলদ, জাতির যত কিছু অপমান ও দুঃখের সেই মূল কারণ দূর করাকেই সে তাহার জীবনের ব্রত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। হয়ত তাহার একার পক্ষে এ দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করা সম্ভব হইবে না—তবু যদি সে কিছুটাও করিয়া যাইতে পারে ত জীবন সার্থক হইয়া যাইবে। সাধারণভাবে বাঁচা ও সাধারণভাবে মরার অর্থ সে কোনও দিনই খুঁজিয়া পায় না। ছেলেবেলায় স্বপ্ন ছিল অন্য—খুব বড়লোক হইবে সে—হয় প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী নয়ত মহান্ দেশনেতা। ঐশ্বর্য ও যশ, এই ছিল তাহার স্বপ্নের চরম কথা। কিন্তু আজ সে ভাবে, যদি একটি ছেলেকেও সে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে—একটি ছেলেকেও যদি সে বুঝাইয়া দিতে পারে প্রকৃত শিক্ষা কি, মানুষের জীবনে আত্মসম্মান-বোধের মূল্য কতটা, আর পরাধীন দাস-জাতির আত্মসম্মান-জ্ঞান কী—তাহা হইলেই তাহার জীবন সার্থক হইয়া যাইবে। কারণ সেই যে একটি ছাত্র তৈয়ারী হইবে—সেই ত বীজ, আবার কত বীজের সম্ভাবনা সেই একটি মাত্র বীজ বহন করিবে।

কিন্তু সে তপস্যার মধ্যে বিবাহ, ঘরকন্না করা—বাসা বাঁধিবার স্থান কোথায়?

দরিদ্রের সংসার মানেই ত পাপ। 'পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে'। এক পাপই ত অন্য পাপ ডাকিয়া আনে। একটা দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা, একটা আত্ম-অবমাননা মানুষকে আর একটার মধ্যে নিক্ষেপ করে। একা একটা লোক সব কিছু সহ্য করিতে পারে কিন্তু স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দুঃখ দেখা অত্যন্ত কঠিন, তাহা সে নিজে বিবাহ না করিয়াও বুঝিতে শিখিয়াছে। তাছাড়া তাহার বাবা আছেন, মা আছেন, অবিবাহিতা বোনেরা আছে—সংসারের প্রতি এমনিই অনেক কর্তব্য আছে তাহার। সে সব ত কিছু কিছু করিতেই হইবে। আবার নিজের সংসারের বোঝা বহন করা—

না, না, সে হয় না। সংসারে দুঃখ-কষ্ট আছেই। এমন হয়ত কত পরিবারেই ঘটিতেছে। কোন একটি দরিদ্র পরিবারের অভাব মোচনের জন্য নিজেকে সে চিরকালের মত অভাবের মধ্যে, দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলিতে পারিবে না। দুটি কি তিনটি মানুষের জন্য সে নিজের তপস্যাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। কল্যাণীদের দুঃখ সহিতে হয়—উপায় কি ? তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, তাহার ব্রত আরও অনেক বড়। এই বিশেষ দুটি-তিনটি লোকের কষ্টের কথা ভুলিলে হয়ত পৃথিবীর আরও বহু লোকের দুঃখ-কষ্ট সে দূর করিতে পারিবে।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা যত বড়ই হেকে—শেষ পর্যন্ত তাহা পালন করা কষ্টকর হইয়া ওঠে। কথাটা কাঁটার মতই অহোরাত্র মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করিতে থাকে। আর হয়ত কয়টা দিন, চার-পাঁচদিন বাদেই সকলের উপবাস শুরু হইবে—এই কথাটা যখনই মনে পড়ে, তখনই তাহাদের সব কয়জনের সেবাযত্নের স্মৃতিটা মনে পড়িয়া মুখের মধ্যেকার আহার্য বিষাইয়া ওঠে, বহু রাত্রি পর্যন্ত চোখের পাতায় তন্দ্রা নামে না। বিশেষ করিয়া কল্যাণী, তাহার সেই সজাগ সতর্ক সেবা ও অতন্দ্র মনোযোগ বারবার ভূপেনকে উন্মনা করিয়া তোলে। তখন মনে হয়—মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান করিয়া সে কী মানুষ গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখে ? সে যা করিতে চাহিতেছে আজ, তাহাকেই ত বলে পলায়নী-বৃত্তি, যা তাহার অসংখ্য দেশবাসী প্রতিদিনই অবলম্বন বলিয়া ধরিতেছে। নিজের কর্তব্য পালনের জন্য সে যদি কোন স্বার্থত্যাগ করিতে না পারে ত অপরকে স্বার্থত্যাগের কথা শিখাইতে যাইবে কোন্‌ লজ্জায় !···

এমনি দ্বিধার মধ্যে তাহার দিন এবং রাত্রি কাটে। না পারে মন স্থির করিতে, না পারে মন হইতে কথাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে। সব সময়েই সে অন্যমনস্ক থাকে, ছাত্ররা প্রশ্ন করিয়া কথার জবাব পায় না, শিক্ষকরা বিদ্রূপ করেন।

অথচ দিনের পর দিন সংবাদ আসিয়া পেঁছায়—পাড়ার লোক কিছু কিছু ভিক্ষা দেয় তবে বিজয়বাবুদের সংসারে মধ্যে মধ্যে হাঁড়ি চড়ে।···রাগ হয় তাহার অপূর্ববাবুদের দলের উপর কিন্তু নিষ্ফল ক্রোধে নিজেরই অন্তর তিক্ততায় ভরিয়া ওঠে—অপূর্ববাবুদের কোন ক্ষতি হয় না তাহাতে।

এমনি করিয়া অন্তরে অন্তরে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইতে সহসা একদিন ভূপেন আবিষ্কার করিল যে শুধুই পরোপকার প্রবৃত্তি নয়, তাহার এই অশান্তির

মধ্যে আর একটা বড় রকমের শূন্যতা-বোধ আছে—সে সম্বন্ধে এতদিন সে কতকটা জোর করিয়াই, নিজেকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। আজ সে নিজের কাছে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে ইতিমধ্যেই ঐ রূপহীনা, শীর্ণা মেয়েটি তাহার মনের অনেকখানি দখল করিয়া বসিয়াছে। শেষের দিকে বিজয়বাবুদের বাড়ি সে শুধু বিজয়বাবুর জন্যই যাইত না এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি তাহার অপক্ষপাত স্নেহও ছিল না। টান তাহার সব চেয়ে বেশী ছিল কল্যাণীর উপরই। তাহার কথা, তাহার সেবা, তাহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি নেশার মতই তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। যে ঘটনাকে সে এতদিন নিতান্তই আকস্মিক বলিয়া মনে করিয়া অনুতপ্ত হইতেছিল, তাহার ভিতরে মনের অবচেতন গহ্বর হইতে একটা অনুমোদন ছিলই।

সত্যটা অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জায় ভয়ে সে যেন মুষড়াইয়া পড়িল। ছি। ছি। এ কী দুর্বলতা তাহার—এত ছোট, এত সাধারণ সে? সব চেয়ে আঘাত লাগিল তাহার এইখানটায়—তাহার আত্মসম্মানে। এতদিন যে ধারণা ছিল সে অসাধারণ, সে বিশু বা তাহার আর পাঁচজন সহপাঠীদের মত নয়—এইবার সেই ভুলটা ভাঙিতেই সে যেন মর্মান্তিক লজ্জা পাইল। তাহা হইলে সে ও এই?

তবু শেষ পর্যন্ত সত্যকে স্বীকার করিতেই হয়। সত্য যখন এমনি করিয়া স্ব-মহিমায় প্রকাশ পায়, তখন বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তার আগে ঘটনাটা গোড়া হইতেই বলা দরকার।

আহারাদির যে ব্যবস্থাই হউক, রাখুদের সব কয়জনকেই সেক্রেটারী ইস্কুলে ফ্রী করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া পড়াশুনাটা তাহাদের বন্ধ হয় নাই। তাহারা নিয়মিতই আসিত, যদিচ ভূপেন সেদিন চলিয়া আসার পর হইতে আর কোন দিনই তাহাদের ডাকিয়া কোন কুশল প্রশ্ন করে নাই। সেটা করে নাই কোন রাগ বা অভিমানে নয়—অনর্থক বলিয়া। তাহাদের চেহারার ক্রমবর্ধমান শীর্ণতা ও মুখের অপরিসীম শুষ্কতাতেই সে যাহা জানিতে চায় তাহা প্রকাশ পাইত, সুতরাং অনর্থক প্রশ্ন করিয়া লাভ কি? কোন প্রতিকার যখন সে করিতে পারিবে না তখন দুঃখের সংবাদটা জানিয়া শুধু মন-খারাপ করার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সেদিন কি জানি কেন ভূপেন কিছুতেই নিজেকে সংযত করিতে পারিল না। ইস্কুলের ছুটির পরই দ্রুতপদে গিয়া মাঠটার বাঁকে দাঁড়াইয়া রহিল, এই পথেই রাখুদের যাইতে হইবে—এইখানে দেখা করাই নিরাপদ।

রাখুকে ডাকিতে সে শান্ত মুখে কাছে আসিল। ছেলেটি বরাবরই একটু বেশী শান্ত, এখন যেন সে ভাবটা আরও বাড়িয়াছে। তবু সে যে খুশী হইয়াছে সেটা তাহার দৃষ্টিতেই বোঝা গেল। কিন্তু ভূপেনের প্রধান সমস্যা হইল, কেমন করিয়া এই বালকের কাছে কথাটা পাড়িবে; অনেক ইতস্তত করিয়া, কতকগুলা নিরর্থক কুশল প্রশ্নের পর এক সময়ে সে প্রায় মরীয়া হইয়াই বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, শুনেছিলুম মহেশবাবু ইস্কুল থেকে কিছু কিছু সাহায্য দেবার চেষ্টা করছেন, কিছু করেছেন কি?

নতমুখে রাখু জবাব দিল, এই মাস থেকে দশটা ক'রে টাকা পাওয়া যাবে।

—মাত্র দশ টাকা।

ভূপেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর শুধু প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাতেই ত চলবে না, আর কি উপায় হচ্ছে?

রাখুও একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দিদি বাড়িতেই একটা পাঠশালা বসাবার চেষ্টা করেছিল—ভেবেছিল অ আ শেখাবে, যা দু-এক আনা পাওয়া যায় —কিন্তু সে সুবিধে হয় নি। এখন—ঐ ডাক্তারবাবুর স্ত্রী আর শালী দু'জনেরই শরীর খারাপ বলে দিদি ওঁদের রান্না ক'রে দিয়ে আসে; উনি দশ সের চাল পাঠিয়ে দিয়েছেন সেদিন, আর তিন টাকা ক'রে দেবেন বলেছেন।

কথা কয়টা চাবুকের মতই আঘাত করিল ভূপেনকে। কল্যাণী রাঁধুনীর কাজ লইয়াছে! পরের বাড়ি তিন টাকা বেতনে দাসীবৃত্তি করিতেছে!

অথচ আর কী-ই বা সে করিতে পারিত? আর ত কোথাও কোন পথ খোলা নাই!

রাখুকে বিদায় দিয়া সেদিন বহু রাত্রি পর্যন্ত ভূপেন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল। দেশের আর পাঁচজন দরিদ্র সাধারণ মানুষের মতই কল্যাণীর চিন্তা যে সহজে মন হইতে নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না, এই কথাটা সেই দিনই প্রথম সে নিজের মনের কাছে মানিতে বাধ্য হইল। কিন্তু প্রতিকারের পথ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না—যে একমাত্র পথ খোলা আছে সেটাকে বাছিয়া লইতে গেলে নিজের সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিতে হয়—চিরকালের মতই ভবিষ্যৎকে বাঁধা দিতে হয়। তা ছাড়া তাহার কী-ই বা বয়স এতগুলি অনূঢ়া ভগ্নী থাকিতে এই বয়সে বিবাহ করিলে লোকেই বা কি বলিবে? সে যে এখানে জড়াইয়া পড়িয়াছে, বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে, এমনি একটা বিশ্রী ইঙ্গিত উঠিবে না কি? কথাটা যে সে রকম কিছু নয়, এ কথা খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুর পক্ষেও বিশ্বাস করা কঠিন হইবে। এমন কি, এই সমস্ত গোলমালের মূলে যে, সেই অপূর্ববাবুর দলও তাঁহাদের মিথ্যা অপবাদকে সত্য প্রমাণ করিয়া লোকের কাছে বাহবা লইবেন।

এমনি করিয়া মনে মনে শুধু আলোচনাই করে ভূপেন, কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে না। শুধু ভাবিয়া ভাবিয়া ক্লান্ত ও উত্যক্ত হইয়া ওঠে। অবশেষে রাখুর সহিত দেখা হইবারও দিন পাঁচেক পরে সহসা একদিন সে স্কুলের ছুটির পর আবার বিজয়বাবুদের বাড়ির পথ ধরিল। বিশেষ কিছু ভাবিয়া নয়—এমনিই, হয়ত অপূর্ববাবুর দলকে উপেক্ষা করাও একটা উদ্দেশ্য ছিল কিংবা কোন রকম মনস্থির করিবার পূর্বে আর একবার কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হওয়া—

বিজয়বাবু তাহাকে আশা করেন নাই, তবু খুশী হইলেন, একটু লজ্জিতও হইলেন। আন্দাজে আন্দাজে দুইটা হাত বাড়াইয়া দিয়া টানিয়া কাছে বসাইলেন, কিন্তু কুশল প্রশ্ন ছাড়া একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। অপরে কুৎসা রটাইয়াছে সে অপরাধও যেন তাঁহার—এমনি মনের ভাব তাঁর।

কথার ফাঁকে ফাঁকে ভূপেন চারিদিকে চোখ বুলাইল। বিজয়বাবু ছেলেমেয়েদের চেয়েও কৃশ হইয়া গিয়াছেন। জিনিসপত্র এমনিতেই কম ছিল, এখন যেন কিছুই

নাই—এমন কি ঘরের মধ্যেকার কাঁঠাল কাঠের ভারী চৌকিটা পর্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে।

একটু পরে বিজয়বাবু ঘরে গিয়া সান্ধ্য-পূজায় বসিলে কল্যাণী নিঃশব্দে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূপেন অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পারিল না—দৃষ্টি তাহার পায়ের কাছাকাছি মাটির উপরই স্থির হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণীই প্রশ্ন করিল, ভালো আছেন?

—হ্যাঁ। কোনমতে জবাব দিল ভূপেন।

তারপর একটু ইতস্তত করিয়া, যেন চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, তুমি কি ওঁদের বাড়ি সেরে এসেছ?

—না।

একটু বিস্মিত হইয়া ভূপেন বলিল, তবে কি এখন আবার যেতে হবে? এই সন্ধ্যাবেলা?

কল্যাণী মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, না আর যেতে হবে না। আমি ওঁদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছি।

'কাজ ছেড়ে দিয়েছি' কথাটা যেন নূতন করিয়া আঘাত করিল ভূপেনকে, তবু কতকটা অন্যমনস্কভাবেই সে কহিল, ওখানে আর যাও না তুমি? কেন?

আবারও উত্তর দিতে সময় লাগিল কল্যাণীর। সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারেও মনে হইল যেন সে শিহরিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় বহু চেষ্টার পর কণ্ঠস্বর সহজ করিয়া লইয়া সে জবাব দিল, সে কথা আপনার কাছে বলতে পারব না।

সে আর দাঁড়াইল না, যেন এইটুকু বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কি একটা কাজের অছিলায় দ্রুতপদে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

কল্যাণীর কম্পিত কণ্ঠের এই কয়টি শব্দ ক্ষণকালের জন্য তাহার সমস্ত দেহে যে আগুন ছড়াইয়া দিয়া গেল, তাহাতেই ভূপেন কল্যাণী সম্বন্ধে তাহার মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিল। ফলে তাহার লজ্জা ও আত্মধিক্কারের যেমন অবধি রহিল না, তেমনি তাহার কর্তব্য-পথও স্থির হইয়া গেল। সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইবার পর মন ঠিক করিয়া ভোরের দিকে উঠিয়া সে মাকে চিঠি লিখিতে বসিল। পূর্বাপর সমস্ত কথা জানাইয়া, বিজয়বাবু সম্বন্ধে বহু উচ্ছ্বাস করিয়া ধীরে ধীরে জমিটা তৈয়ারী করিয়া লইল, তবু শেষ পর্যন্ত আসল বক্তব্যে পৌঁছিয়া কলম কাঁপিতে লাগিল। তাহার বাবা-মা তাহার সম্বন্ধে কত আশা পোষণ করিতেন তাহা সে জানে। এই রকম কিম্ভূতকিমাকার বিবাহে তাঁহাদের কতখানি আশাভঙ্গ হইবে তা ভূপেনের চেয়ে বেশী বোধ হয় কেহই বুঝিবে না। শুধু যে কন্যা রূপসী নয় বা সে মোটা যৌতুক হইতে বঞ্চিত হইল তাহাও নহে—বধূ শ্বশুরঘর করিতেও যাইতে পারিবে না, অন্ধ বিজয়বাবু ও ছেলে-মেয়েগুলির ভার কাহারও উপর দেওয়া চলিবে না, অন্তত কল্যাণী এ অবস্থায় তাহার বাবাকে ফেলিয়া স্বর্গেও যাইবে না এটা ঠিক। সুতরাং রাখ বিবাহ করিয়া স্ত্রী-পুত্র-সংসার প্রতিপালন করিবার যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত কল্যাণীকে এখান হইতে কোথাও লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না।

যাই হোক—তবু শেষ পর্যন্ত সে চিঠি শেষ করিল। মোহিতবাবুর কাছে তাহার শিক্ষা—কর্তব্যকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা সে কখনও করিবে না। চিঠি খামে আঁটিয়া ঠিকানা লিখিয়া সে অত ভোরেই বাহির হইয়া পড়িল এবং পাছে কোন রকম মানসিক দুর্বলতায় পরে আবার মত পরিবর্তন করিবার আশঙ্কা দেখা দেয়, এই জন্য তখনই ডাকবাক্সে চিঠিটা ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হইল বটে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে কৈ ?

বিনিদ্র রজনীর সমস্ত তাপ ও ক্লান্তি চোখের পাতায় বহন করিয়া সে মাঠের পর মাঠ ভাঙ্গিয়া চলিল সোজা পূর্ব দিক লক্ষ্য করিয়া। মনে কত ঝড় বহিতেছে তাহার যেন সীমা-পরিসীমা নাই। এক-একবার সমস্ত ব্যাপারের উপর বিরক্ত হইয়া ওঠে। মনে হয় এ সমস্তই কোন অদৃশ্য শক্তির চক্রান্ত। নিজের উপরও রাগ তখন কম হয় না—কী প্রয়োজন ছিল বিজয়বাবুদের সহিত এত অন্তরঙ্গতা করার। এ বোঝা কেবলমাত্র তাহারই, এমন ভাব দেখানোরই বা কি এমন মাথা-ব্যথা পড়িয়া গিয়াছিল। বিজয়বাবু তাহার কে ?

আবার এক সময়ে সেই ভগবদ্ভক্ত নিরীহ মানুষটির কথা মনে পড়িয়া মন স্নিগ্ধ হইয়া আসে। না, অনুতাপের কোন কারণ নাই। নাই বা গেল তাহার জীবনের স্রোত স্বচ্ছন্দ-গতিতে। তাহার অদৃষ্ট হাত ধরিয়া তাহাকে যে বিচিত্র পথে লইয়া যাইতেছে সেই পথেরই অভিজ্ঞতা থাক্ তাহার অন্তর ভরিয়া—

আচ্ছা, কল্যাণীকে কি সে ভালবাসে ?

এ প্রশ্ন যেন নিজের কাছে করিতেও ভয় হয়। হয়ত ভালবাসা নয়। তাহার সেবা, তাহার ঐকান্তিকতা, তাহার চরিত্রের মাধুর্য ভূপেনকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাহার কাছে গেলে ভাল লাগে, সে কষ্ট পাইতেছে মনে হইলে নিজেরও বেদনা-বোধ হয়—এই পর্যন্ত। কিন্ত ভালবাসাতে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, কামনার সে অসহ তীব্রতা তাহার কৈ কল্যাণী সম্বন্ধে ? তবে কি সে একটা মস্ত ভুলই করিতেছে ? কোন স্ত্রীলোকের সহিত সারা জীবন কাটাইতেছে সে, এটা কল্পনা করিতে গেলেই যে রকম স্ত্রীলোকের কথা তাহার মনে হয়, অন্তরের সেই মানসীর সঙ্গে যেন সন্ধ্যার অনেকটা মিল আছে। সেই উৎসাহ, শিক্ষা সম্বন্ধে সেই শ্রদ্ধা আর সেই আশ্চর্য চোখ দুটি—

না, সন্ধ্যার কথা থাক।

সন্ধ্যা ধনী-দুহিতা, সন্ধ্যা সুদূর। সন্ধ্যা তাহার জীবনে শুধুই একটা অতৃপ্ত, একটা উচ্চাশার অভিশাপ। তাছাড়া সন্ধ্যা তাহার ছাত্রী, তাহার স্নেহের, আশীর্বাদের পাত্রী। সন্ধ্যা সম্বন্ধে কোন কলুষিত চিন্তা যেন মনে কখনও স্থান না পায়। তাহার আত্মার একমাত্র আনন্দ, দুর্দিনের একমাত্র আশ্রয়। হয়ত জীবনে আর তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবে না—দুজনের জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র দু'জনকে চিরকালের মতই বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী করিয়া রাখিবে, তবু তাহার সম্বন্ধে চিন্তাটাও পবিত্র থাক। স্মৃতির মধ্যেও যেন একটা স্নিগ্ধতা, একটা আনন্দ মেলে !

হ্যাঁ—সন্ধ্যার কথা থাক্।

কল্যাণী সম্বন্ধে হয়ত ঠিক তেমন করিয়া ভাবা যায় না এখন। কিন্তু হিন্দুর ঘরে কোন্ স্বামীই বা স্ত্রীকে বিবাহের পূর্ব হইতেই কামনার সহিত কল্পনা করে? আমাদের দেশে বিবাহটা আগে, ভালবাসাটা পরে। কল্যাণীর সম্বন্ধেও সেই নিরানব্বইটি বিবাহের কথাই খাটিবে—হয়ত একদিন তাহার সম্বন্ধেও আকাঙ্ক্ষা ভূপেনের তীব্র হইয়া উঠিবে।

অন্তত কল্যাণীকে লইয়া সে অসুখী হইবে না, এটা ঠিক। স্ত্রী স্বামীর মানসী যদি বা না-ই হয়, ক্ষতি কি? গৃহিণী হইলেই চলিবে।

ভূপেন একরকম জোর করিয়াই মন হইতে সমস্ত দুশ্চিন্তা ও দ্বিধা সরাইয়া ফেলিল। কর্তব্য যখন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে তখন আর এসব ভাবিয়া লাভ নাই। জীবনের পথ যে তাহার সুখের নয় তাহা ত আগেই বোঝা গিয়াছে।

সে হোস্টেলের পথ ধরিল, মনে মনে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে।

আর সে কোন কথা ভাবিবে না। কিছুতেই না।

বাড়ি হইতে চিঠি আসিল একদিন পরেই, বাবা ও মার পৃথক চিঠি।

মার চোখের জলে চিঠির কাগজ বার বার ভিজিয়া উঠিয়াছে—তাহার চিহ্ন স্পষ্ট। ওখানকার ডাইনী মেয়েটা যে ভূপেনকে 'গুণ' করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—নহিলে সে এমন কথা লিখিতে পারিল কি করিয়া? লোকটার চোখের মাথা খাইয়াও কি লজ্জা হয় নাই? মহাপাপ না থাকিলে এমন রোগ হয় না। আবারও মহাপাপে লিপ্ত হইতেছে কোন্ সাহসে? তাঁহার বাছাকে এই ভাবে ভুলাইয়া এত বড় সর্বনাশ করিতে তাহাদের বুক কাঁপিতেছে না? তাঁহার মাথার দিব্য রহিল—ভূপেন যেন পত্রপাঠ চাকরিটা ছাড়িয়া দিয়া ঐ ডাইনীদের সংস্পর্শ কাটাইয়া চলিয়া আসে। যদি এমনি না আসিতে পারে ত মায়ের অসুখ বলিয়া দুই দিনের ছুটিতে যেন বাড়ি আসে, তারপর এখান হইতে চাকরিটা ছাড়িয়া দিলেই চলিবে। পাত্রী তাঁহার হাতে ভালই আছে, যেমন রূপসী, তেমনি শান্ত। পয়সা-কড়িও কিছু দিবে। ভূপেনের যদি এতই বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে ত সে একটা মুখের কথা বলে নাই কেন? বাপ-মার কথা যদি সে নাও ভাবে, ছোট বোনগুলার কথা কি তাহার একবার মনে পড়িল না? ঐ মেয়েটার ছলাকলা ত দু'দিনের, তাহাতেই সে সব ভুলিয়া গেল—তাঁহাদের এত দিনের স্নেহ, এত যত্ন? আবারও মাথার দিব্য রহিল, সে যেন পত্র-পাঠ এখানে আসে। ইত্যাদি—

উপেনবাবুর চিঠি এতটা করুণ-রসাত্মক নয়, বরং তাহার বিপরীত। তিনি তাহাকে প্রথমেই কুলাঙ্গার, স্বেচ্ছাচারী, কামুক প্রভৃতি বহু গালাগালি দিয়া শেষে লিখিয়াছেন—

'তোমার যে এত বড় অধঃপতন হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এই জন্যেই কি এত কষ্ট ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছিলুম? এর চেয়ে ছেলেবেলা থেকে কোন লোহার কারখানায় ঢুকিয়ে দিলে বোধ হয় আমার বেশী উপকার হ'ত। বাপ-মা,

নিজের বোন এদের প্রতি কর্তব্যের চেয়েও কি তোমার ঐ কর্তব্য বড় হ'ল? বোনগুলোর এখনও বিয়ে হ'ল না—নিজে বিয়ে ক'রে সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়লে এদের ত কোন উপায়ই হবে না। তুমি আমার একমাত্র ছেলে—সে কথাটা মনে রাখা কি উচিত ছিল না? এখানে ঐ বড়লোকের মেয়েটাকে এত দিন পড়ালে, যদি তার সঙ্গে জড়াতে পারতে ত বুঝতুম একটা হিল্লে হ'ল। কিন্তু তাতে যে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হ'ত। তুমি এমন আহাম্মক বাঁদর যে তাকে ফেলে ঐ কেলটি ছুঁড়ির ফাঁদে পা দিলে। যাই হোক—পাগল না হয়ে গেলে এমন অসম্ভব প্রস্তাব কেউ করতে পারত না; বুঝেছি যে, তারা তোমাকে পাগলই ক'রে দিয়েছে। কিন্তু আমার সম্মতি ত পাবেই না—বিনা অনুমতিতে যদি করো ত আমাদের অভিশাপ মাথায় নিয়েই করবে। তা ছাড়া আমি সহজে ছাড়ব না, তুমি যদি হপ্তা-খানেকের মধ্যে চাকরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে না এস, তা হ'লে আমি নিজে গিয়ে ওদের যাচ্ছেতাই অপমান ক'রে আসব এবং তোমার ইস্কুলের কর্তৃপক্ষের কাছেও সব জানিয়ে আসব, যাতে ওখানে আর বাস করতে না হয়।'

চিঠিটা হাতে করিয়া ভূপেন বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বাবা কথাটা মিথ্যা বলেন নাই—বাপ-মা-বোনদের প্রতি কর্তব্যটাই তাহার আগে। অবশ্য সেখানে মাথার উপর বাবা এখনও আছেন, তিনি সক্ষমও। কন্যাগুলি তাঁহার, তাহাদের ভবিষ্যতের দায়িত্বও তাঁহার—ভূপেনের নয়। তবু দরিদ্র পিতাকে যে সাহায্য করা উচিত সে কথাই বা সে অস্বীকার করে কেমন করিয়া? অথচ এখানেও—

বিভিন্ন এবং বিপরীতমুখী চিন্তা ও কর্তব্য-বুদ্ধির দোটানায় পড়িয়া অনেক ভাবিয়াও সে কুল-কিনারা পাইল না। বাবা তাহার উপর কিছুটা অবিচার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-মতই ভাবিয়া লইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় পড়িলে সবাই বোধ হয় এমনিই ভাবিত। তাঁহাদের দোষও দেওয়া যায় না—একমাত্র সন্তানের চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু—কল্যাণী ও বিশেষ করিয়া বিজয়বাবুর কথা যখন মনে পড়ে তখন চঞ্চল না হইয়া পারে না। অমন নিরীহ ও ভগবদ্ভক্ত লোকটিকে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ঠেলিয়া দেয় কি করিয়া? তিনি অবশ্য ভগবানের উপর বরাত দিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু ভগবান ত নিজে হাতে কিছু দিবেন না, কাহারও না কাহারও হাত দিয়াই দেওয়াইবেন। হয়ত বা তিনি তাহাকেই সেই মাধ্যমিক হিসাবে বাছিয়া লইয়াছেন।

এখানে আসিয়া এম. এ. পরীক্ষার খুব বেশী কিছু হয় নাই সত্য কথা। এত দিন তেমন ইচ্ছাও ছিল না—ভিত্তি হইতে মানুষ গড়া ঢের বেশী প্রয়োজন এটা বুঝিয়া সে নিজেকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিল—কিন্তু চেষ্টা করিলে পরীক্ষাটা দেওয়াও এমন কিছু কঠিন হইবে না। এম. এ. পাশ করিলে অন্য ইস্কুলে বেশী মাহিনায় কাজ পাওয়া যাইবে, হয়ত বা হেড-মাস্টারীও জুটিবে। তাহাতে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট না হইয়াও কিছু আয় বাড়ানো যাইতে পারে। তাছাড়া, সে ভাবিয়া দেখিল

যে বিবাহ হইলেও যেমন টাকা সে গত দুই মাস বাড়িতে পাঠাইয়াছে, সে টাকা পাঠানোর কোন অসুবিধা হইবে না। বাবা যদি রাগের মাথায় এখন কিছু দিন টাকা না-ই নেন ত পোস্ট অফিসে টাকাটা মাসে মাসে জমানো যাইতে পারে। সেটা শান্তির বিবাহের সময় প্রয়োজনে আসিবে।

না, মন যখন সে স্থির করিয়াই ফেলিয়াছে তখন নিজের কর্তব্যপথ হইতে আর ভ্রষ্ট হইবে না। অদৃষ্টে যাহা আছে থাক।

॥ ২২ ॥

ভূপেন জোর করিয়া উঠিয়া পড়িল। রাধাকমলবাবুর ঘরে গিয়া পাঁজি চাহিয়া লইয়া দেখিল বিবাহের দিন আছে তাহার পরের দিনই—আর আছে দিন-পাঁচেক পরে। অত দিন অপেক্ষা করা নানা কারণে যুক্তিযুক্ত নয় বুঝিয়া সে আর জোর করিল না। ইস্কুল হইতে কিছু আগেই ছুটি লইয়া একেবারে সরাসরি বিজয়বাবুর বাড়ি উপস্থিত হইল।

বিজয়বাবু আগেকার মতই অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। এই কয়দিনে তিনি যেন আরও কৃশ হইয়া পড়িয়াছেন—আরও করুণ, আরও পবিত্র দেখাইতেছে তাঁহাকে। যেটুকু দ্বিধা ছিল এখনও, তাহা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। সে একেবারেই কথাটা পাড়িল।

কহিল, দেখুন আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে,—বলুন দেবেন?

বিজয়বাবু দারুণ বিব্রত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কী সর্বনাশ! আমার কাছে? কিন্তু—

—বলছি সবই—তার আগে কথা দিন যে আপনার পক্ষে দেওয়া যদি সম্ভব হয় ত নিশ্চয়ই দেবেন?

—নিশ্চয়ই দেব। এ কথা কেন বলছ ভাই। কীই বা দেবার আছে আমার?

—থাকলেই ভাল হ'ত কিন্তু কিছুই যে নেই।

—আমি, আমি কল্যাণীকে ভিক্ষা চাইছি। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।

কথাটা বুঝিতে একটু সময় লাগিল, তাহার পরই বিজয়বাবু আন্দাজে আন্দাজে হাত বাড়াইয়া একেবারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, এ যে আশাতীত সৌভাগ্য আমার! কল্যাণী তোমার মত দেবতার পায়ে ঠাঁই পাবে, এত তপস্যা কি আছে ওর? আমি ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছিলুম ভূপেন-বাবু, বুঝে হতভাগীর বরাতের কথা ভেবে দুঃখ পেতাম। ভাবতাম হতভাগী বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়, ওর দুঃখের শেষ থাকবে না। কিন্তু চাঁদ যে নিজে এসে ধরা দেবেন—

—তা'হলে আপনি কথা দিচ্ছেন।

—দিচ্ছি বৈ কি! কিন্তু এ যে আমার এখনও বিশ্বাসই হচ্ছে না। ইতস্তত করবার যদি কিছু থাকে ত তোমারই আছে, আমার কি থাকতে পারে?

তাহার পর একটু থামিয়া যেন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, দিদি অথর্ব, ছেলেমেয়েগুলোর ভাত-জল পাওয়াই মুশকিল—এই যা একটু দুর্ভাবনা। কিন্তু

তাই ব'লে কি ওর ভবিষ্যৎ সুখ, ওর জীবনটা মাটি করব ? যা আছে আমাদের অদৃষ্টে হবে।

ভূপেন আহত কণ্ঠে কহিল, আপনি কি আমাকে এমনই হৃদয়হীন ভাবলেন যে আপনাদের এই অসহায় অবস্থায় ফেলে কল্যাণীকে নিয়ে চলে যাবো ?··· আমিই বিবাহের পর এখানে এসে থাকব।

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ বিজয়বাবুর মুখে কথা সরিল না। তাহার পর বলিলেন, কিন্তু তোমার বাবা-মা তাঁরা কি এতে—

—না, তাঁরা এতে মত দেবেন না। আমি তাঁদের অমতেই করব।

বিষম ব্যাকুল হইয়া বিজয়বাবু কহিলেন, কিন্তু তাহ'লে কি ক'রে হবে। না, না—সে সম্ভব নয়। সে কোন মতেই হ'তে পারে না—

ভূপেন দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন, মনে আছে ত ? আর সে কথা বাদ দিলেও, আমার কাছে আপনাদের কোন ঋণ আছে, এ কথা যদি মনে করেন, তাহ'লে আর আপত্তি করবেন না। মনে রাখবেন আমি ভিক্ষা চেয়েছি—

বিজয়বাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন, তার পর যখন কোনমতে গলা পরিষ্কার করিয়া আবার কথা কহিলেন, তখন তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে ;—তুমি সত্যিই দেবতা, তোমাকে আমরা এখনও কিছুই চিনতে পারি নি ; এ ত তোমার ভিক্ষা চাওয়া নয়, এ যে ভিক্ষা দেবারই ছল ভাই ! কিন্তু আমার দুর্নামের শেষ থাকবে না। তোমার বাবা-মার অভিশাপ, সকলকার বিদ্রূপ—

—হোক না। আমার জন্যে এটুকু সইতে পারবেন না ! তাঁহার হাতটা ধরিয়া ভূপেন বলিল।

—আমার জন্য ভাবি না ভাই, এমন কি মেয়ের জন্যেও নয়। কিন্তু তুমি যদি ব্যথা পাও, তোমাকে যদি মন্দ বলে কেউ ?

—তার জন্য আমি প্রস্তুতই আছি।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিজয়বাবু চোখ মুছিয়া কহিলেন—আরও একটা প্রশ্ন করব। কল্যাণীর প্রতি যদি তোমার সত্যকার স্নেহ না থাকে, এটা যদি শুধুই আমার প্রতি করুণা হয়, তাহ'লে বড় অসুখী হবে ভাই। স্ত্রী যদি বোঝা হয়ে দাঁড়ায় জীবনে তাহ'লে বিড়ম্বনার আর শেষ থাকবে না। কল্যাণী সব দুঃখ সইতে পারবে, সে শুধু তোমার সেবা করার অধিকার পেলেই সুখী থাকবে, কিন্তু তোমার পক্ষে সে জীবন হয়ে উঠবে দুঃসহ। অথচ মনে ক'রে দ্যাখো, কত ভাল পাত্রী পেতে পারতে তুমি—রূপসী, বিদুষী, ধনবানের মেয়ে, তোমাকে পেলে তারাই ধন্য হ'ত। এখনও সময় আছে, ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো।···আমার জন্য ভেবো না, না হয়,—না হয় আমি তোমার কাছে ভিক্ষাই নেবো। তোমাকে অসুখী করার থেকে দুর্নামও আমার সইবে !

ভূপেনের যদি বা দ্বিধা থাকিত, তাহা হইলেও এ কথার পর তাহা দূর হইতে দেরি লাগিত না। সে অসহিষ্ণুভাবেই বলিল, কেন আপনি মিথ্যা আশঙ্কা করছেন, আমি সব দিক ভেবেই মন স্থির করেছি। কল্যাণীকে নিয়ে আমি সুখী

হবো ব'লেই আমার বিশ্বাস।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিজয়বাবু কহিলেন, ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হোক ভাই। হয়ত এ ভালই হ'ল। আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারিনে বলেই আঁক-পাঁক করি।

ভূপেন একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বিয়ের দিন কিন্তু কালই—

—কালই! বিজয়বাবু চমকিয়া উঠিলেন।

—হ্যাঁ, তা নইলে অসুবিধা আছে। কোন রকম আড়ম্বর করবার মত ত অবস্থা নয়। শুধু শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হবে—আচ্ছা, আমি তাহ'লে এখন আসি।

ভূপেন বাহির হইয়া গেলেও বিজয়বাবু বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কল্যাণী বাড়ি ছিল না, পানীয় জল আনিতে বাহিরে গিয়াছিল। এখন তাহার ফিরিবার শব্দ পাইয়া বিজয়বাবুর তন্দ্রা ভাঙিল, গাঢ়কণ্ঠে ডাকিলেন,—মা কল্যাণী, একবার কাছে আয় ত মা।

কল্যাণী তাঁহার কণ্ঠস্বরে ভয় পাইয়া কলসী নামাইয়া কাছে আসিল, কী হয়েছে বাবা?

—মা, যা আমি আশা করা ত দূরের কথা, সাহস ক'রে ভগবানের কাছেও চাইতে পারি নি, আজ তাই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন অযাচিতভাবে। ভূপেনবাবু তোকে বিয়ে করতে চান—তিনি, তিনি বিবাহের দিন পর্যন্ত স্থির ক'রে ফেলেছেন। এ তোরই তপস্যার ফল মা।

কথাগুলোর সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে কল্যাণীর বহুক্ষণ সময় লাগিল। সংবাদটা এতই অবিশ্বাস্য, এতই আশাতীত যে, সে বিহ্বল নেত্রে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া শুধু দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে যখন কথাটা কিছু মাথায় গেল, তখন শুধু একবার ব্যাকুলভাবে বলিতে গেল, কিন্তু বাবা—

বাধা দিয়া বিজয়বাবু বলিলেন, সেইখানেই ত সে অত বড় মা। সে তোকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না। সে-ই এখানে থাকবে।

তবু কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে বুঝিয়া বিজয়বাবু কিছু উদ্বিগ্নভাবে তাহার হাত ধরিয়া মৃদু একটা টান দিতে সে যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। সেইখানেই মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া বিজয়বাবুর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিল। বিজয়বাবু তাহার মুখটা দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাহার বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনা ও দুরাশা আজ আনন্দ সংবাদের স্পর্শে যখন অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িয়া তাঁহার পরিধেয় বসনের অনেকখানি ভিজাইয়া দিল, তখন তাহার মনটা তিনি পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন।

বিজয়বাবু মেয়েকে বাধা দিলেন না, সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন না, শুধু সস্নেহে, নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

বাহিরে আসিয়া ভূপেনের হাসি পাইতে লাগিল। এমন করিয়া নির্লজ্জের মত তাহাকেই তাহার বিবাহের ঘটকালি হইতে উদ্যোগ-আয়োজন পর্যন্ত করিতে হইবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল? আর সকলে থাকিতে এমন করিয়া নির্বান্ধব অবস্থায়

প্রবাসে এই উৎসবহীন বিবাহ।

হায় রে! বাস্তব যে তাহারই জীবনে এমন করিয়া কল্পনাকে অতিক্রম করিবে, তাহাই বা কে জানিত।

কিন্তু তখন আর দুঃখ করিবারও সময় নাই—ভাবিবারও না। এ যেন কোথা দিয়া কী হইয়া গেল। এ-রকমটা যে না ঘটিলেই হইত, তাহা মনে মনে সে-ও অনুভব করিতেছে, অথচ এখন আর পিছানো অসম্ভব। যাহা হইবার হইবে—এই মনে করিয়া অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

সে হোস্টেলে ফিরিয়া গিয়া প্রথমেই রাধাকমলবাবুর কাছে গেল। তিনি তখন সন্ধ্যাপূজা শেষ করিয়া কী একটা বই লইয়া পড়িতে বসিয়াছেন। অমন উদ্‌ভ্রান্তের মত তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া কহিলেন, কী হে, ব্যাপার কি?

ভূপেন একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া কহিল, আপনার সঙ্গে বিশেষ জরুরী একটা কথা ছিল। একটু মাঠের দিকে আসবেন?

—নিশ্চয়ই। বলিয়া রাধাকমলবাবু তাহার পিছু পিছু বাহির হইয়া আসিলেন, ব্যাপার কি বলো ত ভাই?

কথাটা কোন্ দিক হইতে আরম্ভ করিবে বুঝিতে না পারিয়া ভূপেন কহিল, বিজয়বাবুদের অবস্থা ত সব শুনেছেন। আমি ওঁদের কিছু কিছু সাহায্য করতুম, তাই চলত। ইতিমধ্যে অপূর্ববাবুদের দল রটনা করেন যে, বিজয়বাবু মেয়েকে দিয়ে আমায় ভুলিয়ে টাকা আদায় করছেন।

রাধাকমলবাবু কহিলেন—হ্যাঁ, আমিও এই রকম একটা কি শুনেছিলাম। কিন্তু সে ত আমরা কেউই বিশ্বাস করি নি ভাই।

—আপনি করেন নি, কিন্তু অনেকে করেছিল। কথাটা বিজয়বাবুর কানে পেঁছিতে তিনি আমার কাছ থেকে সমস্ত রকম সাহায্য নেওয়া বন্ধ করেন। অথচ আয় ত ও'দের মাসিক দশ টাকা মাত্র তা জানেন। একেবারেই উপবাস চলেছে ও'দের, তাতে ক'দিন যে আর বাঁচবেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

রাধাকমলবাবু বলিয়া উঠিলেন, বেচারী! বড় ভালমানুষ আর বড় ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক। ভগবান এইসব লোককেই দুঃখ দেন।···সবই ত বুঝছি ভাই, কিন্তু কি করবো বলো—আমরাও ত ছাপোষা, এই ক'টা টাকা মাত্র উপার্জন; এতে সংসারই চলে না ভাল ক'রে—

ভূপেন কহিল, আমি অনেক ভেবে-চিন্তে একটি মাত্র পথ ঠিক করেছি, আমি ও'র মেয়েকে বিয়ে করব; তাহ'লে ত আর দুর্নামের ভয় থাকবে না।

কথাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে কিছুক্ষণ রাধাকমলবাবুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, অবাক হইয়া সেই অন্ধকারেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, দীর্ঘজীবী হও ভাই। কিন্তু তোমার বাপ-মা? তাঁরা কি রাজী হবেন।

—না। আমি তাঁদের অমতেই করব।

—সেটা কি ভাল হবে ভাই? তাঁরাই অনেক কষ্ট ক'রে তোমাকে মানুষ করেছেন। অবশ্য তোমার উদ্দেশ্য মহৎ—কাজও ভালই করছ, তবু গুরুজনের

নিঃশ্বাস মাথায় ক'রে শুভ কাজ করা—

—সবই আমি ভেবে দেখেছি পণ্ডিতমশাই। কিন্তু এখন এতদূর এগিয়েছি যে ও আলোচনা আর নিরর্থক। ভেবে দেখুন আজকাল ত বহু ছেলেই ভালবাসার জন্য বাপ-মার অমতে বিয়ে করছে। ধরে নিন আমিও কল্যাণীকে ভালবাসি। সে কথা যাক—এখন আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

—আমাকে ?—বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন রাধাকমলবাবু।

—হ্যাঁ। আমি আশঙ্কা করছি যে বাবার তরফ থেকে একটা প্রবল বাধা আসবে। তার আগেই আমি এ কাজ সেরে ফেলতে চাই। কালই আমি বিয়ের দিন ঠিক করেছি। কিন্তু এসব কথা বেশী লোককে এখন না জানানোই ভাল। আপনি যদি কাল কাজটি সেরে দেন ত বড় ভাল হয়—। ও'দের ত কেউ নেই, তা ছাড়া টাকা খরচ করারও সামর্থ্য নেই। সুতরাং আড়ম্বর স্ত্রী-আচার কিছুই হবে না, শুধু শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটা সেরে দেবেন ?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাধাকমলবাবু কহিলেন, এ কাজ ত কখনও করি নি ভাই—গোপন বিয়ে, শেষে একটা লোকনিন্দার ভাগী হবো না ত ?

—ঠিক গোপন বিবাহ যাকে বলে এ ত তা নয়। মেয়ের বাবার মত আছে, সেখানেই হবে। আমার সহকর্মীদেরও আমি বিয়ের আগে জানাবো। মহেশবাবুর কাছে কাল সকালেই যাবো। এতে আপনাকেই বা নিন্দা করবে কেন ?

আরও কিছুক্ষণ বাদানুবাদ ও যুক্তিতর্কের পর রাধাকমলবাবু রাজী হইলেন। সেইখানে বসিয়াই ভূপেন তাঁহার নিকট হইতে একান্ত আবশ্যকীয় জিনিসগুলির ফর্দ করিয়া লইল। পণ্ডিতমশায় নিজেই নারায়ণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবেন এইরূপ কথা রহিল।

রাত্রে আহারাদির পর ভূপেন বাবাকে, মাকে ও সন্ধ্যাকে চিঠি লিখিতে বসিল। বাবা-মাকে বেশী কিছু লিখিবার ছিল না, শুধু এ চিঠি যখন তাঁহারা পাইবেন তখন বিবাহ চুকিয়া যাইবে, এই কথাটাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। বধূকে তাঁহাদের আদেশ পাইলে দুই-তিনদিনের জন্য লইয়া যাইতে পারে—কিন্তু এখন যে তাহাকে এখানেই রাখিতে হইবে, এবং সে-ও শ্বশুর-গৃহে থাকিবে, এটাও জানাইল। উপায় নাই বলিয়াই এ কাজ তাহাকে করিতে হইল—তাঁহারা যেন অপদার্থ অকৃতী সন্তানকে ক্ষমা করিবার চেষ্টা করেন।

সন্ধ্যার চিঠিটাই একটু দীর্ঘ হইল। পূর্বাপর সমস্ত ইতিহাসটা জানাইয়া শেষে লিখিল—

কাজটা ভাল করলুম কিনা, তা বুঝতে পারছি না। তবে এটুকু বুঝেছি যে, তোমার কাছে বসে বসে ভবিষ্যতের যে উজ্জ্বল ছবি আঁকতুম, তা ছবিই রয়ে যাবে। জীবনে সে সব আর কোন দিন ঘটবে না। উন্নতি করতে গেলে পুরুষকে একাই চলতে হয় জীবনের পথে—দারিদ্র্য আর সংসার, এ দুই বোঝা নিয়ে ওপরে ওঠা একটু কঠিন। যাক—কী আর করা যাবে। অন্য লোক কে কী বলবে তা নিয়ে আমার একটুও দুশ্চিন্তা নেই সন্ধ্যা, তোমার চোখে হয়ত নেমে যাবো বা গেলুম, সেই কথাটাই ভাবছি। হয়ত এটাও স্পর্ধা, হয়ত অনেকদিন

আগেকার দরিদ্র মাস্টার মশাইয়ের জীবনে কি হ'ল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তোমার সময়ও নেই—তবু তোমার শ্রদ্ধা হারাবো, এই আশংকাই আজ আমায় সব চেয়ে বিচলিত করেছে! যদি এখনও আমার কথা মনে করবার সময় থাকে ত এইটুকু ভেবেই আমাকে মাপ ক'রো যে, দাদুর পায়ের তলায় বসে যে শিক্ষা পেয়েছি, মনুষ্যত্বের সেই বড় শিক্ষাটার অমর্যাদা করি নি আমি! আমি অনেক বড়ো হ'লে পৃথিবীর মানুষের কী বৃহত্তর কল্যাণ-চিন্তা করতে পারতুম তা জানি না, কিন্তু যে-মানুষ চোখের সামনে রয়েছে তার প্রয়োজনের জন্য সেই নাম-না-জানা ভবিষ্যৎকে যদি বলি দিতে পেরেই থাকি ত তাতে লজ্জা পাবার বা অনুতপ্ত হবার কিছু আছে ব'লে মনে করি না। শুনেছি ডাক্তারদের এ একটা বড় পরীক্ষা ছিল আগে যে, কোন বিত্তশালী লোকের আহ্বানে হয়ত চলেছে গাড়ি ক'রে সেই ধনীর বাড়ি, এমন সময় দেখলে পথের ধারে গাছতলায় একটি দরিদ্র লোক রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছে, তুমি কাকে দেখবে তখন? দুটোই জরুরী অবস্থা। এই প্রশ্নে যারা 'গাছতলার রোগীকে আগে দেখব' বলত, তারাই নাকি সসম্মানে পাস করত। এ গল্পও দাদুর কাছে শোনা।

যাক্‌গে—এ কৈফিয়তের কোন প্রয়োজনই হয়ত নেই তোমার—এ কতকটা আমার নিজেকেই বোঝানো!

হয়ত অন্য কোন লোকের স্মরণস্থ হ'লেও সমস্যার সমাধান হ'ত, এতটা করবার দরকারই হ'ত না, কিন্তু কী জানি কেন ঠিক ভিক্ষা চাইতে প্রবৃত্তি হ'ল না, আর তা-ছাড়া…কী বলব…হয়ত কল্যাণী সম্বন্ধেও কোন দুর্বলতা ছিল আমার মনে!

মানুষের লোভের সীমা নেই—আজ কেবলই সমস্ত মন যেন তোমার উপস্থিতি চাইছে। কিন্তু সে সম্ভব নয়, আর তার প্রয়োজনও নেই বলে সময় থাকতে তোমাকে খবর দিই নি।

দাদুকে আমার প্রণাম দিয়ে ব'লো যে তাঁর আশীর্বাদই আমার জীবনে একমাত্র সম্বল রইল। তাঁর কথা মনে ক'রেই আমি আজ যা কিছু ভরসা পাচ্ছি মনে।

চিঠি কিছু দীর্ঘ হ'ল হয়ত—কিন্তু তা বলে উত্তর দেবার দায় রইল না। তুমি আমার আশীর্বাদ নিও। ইতি—

চিঠি শেষ করিয়া ভূপেন যখন আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল, তখন এই কথাটাই বার বার তাহার মনে হইতেছিল যে, সে যেন এইবার সত্য-সত্যই সন্ধ্যার কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেল, চিরদিনের মত। যতই মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করুক যে ধনী-দুহিতা সন্ধ্যা অনেক আগেই সরিয়া গিয়াছে, তাহার ঔদাসীন্য ও চিঠির সংক্ষিপ্ততাই তাহার প্রমাণ, তবু কোথায় যেন একটা ভরসা ছিল—আজ সমস্তই চলিয়া গেল! সন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহার মনোভাব সে আজও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল না—তাহার বিবাহের সঙ্গে সন্ধ্যার কতটুকু সম্পর্ক, তাহাও ভাবিল না, শুধু মনে হইতে লাগিল যে সন্ধ্যার অন্তরে যে শ্রদ্ধার আসনে সে বসিয়া ছিল, সে

আসন হইতে চিরতরে নামিয়া যাইতেছে।

তাই সন্ধ্যার নিকট হইতে দূরে চলিয়া আসিবার ব্যথাটা যেন নূতন করিয়া অনুভব করিল। বহু রাত্রি পর্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না—অন্ধকারে এপাশ ওপাশ করিতে করিতে আপন মনেই অস্ফুট কণ্ঠে শুধু তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল,—সন্ধ্যা, সন্ধ্যা।

সকাল বেলা উঠিয়া ভূপেন প্রথমেই মহেশবাবুর সহিত দেখা করিতে গেল। অত সকালে তাহাকে দেখিয়া মহেশবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, আবার কী? কোথায় আবার কি ফ্যাসাদ বাধালেন?

ভূপেন অপ্রতিভভাবে একটু হাসিল, কিন্তু কোন প্রকার ইতস্তত করিল না, বিনা ভূমিকায় একেবারে কাজের কথাটা পাড়িল। আনুপূর্বিক সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া যখন সে থামিল, তখন মহেশবাবু কিছুকাল শুধু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন, মশাই, আপনার সতীর্থরা আপনার আড়ালে আপনাকে কি বলে জানেন? বলে পাগলা মাস্টার। তা আমি এখন দেখছি যে তারা মিথ্যা বলে না। আপনি একটি বদ্ধ পাগল। যা করবেন তাইতেই কি একটা বাড়াবাড়ি আপনার? আশ্চর্য।

ভূপেন কোন কথা কহিল না, নতমস্তকে দূরের চেয়ারের পায়াটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মহেশবাবু একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, পরোপকার ভাল জিনিস, কিন্তু তাই বলে আপনার এত কি দায় মশাই যে, এমন ক'রে সমস্ত ভবিষ্যৎটা মাটি করলেন। উন্নতির আশা রইল না, শ্বশুর-বাড়ি থেকে কোন সাহায্য পাবার আশা রইল না—এই বয়স থেকে এত বড় একটা সংসার ঘাড়ে চাপল! শুনেছি ইংরেজিতে একটা কথা আছে ভবিষ্যৎ বাঁধা দেওয়া, আপনিও তাই করলেন।··· আপনি কি একেবারে স্থির ক'রে ফেলেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভূপেন জবাব দিল।

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যে দুর্নামটা রটেছিল, তার মূলে কি কোন সত্য আছে? লজ্জা করবেন না—খুলেই বলুন।

—দুর্নামটার মূলে কোন সত্যই নেই, তবে ওঁর মেয়েটির ওপর আমার একটু স্নেহ—বরং ভালবাসাও বলতে পারেন, জন্মেছে বৈ কি।

আর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহেশবাবু কহিলেন, পরোপকারের জন্যে এত বড় স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ করতে যাচ্ছেন, আপনাকে আর কী বলব ' যান—বরং আমি দেখব আসছে মিটিং-এ আপনার কিছু মাইনে বাড়াতে পারি কিনা, অন্তত পাঁচ টাকা আমি বললে কমিটি বাড়াবে বলেই মনে হয়।

ভূপেন তাঁহাকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে মহেশবাবু সহসা প্রশ্ন করিলেন—ওখানকার উদ্যোগ-আয়োজন কে করছে?

লজ্জিত মুখে ভূপেন কহিল, কেউ ত নেই, পণ্ডিতমশাই একটা ফর্দ ক'রে দিয়েছেন, দেখি যা পাই বাজার করি। ওখানেও হয়ত ওকেই সব করতে হবে—

—ছি ছি। দেখি দিন আমাকে ফর্দ—আমি সব আনিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে দুপুরে বেলা গিয়ে পড়ছি ; যা হয় আমরাই সব ক'রে-কম্মে নেব।…একে ত এই উদ্ভট বিয়ে, তার ওপর কনে করবে তার বিয়ের যোগাড় আর বর করবে বাজার। ছি!…যান আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন গে। তবে আজ আর কিছু খাবেন না—উপোস ক'রে থাকতে হয়।

মহেশবাবু যে এতটা করিবেন, তাহা ভূপেন কখন কল্পনাও করে নাই। কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া গেল, সে হেঁট হইয়া এই প্রথম পদধূলি লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মহেশবাবুও সস্নেহে তাহাকে উঠাইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, বাহাদুর ছেলে ভাই, হ্যাঁ—বুকের পাটা আছে বটে। এত বড় কাজ করতে আমাদের সাহসে কুলোত না।

সে প্রায় বাহিরে আসিয়াছে, এমন সময় মহেশবাবু পুনরায় ডাকিয়া কহিলেন, কিছু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন রাখব ? কাউকে বলতে চান ? মাস্টারমশাইদের ?

ক্লান্ত কণ্ঠে ভূপেন জবাব দিল, আজ আর কাউকেই জানাতে চাই না। আজ থাক—

—বরং বৌ-ভাতের দিন হবে—এঁ্যা ? সেই ভাল !

ভূপেন যখন সন্ধ্যার পর ক্লান্ত ও উপবাসক্লিষ্ট দেহটাকে কোনমতে টানিয়া লইয়া বিজয়বাবুদের বাড়ি পেঁাছিল, তখন রাধাকমলবাবু আসিয়া গিয়াছেন।

মহেশবাবু, তাঁহার স্ত্রী ও একটি দাসী আসিয়াছেন, তাঁহারা বিবাহ ও হোমের সমস্ত উপকরণ ইতিমধ্যেই গুছাইয়া ফেলিয়াছেন। মায় বর ও বধূর দুইখানি নববস্ত্রও সংগ্রহ করিতে মহেশবাবু ভোলেন নাই।

তাহাকে দেখিয়া মহেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, এস ভাই। স্ত্রী-আচার হ'ল না তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু নান্দীমুখটাও বাদ যাবে বলে আমার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করছে। অবিশ্যি বিজয়বাবুকে দিয়ে তাঁদেরটা একরকম সারিয়ে রেখেছি। যাক্ গে কি আর করা যাবে।

ভূপেন স্নান সারিয়াই আসিয়াছিল, কাপড় ছাড়িয়া একেবারে পিঁড়িতে বসিল। ইতিমধ্যে দুই-একজন প্রতিবেশীও আসিয়া গিয়াছিলেন, মহেশবাবুই অপরাহ্নে ইঁহাদের সংবাদ দিয়াছেন। কিছু কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, আর একটি সধবা মহিলা এবং মহেশবাবুর স্ত্রী বিবাহের সব কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, মায় স্ত্রী-আচারও বাদ গেল না। অর্থাৎ বিবাহের আনুষ্ঠানিক আয়োজন কিছু যাহাতে বাদ না পড়ে সেদিকে মহেশবাবু বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

ফলে বিবাহটা যত নিরানন্দময় এবং অদ্ভুত রকমের হইবে বলিয়া ভূপেন মনে করিয়াছিল, ততটা হইল না বটে বরং অনেকখানিই সাধারণ বিবাহের মত দেখাইতে লাগিল, তবু তাহার মনটা ভার-ভার হইয়াই রহিল। কিছুতেই সহজ হইতে পারিল না সে। যে কাজ সে করিতে যাইতেছে তাহা কতটা যুক্তিযুক্ত হইল তাহা আজও জানে না—শুধু এইটা বুঝিতে পারিল যে এ আর কোন মতে

ফিরিবে না। যদি হঠকারিতাই হইয়া থাকে ত ইহার ফলাফল তাহাকে আজীবন বহন করিতে হইবে। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব যাহাদের সহিত জীবনের এতগুলি বছর কাটিয়াছে তাহাদের সকলকে বাদ দিয়া, যে মেয়েটির ও পরিবারের সহিত বলিতে গেলে মাত্র দু'দিনের পরিচয়, তাহাদের সঙ্গে দীর্ঘ বাকী জীবনটা সে কাটাইবে কেমন করিয়া ? যদি সুখী না হইতে পারে ? যদি সমস্ত বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হয় ?···হয়ত বা এখনও পালানো যাইতে পারে। তাহাতে নিন্দা যতই হোক্—বাঁচিতে পারে সে। এমনিই একটা কিছু করিয়া বসিবে নাকি ?···এই রকমের নানা উদ্ভট কথা সেই শেষ মুহূর্তেও তাহার মনে আসিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অসহায় ভাব আসিয়া তাহাকে কেমন বিহ্বল করিয়া তুলিল, মনে হইতে লাগিল যেন কে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিতেছে, বাহিরে কোথাও এতটুকু বাতাস, কোথাও কোন অবসর নেই—

তবু শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হইল না। এক সময়ে বিবাহের মন্ত্রপাঠ, মায় হোম পর্যন্ত শেষ হইয়া গেল, বর-বধূ বাসরঘরে উঠিল। জলযোগ-মিষ্টিমুখের পর অভ্যাগতরাও সকলে চলিয়া গেলেন, শুধু মহেশবাবুর স্ত্রী ও তাঁহাদের দাসী রহিয়া গেল। তাঁহারা কাল সকালের কাজটুকু সারিয়া যাইবেন এই কথা রহিল।

বাসরঘরে জাগিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, বরং শয়নের ব্যবস্থাই হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলে বর-বধূ আলাপ করিতে পারিত অনায়াসে কিন্তু সে ইচ্ছা অন্তত ভূপেনের ছিল না। সে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না, শুইয়া শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিল, তবু কল্যাণীর সঙ্গে কথা কওয়ার কোন চেষ্টাই করিল না। আর বেচারী কল্যাণী তাহার নিজের তরফ হইতেই যথেষ্ট ভয় ছিল, এখন ভূপেনের বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বেচারার আশঙ্কা ও উদ্বেগের অবধি রহিল না। তাহার অভিজ্ঞতা কম, তবু নিজের সহজ-বুদ্ধিতে এটা অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছে যে এ ধরনের বিবাহে বর কখনও সুখী হয় না। আত্মীয়স্বজন সকলকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাহাকে লইয়া জীবন কাটাইবে এমন সম্পদই বা তাহার কৈ ? নিজের জন্য সে একবারও ভাবে না, ভূপেনকে স্বামী বলিবার অধিকার পাইয়াছে ইহাতেই সে সৌভাগ্যবতী মনে করে নিজেকে, কিন্তু দুশ্চিন্তা তাহার ভূপেনের জন্যই। শেষ পর্যন্ত সে জগদ্দল পাথরের মত স্বামীর বুকে চাপিয়া বসিল না ত ? পায়ের বেড়ী বলিয়া যদি কোন দিন মনে হয় তাহাকে ? সমস্ত রকম সুখ ও সৌভাগ্যের পথে অন্তরায় ? তাহা হইলে কল্যাণীর লজ্জা ও অনুতাপের যে শেষ থাকিবে না, এ পোড়া মুখ কোথায় ঢাকিবে ?

এমনি করিয়া—যে বিবাহকে অনায়াসে প্রণয়-মূলক বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে—সেই বিবাহের বর ও বধূ বিবাহের প্রথম রাত্রিটা পাশাপাশি বিনিদ্রই কাটাইল, অথচ কেহ কাহারও সহিত একটি কথাও কহিল না।

রাধাকমলবাবু সেই রাত্রেই হোস্টেলে ফিরিয়া কথাটা রাষ্ট্র করিয়া দিতে মাস্টার মহাশয়দের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অবধি রহিল না। অপূর্ববাবু সগর্বে বলিতে

লাগিলেন, কেমন ? বার বার বলি নি ? বিজয়কে যতটা ভালমানুষ তোমরা ভাবতে, ততটা নয়। কেমন গেঁথে তুললে ছোক্‌রাকে, দেখলে ত ? অবিশ্যি রুই গাঁথলে কি পুঁটি গাঁথলে তা বাছাধন টের পাবেন'খন্—তবু 'কাল্‌টি' মেয়েটা ত আপাতত ঘাড় থেকে নামল। সেই সঙ্গে একমুঠো ভাতের ব্যবস্থাও হ'ল।

অপূর্ববাবু যা-ই বলুন, মাস্টার মহাশয়দের দল অনেকেই সকাল বেলা অভিনন্দন জানাইতে উপস্থিত হইলেন। মায় ললিতবাবুও, মহেশবাবু সব ব্যবস্থা করিতেছেন খবর পাইয়া, আসিয়া পড়িলেন। যতীনবাবু কহিলেন, ও-সব শুনেছি না ভাই, আমাদের খাওয়াটা ফাঁকি দিলে চলবে না। কালকের ভোজটা চাই।

অপূর্ববাবু পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, বেশ করেছ ভায়া, এই ত মানুষের মত কাজ! তোমার দৃষ্টান্ত দেখে যদি আজকালকার ছেলেরা শেখে ত, মেয়ের বাপরা বাঁচে!

ভূপেন স্মিত-মুখে সকলের কথাই মানিয়া লইল। বিবাহের জন্য সে পোস্ট-আফিস হইতে অনেক কষ্টে সঞ্চিত গোটা-কতক টাকা তুলিয়া রাখিয়াছিল, সেইটাই মহেশবাবুর হাতে দিয়া কহিল. আপনি ত অনর্থক অনেকগুলো টাকা খরচ করলেন, কালকের খরচটা এই টাকা থেকে চালান। এই ক'জন লোক—যা হয় একটু আয়োজন করুন, আর ছেলেদের জন্যে যদি কিছু রসগোল্লা পাঠানো যায়—

মহেশবাবু টাকাটা হাতে করিয়া লইয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, সে যা হয় ব্যবস্থা হবে'খন্। ছেলেদের জন্যেও একটা ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি! এখন ত আজকের কাজটা চুকুক।

বাসি-বিয়ে সারিয়া ভূপেন ক্লান্তভাবে বাহিরের মাঠে আসিয়া বসিল। শ্রাবণের শেষে দিগ্‌দিগন্ত জোড়া মাঠ আর আকাশে যেখানে মেশামেশি হইয়াছে, সেখান পর্যন্ত মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছে। বৃষ্টি নাই অথচ ক'দিন ধরিয়াই এমনি মেঘলা করিয়া আছে। কেমন একটা বিষণ্ণতা চারিদিকে। আরও যেন এই জন্যই মনটা ভার হইয়া আছে, ভূপেন কিছুতেই কোন উৎসাহ পাইতেছে না।

বসিয়া বসিয়া সে বাড়ির কথা ভাবিতেছিল। মা আঘাত পাইবেন—বাবার কথা অত সে ভাবে না। তবে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া অনেক কিছু করিতে পারেন। হয়ত বা আসিয়া হাজিরই হইবেন, খানিকটা চেঁচামেচি গোলমাল করাও বিচিত্র নয়—সে সম্বন্ধে একটা আশংকা বরাবরই আছে। বোনগুলির কথা সে আগে বিশেষ ভাবিত না—এখন তাহাদের কথাও মনে পড়ে। কী আবহাওয়াতেই না আছে বেচারীরা! না আছে তাহাদের কোন শিক্ষার ব্যবস্থা. আর না আছে অন্য কোন কাজ। মনের বিস্তৃতি লাভ হয়. কূপমণ্ডুকতা দূর হয় এমন কোন ব্যবস্থা নাই তাহাদের জন্য। কলিকাতার সংকীর্ণ গলির মধ্যে অন্ধকার বাড়ির দুইখানি ঘরে তাহাদের দিনরাত্রি কাটিতেছে, চিরকাল ধরিয়া একই ভাবে। তাহাদের কোন সুবন্দোবস্ত না করিয়া বিবাহ করাটা গর্হিতই হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন করিয়াই হউক তাহাদের জন্য কিছু করিতে হইবে—নহিলে নিজের বিবেকের কাছে এমন অপরাধী থাকা অত্যন্ত কণ্টকর।...

অনেকক্ষণ এই ভাবে বসিয়া থাকিবার পর রাখু ডাকিতে আসিল, জামাইবাবু,

রান্না হয়ে গেছে, ভেতরে চলুন।

জামাইবাবু! ডাকটা নূতন বটে। মাস্টারমশাই এই ডাকেই কান অভ্যস্ত হইয়া গেছে, তাছাড়া নূতন কোন জীবনে যে সে প্রবেশ করিয়াছে এটা এখনও যেন ভাবা যায় না। সে একটুখানি ম্লান হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। দেড়টার গাড়ি অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—বেলা কম হয় নাই।

আহারাদির পর মহেশবাবু চলিয়া গেলেন। কথা রহিল যে পরদিন সকালে আবার তাঁহারা আসিয়া বৌভাত ও ফুলশয্যার উদ্যোগ আয়োজন করিবেন। ব্যাপার যখন সামান্যই তখন আজ হইতে কিছু করার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বিদায় লইলে ভূপেন ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।—গত দুই রাত্রির জাগরণ ও ক্লান্তিতে তাহার চোখের পাতা যেন বুজিয়া আসিতেছে—আর কোন মতেই যেন জাগিয়া থাকা যায় না।···

ঘুম ভাঙ্গিতে তাহার প্রথমেই মনে পড়িল কল্যাণীর কথা। আগের দিন হইতে সে বেচারীর সঙ্গে একটিও কথা কওয়া হয় নাই, সে যে ভয় এবং দুঃখ দুই-ই পাইয়াছে তাহা ভূপেন বুঝিতে পারিল। বিশেষত এখন বাড়ি একেবারে খালি—নির্জন নিস্তব্ধ বাড়িতে এমন বিষণ্ণ আবহাওয়া লইয়া থাকা যায় না।

সে যখন ঘরের বাহিরে আসিল তখনও তেমনি মেঘলা করিয়া আছে—সন্ধ্যারও বিলম্ব দেরি নাই। চাহিয়া দেখিল পিসীমা তখন ঘুমাইতেছেন, কল্যাণী রান্নাঘরের চৌকাঠে স্তব্ধ হইয়া নতমুখে বসিয়া আছে। তাহার সেই বসিয়া থাকিবার দীন ভঙ্গিটিতে ভূপেনের মন অকস্মাৎ মমতা ও করুণায় ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া চুপিচুপি মিষ্ট কণ্ঠে ডাকিল—কল্যাণী!

কল্যাণী চমকিয়া উঠিয়া যেন ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল, কোন কথা কহিল না। ভূপেন আবার বলিল, এখানে এমন ক'রে বসে কেন কল্যাণী, আমার ওপর রাগ করেছ?

ঠিক সেই মুহূর্তে, কল্যাণী কোন উত্তর দিবার আগেই, বাহিরে যেন অনেকগুলি লোকের কথা-বলার আওয়াজ কানে গেল। আরও একটু বাদে অতি পরিচিত একটি কণ্ঠের অপ্রত্যাশিত আহ্বান আসিয়া পৌঁছিল, মাস্টার মশাই!

ভূপেন ও কল্যাণী দুজনেই বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিল। এ যে সন্ধ্যা!

সত্যই সন্ধ্যা। পিছনে একটি চাকর ও আর একটি মুটের মাথায় বিস্তর জিনিস চাপাইয়া কৌতুকোজ্জ্বল মুখে সন্ধ্যা আসিয়া ভিতরের উঠানে দাঁড়াইল। ভূপেন কাছে আসিতে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে কহিল, চিঠি পেলুম তখন দশটা। তখনই দাদুর অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি—কিছু বাজার ক'রে বারোটার গাড়ি ধ'রে চলে এলুম। এখানের কথা যা শুনেছি, হয়ত কিছুই পাওয়া যাবে না মনে ক'রে বৌভাতের বাজার আমি মোটামুটি ক'রেই এনেছি। আরও ঢের মাল পড়ে আছে স্টেশনে, ওরা গিয়ে আনবে। ইস্কুলের ছেলেদের সবাইকে আমি ভাল ক'রে খাওয়াবো, আপনি কিন্তু 'না' বলতে পারবেন না। রান্নার লোকও রাত্রের গাড়িতে আসবে, আর দারোয়ান আসবে কাল ফুলের গহনা নিয়ে।

তারপরই কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিল, কী কল্যাণীদি, কথা কইছেন না

যে ? খুব ফাঁকি দেবেন মনে করেছিলেন, না ? আমি কিন্তু এ আগেই জানতুম।

সে কল্যাণীকেও একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া বুকের মধ্যে হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিল। তাহার মধ্যে ছিল একজোড়া সোনার বালা এবং একগাছি সরু হার। সস্নেহে ও সযত্নে কল্যাণীকে পরাইয়া দিতে দিতে কহিল, এ যেন আমার স্পর্ধা ভাববেন না ভাই—এ দাদু পাঠিয়েছেন, আশীর্বাদী।

অভিভূত ভূপেন এতক্ষণে কণ্ঠস্বর খুঁজিয়া পাইল। কহিল, এ সব কী করেছ সন্ধ্যা ? পাগলের মত কত খরচ করেছ ?

অনুনয়ের সুরে অথচ হাসি-হাসি মুখে সন্ধ্যা কহিল, আজকের দিনটা আর বকবেন না মাস্টার মশাই, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আপনার বিয়ের খবর পেয়ে কী আনন্দ যে হ'লো তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। আজ পাগল না হ'লে কবে হ'ব বলুন ? সত্যি বিশ্বাস করুন, আমার খুব আনন্দ হয়েছে —বড় খুশী হয়েছি—

কিন্তু কথা কহিতে কহিতে ভূপেনের চোখের দিকে চাহিয়া, অকস্মাৎ মুখের হাসি মিলাইবার পূর্বেই, তাহার সেই আশ্চর্য সুন্দর বিস্ফারিত চোখ দুইটির কূল ছাপাইয়া কপোল প্লাবিত করিয়া যেন অনেকক্ষণের জমাট-বাঁধা একরাশ অবোধ অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিছুতে কোন মতেই সন্ধ্যা তাহাদের শাসন করিতে পারিল না।

॥ ২৩ ॥

সেদিন সন্ধ্যার সেই অশ্রুপ্লাবিত চোখ দুইটির মধ্য দিয়া ভূপেন শুধু যে সন্ধ্যারই মনের ছবিটা পরিষ্কার দেখিতে পাইল তাহা নয়, সে-আয়নাতে এতদিন পরে সে নিজেরও মনের চেহারাটা স্পষ্ট করিয়া দেখিল এবং যা ছিল এতদিন মনের অবচেতনে ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হইয়া, আজ তাহাকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল। আর আত্মপ্রবঞ্চনা করা সম্ভব নয়। পুরুষ জন্ম হইতে জন্মান্তরে যে একটি মাত্র মেয়ের জন্যই সাধনা করে সে নারী তাহার সন্ধ্যা— কল্যাণী নয়।

কিন্তু সে অভিভূতের মতই দাঁড়াইয়া রহিল। সবটা জড়াইয়া যেন তাহার মানবিক ধারণা-শক্তির চেয়ে অনেক বেশী, মস্তিষ্ক এতখানি বিভিন্ন চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারে না। এমন কি সন্ধ্যার ওষ্ঠ দুইটি কথা কহিতে গিয়া যে শুধু নীরবে কাঁপিতেই লাগিল, সে দিকে চাহিয়া একটি সান্ত্বনার বাণীও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল প্রথম কল্যাণীরই। সে একেবারে কাছে আসিয়া সন্ধ্যাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। তারপর নিজের আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছিয়া লইয়া কহিল, এস ভাই, ভেতরে এস। আনন্দের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই। তোমার মাস্টার মশাই তোমারই রইলেন—একদিন সে কথাটা বুঝতে পারবে। তোমাদের সম্পর্ক যে অনেক বড় বোন।

সে এক-রকম জোর করিয়াই সন্ধ্যাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

সন্ধ্যা অবশ্য একটু পরেই অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছুতেই যেন ভূপেনের কাছে সহজ হইতে পারিল না। বরং মনে হইতে লাগিল যে, নিজের ক্ষণিক দুর্বলতার লজ্জায় তাহার দিকে সে মুখ তুলিয়া তাকাইতেও পারিতেছে না।

সে রাত্রিটাও কাটিল একটা থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে। পরের দিন কলিকাতা হইতে আরও লোকজন আসিয়া পড়িল; ভোজনের আয়োজন ও বহু লোকের কোলাহলে স্বভাবতই যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—সে তপ্ত হাওয়ায় ইহারাও একটু তাতিয়া উঠিল। কিন্তু ভূপেনের মনির ক্লান্তি ও জড়তা যেন কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। আহারাদির আয়োজন হইয়াছিল দিনের বেলাতেই—কিন্তু শেষ হইতে হইতে বাজিয়া গেল রাত্রি নয়টা। সন্ধ্যা তখনই তাড়া লাগাইয়া ফুল-শয্যার ব্যবস্থা করিল—মহেশবাবুর স্ত্রী ও ডাক্তারবাবুর স্ত্রী এয়োতির কাজ করিবেন, সেজন্যও অবশ্য একটা তাড়া ছিল; কারণ, তাঁহাদের বেশী রাত্রে বাড়ি ফিরিতে অসুবিধা হইবে। কিন্তু সন্ধ্যার তাড়ার কারণটা যে অন্য, সেটা একটু পরেই বোঝা গেল—সে নিজে হাতে কল্যাণীকে ফলের গহনায় সাজাইয়া দিল বটে, তবে অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই অপেক্ষা করিল না, দাদুর অসুখের অজুহাতে এগারোটার ট্রেনেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। রাত্রিটা এখানেই কোন রকমে কাটাইবার জন্য সকলে অনুরোধ করিলেন, সন্ধ্যা উৎসাহ দিলে মহেশবাবুর স্ত্রীও রাতটা থাকিয়া তাহার সহিত একসঙ্গে আড়ি পাতিতে পারেন, এমন প্রস্তাবও করিলেন। এমন কি, স্বয়ং ভূপেনও একবার অনুরোধ করিল কিন্তু সন্ধ্যা কিছুতেই রাজী হইল না। এত রাত্রে বর্ধমানে গিয়া রাত্রি আড়াইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে—রাত্রির ট্রেন নিরাপদ নয়, এ-সব কোন যুক্তিই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না।

ফলে সারাদিন ধরিয়া ভূপেনের বুকের মধ্যে পাষাণ-ভার যতটা হালকা হইয়া আসিয়াছিল তাহা যেন দ্বিগুণ ভারী হইয়া চাপিয়া বসিল। কল্যাণীও একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, যেন নিজেকে খানিকটা অপরাধীও মনে হইতে লাগিল তাহার। শুধু তাহাই নয়—মহেশবাবুর স্ত্রী প্রভৃতি যে দুই-একজন মহিলা ছিলেন, তাঁহাদের যেন এই ব্যাপারের পর আর কোন উৎসাহ রহিল না—অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা যে যাহার বাড়ি চলিয়া গেলেন

ফুলশয্যার রাত।

নিঃশব্দে নব-বিবাহিতা স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুইয়া, কেহ কাহারও অপরিচিত নয়, তবু প্রেমালাপ ত দূরের কথা—কথা কহিবার ইচ্ছা যেন নাই। প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে জীর্ণ খড়ের চালাটার দিকে চাহিয়া ভূপেন সেই কথাটাই ভাবিতে লাগিল। ইহারই জন্য কি সে এত কাণ্ড করিয়া বাপ-মার অমতে হঠাৎ এই বিবাহ করিয়া বসিল।…এ রাতটি সম্বন্ধে মানুষের কত স্বপ্নই থাকে—ভূপেনেরও কম ছিল না—কিন্তু এ কী হইল? তাহার হঠকারিতায় শুধু তাহার নিজের জীবন এবং ভবিষ্যৎই বিড়ম্বিত হইয়া উঠিল না—আরও দইটি জীবনও বোধ করি নষ্ট হইয়া গেল। বেচারী কল্যাণী! তাহাকে ত ভূপেনই জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছে,

সে ত দাবীও করে নাই, আশাও রাখে নাই—শুধু শুধু তাহাকে এ দুর্ভাগ্যের ঘূর্ণাবর্তে টানিয়া না আনিলেই ভাল হইত বোধ হয়। কে জানে হয়ত তাহার একদিন ভাল ঘরেই বিবাহ হইতে পারিত, এমন ত কত অসম্ভবই সম্ভব হয়, সে ক্ষেত্রে সে স্বামী-পুত্র লইয়া সুখেই ঘর-সংসার করিতে পারিত।

কল্যাণীর কথাটা মনে হইতেই সে স্ত্রী সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। যে কাজ সে করিয়াছে তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়াই করিয়াছে, এখন তার পিছাইলে চলিবে না। সন্ধ্যার মান-অভিমান সন্ধ্যারই থাক্—তাহাদের দিবাস্বপ্ন হয়ত বিলাস, সাধারণ জীবনের প্রতিটি দিন-রাত্রির মধ্যে সে বিলাসের স্থান নাই। আজ আর ভূপেনের কিছু অজানা নাই—আজ সমস্তটাই চোখের সামনে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। যেটাকে সে সন্ধ্যার ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা বলিয়া মনে করিয়াছে, আসলে সেটা প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা ও অভিমান। হ্যাঁ—কল্যাণী সম্বন্ধে সে ঈর্ষাই বহন করিত; শিক্ষা ও সংস্কারে যত অসাধারণ মেয়েই সে হোক, ভালবাসার এই স্তরে সব মেয়েই সমান। সেখানে সন্ধ্যার সহিত অন্য যে-কোন মেয়ের কোনও তফাৎ নাই।

অথচ, আশ্চর্য এই যে, এই সহজ কথাটা আজ যেমন সে অনায়াসে বুঝিল, সেদিন একবারও কি কল্পনা করিতে পারে নাই। তাহা হইলে হয়ত—ভূপেন মনে মনে বুঝি একটা অনুশোচনাই অনুভব করে—এতটা তাড়াতাড়ি সে করিত না।... করিবার প্রয়োজন হইত না।

কিন্তু না—সে জোর করিয়া মনকে কল্যাণীর দিকে ফিরাইয়া আনে। যে কথা সন্ধ্যার দাদু সেদিন বলিয়াছিলেন তাহার পর আর অন্য কোন আশা রাখা সম্ভব ছিল না। কোন আত্মসম্মানবিশিষ্ট লোকের পক্ষে সে আশা রাখা উচিতও নয়। সন্ধ্যা ধনীদুহিতা, তাহার নানা রকম খেয়াল শোভা পায়—ভূপেন দরিদ্র স্কুলমাস্টার, তাহার কল্যাণীই ভাল। যে মেয়েটিকে সে জোর করিয়া সঙ্গিনী করিয়াছে, তাহার মনের অর্ধ-বিকশিত বাসনার সহস্রদলটিকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিবার দায়িত্ব তাহারই—তা যদি সে পারে তবেই জীবন ধন্য হইবে।

কল্যাণীর দিকে ফিরিয়া দেখিল, সে কাঠ হইয়া শুইয়া আছে। একবার সন্দেহ হইল বুঝি সে নিঃশব্দে কাঁদিতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিল; কান্নাও আর তাহার নাই, শুকাইয়া গিয়াছে। ভূপেন আস্তে আস্তে একখানা হাত কল্যাণীর গায়ের উপর রাখিয়া ডাকিল, কল্যাণী!

কল্যাণী শিহরিয়া উঠিল একবার, কিন্তু উত্তর দিল না। তখন ভূপেন তাহাকে জোর করিয়াই কাছে টানিয়া লইল, একেবারে বুকের মধ্যে আনিয়া আবার ডাকিল, কল্যাণী, আমার কি কিছু অপরাধ হয়েছে?

কল্যাণী স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তাহার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের অভাবনীয়ত্ব অনুভব করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

—তবে? জোর করিয়া কল্যাণীর মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া তাহার নিমীলিত নয়নে নিজের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চুপি চুপি কহিল, তবে কি আমার ওপর তোমার বিশ্বাস নেই? তোমার ভাগ্য আমার সঙ্গে জড়িয়ে কি তোমার ভয় করছে?

ইহার উত্তরে অনেক কথাই কল্যাণী বলিতে পারিত, কিন্তু বলিল না। তেমনি মাথা নাড়িয়াই জানাইল, না। ভয় ত তাহার করিবার কথা নয়—ভূপেনকে স্বামী বলিয়া উল্লেখ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াই ত সে ধন্য, কৃতার্থ। তাহার আর ভয় কি—যে কোন দুঃখের মূল্যেই সে এই একটি রাত্রির জন্য দিতে প্রস্তুত আছে। তাহার সহিত ভাগ্য জড়াইয়া স্বামী ভয় পাইতেছেন কিনা—এই তাহার আশঙ্কা।

ভূপেন নির্বোধের মত বলিয়া ফেলিল, তবে কথা কইছ না কেন? অমন চুপ ক'রে আছ কেন?

এবার কল্যাণী কথা কহিল। চোখ না খুলিয়াই ম্লান একটু হাসিয়া কহিল, কথা কি আগে আমারই কইবার কথা?

—তা বটে! ভূপেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। কল্যাণীর হাসি-মুখের ঐ অল্প কয়েকটি কথা যেন নিঃশব্দে অনেকগুলি অভিযোগ বহন করিয়া আনিল। সে কল্যাণীকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তা নয়। তবে তোমার শুয়ে থাকবার ভঙ্গিতে যেন আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ প্রকাশ পাচ্ছিল। তাই কি?

মুহূর্ত-কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কল্যাণী আস্তে আস্তে কহিল, অভিযোগ কি আমার থাকা সম্ভব? তবে নিজেকে অপরাধী ভাবছিলাম বলেই—

সে মধ্যপথেই থামিয়া গেল। ভূপেন কহিল, অপরাধ? তোমার কী অপরাধ থাকতে পারে কল্যাণী?

কল্যাণী মুখখানা যেন আরও নিবিড়ভাবে ভূপেনের বুকের মধ্যে গুঁজিয়া কহিল, আমাকে দয়া করতে গিয়েই ত নিজের এত বড় সর্বনাশ করলেন!

—ছিঃ! দয়া কথাটা উচ্চারণ করতে নেই। আমি তোমাকে ভালবেসে নিয়েছি এটা কেন ভাবতে পারছ না।

—হয়ত তাই। কল্যাণী চরম সাহসে ভর করিয়া বলিল, তবু আমি যে তা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার কোন যোগ্যতাই নেই, সে কথা আমি কী ক'রে ভুলব বলুন।...তা ছাড়া আপনি যেটা ভাবছেন হয়ত সেটাই ভুল—সে ভুল যে দিন ভাঙবে সে দিন এত বড় অনিষ্ট করবার জন্যে আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবেন না।

তারপর মুহূর্ত-কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিল, আমি নিজেকে দিয়েই সন্ধ্যাদি'র দুঃখের কথাটা বুঝতে পারছি—তার লজ্জায় মরে যাচ্ছি, আমার মত সামান্য মেয়ের জন্যে তার জীবন ব্যর্থ হ'তে দেওয়াটা কোন মতেই উচিত হয় নি।

ভূপেন তাহার ললাটে একটি চুম্বন করিয়া কহিল, তোমার কোন লজ্জা, কোন অপরাধ নেই। সন্ধ্যা বড়লোকের মেয়ে—তার জীবন এত সহজে ব্যর্থ হয় না।

কল্যাণী এবারও মৃদু হাসিয়া কহিল, বড়লোকের মেয়েদের হৃদয় থাকে না এ কথা অন্তত সন্ধ্যাদিকে দেখবার পর আর বিশ্বাস করতে পারি না। আপনি তার যা অনিষ্ট করেছেন—তার ওপর অন্তত এ অপবাদটা আর দেবেন না।

তীক্ষ্ণ ছুরির মত ভূপেনের বুকে কী যেন একটা আঘাত বিঁধিল। সেই প্রায়ান্ধকার প্রদীপের আলোতে কল্যাণী স্বামীর মুখের চেহারাটা দেখিতে পাইল না—শুধু তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিল।

কল্যাণীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমক ভাঙিয়া ভূপেন কথাটাকে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, কেউ যদি অকারণে দুঃখ পায় আমি কী করব বলো, আমার দিক থেকে অন্তত কোন প্রশ্রয় ছিল না। আমি যাকে বেছে নিয়েছি নিজের জীবন-সঙ্গিনী ক'রে, তাকে শুধু দয়া ক'রেই আত্মীয়-স্বজন সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেছি, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। তুমি আমাকে বিশ্বাস ক'রো—আমার ভালবাসায় বিশ্বাস রেখো, এইটুকুই শুধু চাই। তোমার মনে কোন সংশয় থাকলে জীবনের সোজা পথে কী ক'রে চলব বলো ?

শেষের কথা সব বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না, শুধু প্রথম দিককার কথাগুলিই অসহ্য একটা সুখের বেদনাতে কল্যাণীর মনের মধ্যে রিণ্ রিণ্ করিতে লাগিল। হায় রে। তবু কথাটা যদি সে সত্য-সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিত। সন্ধ্যার চোখের মধ্যে যে বিপুল ইতিহাস লিখিত ছিল তাহা ভূপেন অন্ধ বলিয়াই হয়ত এতদিন দেখিতে পায় নাই—কিন্তু কল্যাণী ঠিকই দেখিয়াছে। যেখানে ভালবাসার প্রশ্ন সেখানে বোধ হয় কোন মেয়েই ভুল দেখে না। তাহাদের সজাগ উদগ্র দৃষ্টিতে অনেক সময় মনের অবচেতন স্তরের কথাও ধরা পড়ে।

কল্যাণী প্রাণপণ চেষ্টায় আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস দমন করিয়া ভূপেনের উত্তপ্ত চুম্বনের মধ্যে নিজেকে যেন নিঃশেষে ছাড়িয়া দিল।

॥ ২৪ ॥

উপেনবাবুর দিক হইতে যে আক্রমণটা আশঙ্কা করিয়াছিল ভূপেন, সেটা আর আসিল না। তাঁহারা কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয় অত চেঁচামেচি করিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু ঘটনাটা যখন সত্যসত্যই ঘটিল তখন সে আঘাতের তীব্রতায় তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মায়ের মনে কী ছিল কে জানে—হয়ত বা শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করিয়া পুত্র-পুত্রবধূকে ডাকিতেও পারিতেন, কিন্তু উপেনবাবুর মুখের চেহারা দেখিয়া তিনিও চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন। উপেনবাবুর সমস্ত প্রকৃতি যেন, এই একটা আঘাতে, একেবারে বদলাইয়া গেল। তিনি এখন কাহারও সহিত কথা বলেন না—মেয়েদের আগে কারণে-অকারণে বকিতেন, এখন তাহাদের সঙ্গেও কথা কওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। মাথা নিচু করিয়া অফিস যান, অফিস হইতে আর বাড়ি আসেন না—একেবারে একটা টিউশনী সারিয়া গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরেন এবং কোন মতে দু'টি ভাত মুখে গুজিয়া শুইয়া পড়েন। শুধু তাই নয়, মানুষটা যেন এই কয় দিনে একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছেন।

এ-সব ভূপেন অবশ্য জানিতে পারে না—তবে তাঁহাদের এই স্তব্ধতায় অনেকখানি অনুমান করিতে পারে। তিরস্কার, অনুযোগ কোনটাই যখন আসিল না

অথন তাঁহাদের আঘাতের গুরুত্ব বুঝিতে তাহার দেরি হইল না। মাসের প্রথমে সে নিয়মিতভাবেই টাকা পাঠাইয়াছিল—সে টাকা যথাসময়ে ফেরত আসিল। এ আশংকাটা ভূপেনের ছিলই, সুতরাং সে বিস্মিত হইল না, টাকাটা আলাদা করিয়া পোস্ট অফিসে জমা রাখিয়া দিল।

বিবাহের কিছুদিন পরে ভূপেন দুখানা চিঠি লিখিল, একটা সন্ধ্যাকে ও একটা শান্তিকে। শান্তি জবাবই দিল না—সন্ধ্যার কাছ হইতে কয়েকদিন পরেই উত্তর আসিল। সে চিঠি পড়িয়াই ভূপেন বুঝিল যে সন্ধ্যা প্রাণপণ চেষ্টায় মুখোশ পরিয়াছে। চিঠি ছোট নয়—ইচ্ছা করিয়াই সে বড় চিঠি লিখিয়াছে, পাছে মনের কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায়। অথচ সে চিঠিতে অন্তরঙ্গ কথা একটিও নাই। এ-কথা সে-কথা—লেখাপড়ার কথাই বেশী। দাদুর অসুখের কথা, ভূপেনের ইস্কুলের কথা এমনি আরও অনেক কথা আছে। সহজ হইবারই চেষ্টা করিয়াছে তবু সে যে সহজ হইতে পারে নাই, সেটা ভূপেনের কাছে চাপা থাকে না।

এমন করিয়া আত্মীয়-স্বজন এবং সহস্র-আত্মীয়াধিক সন্ধ্যার নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূপেনকে নূতন জীবন শুরু করিতে হইল। সে কাজের মধ্যেই নিজেকে ডুবাইয়া দিল। ইস্কুলে অনেক বেশী কাজ করে সে ইচ্ছা করিয়াই, তার পর কোচিং আছে। সালেক ও পদনকে এবং আরও গুটিপাঁচছয় ছেলেকে লইয়া আজকাল সে বাড়িতেই পড়াইতে বসে। এখানে বিজয়বাবুও তাহাকে খানিকটা সাহায্য করেন, মুখে মুখে তিনি অনেকটা পড়ান। অন্য ছেলেদের ছাড়িয়া দিবার পরও সে ঘণ্টাখানেক সালেক ও পদনকে লইয়া কাটায়—যেন উহাদের সার্থকতার উপর তাহারই জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। এই সব কাজের ফাঁকে যেটুকু সময় পায়, অভাবের সংসারে জোড়াতালি দিতে দিতেই কাটিয়া যায়। বাজার-হাট সবাই তাহাকে দেখিতে হয়—রাধু অবশ্য শারীরিক খানিকটা সাহায্য করে। এ ছাড়া কোথায় ঘরের চাল সারানো, সস্তায় কোথায় খড় পাওয়া যায় সংগ্রহ করা—এজন্যও খানিকটা ছুটাছুটি আছে। বছর-দুই আগেকার কলিকাতার ছাত্র ভূপেনকে এখন যেন সে নিজেই চিনিতে পারে না। এ-সব কাজ হয়ত সব তাহার না করিলেও চলে, কিন্তু খানিকটা সে ইচ্ছা করিয়াই করে। সংসারের সব কিছুর সঙ্গে সে পরিচিত হইতে চায়—অনেক পোড় খাইয়া খাঁটি ইস্পাত হইবার ইচ্ছা তাহার।

এই সমস্ত কাজে ও অকাজে সারাদিন কাটাইয়া গভীর রাত্রে ও ভোরবেলা সে নিজের পড়া পড়িতে বসে। আর অবহেলা করা সম্ভব নয়—এম. এ. পরীক্ষা দিয়া পার্থিব উন্নতির কিছু চেষ্টা করিতেই হইবে। এই সামান্য আয়ে এত বড় একটা সংসার চালাইয়া ভগিনীদের বিবাহের জন্য টাকা জমানো অত্যন্ত কঠিন। বস্তুত তিনটি সংসারের চিন্তা তাহার—একটা নিজের, একটা বিজয়বাবুর এবং আর একটা তাহার বাবার। সুতরাং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে দেশের ছেলেদের তৈরী করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করিবার মত অবস্থা আর তাহার নাই।

কিন্তু—এক-এক সময়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করে—এই একটানা কর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখার মূলে কি এই বাহ্যিক কারণগুলিই সব? অত্যন্ত লজ্জার

সহিত হইলেও, তাহাকে তখন মনে মনে স্বীকার করিতে হয় যে, নিজের সুদা সচেতন মনের কাছ হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টাও কতকটা আছে ইহার মধ্যে। সন্ধ্যার কাছ হইতে চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আগে পর্যন্ত সে বুঝিতে পারে নাই যে, সন্ধ্যা ঠিক তাহার কতখানি। তাহার সম্বন্ধে সমস্ত আশা চিরকালের মত বিসর্জন দিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, এত কাল সে নিজেকে প্রবঞ্চনাই করিয়াছে। অনেক আশা ছিল তাহার এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া। সহজে সে এই ছাত্রীটিকে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া ভালবাসার প্রকৃতিটা বুঝিতে পারে নাই। আজ সে বুঝিযাছে—শুধু সন্ধ্যাকে দিয়া নয়, এখানকার ছাত্রদের দিয়াও—যে, বাপ-মা যেমন আত্মজদের মধ্যে নিজেদেরই দেখেন, তেমনি দেখেন গুরু তাঁহার মেধা-সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিজের আত্মাকেই। যা নিজের সৃষ্টি, যাহার মধ্যে নিজের মনন ও কল্পনা প্রতিফলিত হয়, তাহার প্রতি আকর্ষণ উগ্র হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ, মানুষ ভালবাসে সবচেয়ে নিজেকেই। ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে অন্য আকর্ষণ থাকা সম্ভব নয়, তবু যে পরিমাণ ঈর্ষা ও একাগ্রতা সে দেখিয়াছে, তাহাতেই ভালবাসার তীব্রতাটা অনায়াসে অনুমান করিতে পারে। অনেক ভাড়াটেদের সহিত ভূপেন বাস করিয়াছে—জীবন দর্শন করিবার সুযোগ মিলিয়াছে তাহার বিস্তর, পুত্রবধূদের সম্বন্ধে শাশুড়ীদের যে প্রকার বিদ্বেষ সে দেখিয়াছে, তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে এমন প্রশ্নও মনে উঁকি মারিয়াছে যে পুত্রের হৃদয়ে ভাগ বসাইবার জন্যই কি এই বিদ্বেষ তাঁহাদের! কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায়, যেখানে সম্পর্কগত কোন বাধা নাই, যেটুকু আছে শুধুই সংস্কারগত—সেখানে যদি আকর্ষণটা যৌন-সম্পর্কে পরিণত হয় ত ঠেকাইবে কে? অবশ্য এ পরিণতিটা আজও ভূপেন মানিতে প্রস্তুত নয়—আজও শব্দটা মনে হইলে সে শিহরিয়া ওঠে—ঐ ছাত্রীটি যে তাহার জীবনের প্রায় সমস্ত আনন্দদায়ক অনুভূতির সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, এ কথা আজ সে অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া?···এ সব কথা এত দিন এমন করিয়া ভাবে নাই, অনভিজ্ঞ ও অন্ধ ছিল বলিয়াই সে মোহিতবাবুর উপর সে-দিন অভিমান করিয়াছিল, কিন্তু আজ তাঁহার সতর্কতার কারণ সম্বন্ধে ভূপেনের মনে কোন সংশয় নাই। বরং মনে হয় আরও আগে সাবধান হইলেই তিনি ভাল করিতেন।

তবু—নিজের মানস-সমস্যার জটিলতায় ভূপেন নিজেই বিস্মিত হয়। কল্যাণী সম্বন্ধেও আকর্ষণ তাহার ত কম নয়। বিশেষ করিয়া যত দিন যাইতেছে সেটা শ্রদ্ধার সহিত মিশিয়া দৈহিক আকর্ষণের স্তর ছাড়াইয়া যেন আরও অনেক উপরে উঠিতেছে। কল্যাণী আশ্চর্য, কল্যাণী অদ্ভুত। শুধু যে সে প্রাণপণে তাহার সাংসারিক দায়িত্বের বোঝা হালকা করিয়া নিজের কাঁধে তুলিয়া লইতেছে কিংবা প্রতিটি মুহূর্ত অতন্দ্র থাকিয়া ইচ্ছা বুঝিয়া তাহার সেবা করিতেছে তাই নয়—মেয়েদের যেটা সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সেই অভিমান পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছে। সে বোঝে যে তাহার স্বামী কেন এমন করিয়া প্রাণপণে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, তবু কোন দিন একটি অনুযোগ করে না, বরং নিজেকে সযত্নে তাঁহার সামনে হইতে সরাইয়া রাখে। তাই বলিয়া সে সরাইয়া রাখার

মধ্যে এতটুকু অভিমানের প্রশ্ন নাই—ভূপেন তাহার মানসিক বিপ্লবের মধ্য হইতে স্ত্রী সম্বন্ধে যখনই সচেতন হইয়া ওঠে, যখনই কাছে ডাকে, তখনই সে ভূপেনের আদরের মধ্যে নিজেকে নিঃশব্দে ও নিঃশেষে বিলাইয়া দেয়। প্রয়োজন মত কাছে আসে, প্রয়োজন ফুরাইলেই কোন ক্ষোভ, কোন দাবি না রাখিয়া দূরে সরিয়া যায় —নিজের উপস্থিতি বা অধিকার কোনটা দিয়াই স্বামীর জীবনকে বিড়ম্বিত করে না। যে মেয়েটি নিজের আত্মসম্মান পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছে তাহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় বোধ না করিয়া পারে না ভূপেন। হ্যাঁ—কল্যাণীকে পাইয়া তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে, কল্যাণী মধুর, কল্যাণী অপরিহার্য—কল্যাণীর জন্য আর সকলকে ছাড়িয়াও কোন ক্ষোভ নাই তাহার—অথচ, তবু যেন কোথায় একটা অভাব, একটা শূন্যতাবোধ পীড়া দিতে থাকে। মনে হয়, কল্যাণী তাহার অর্ধাঙ্গিনী কিন্তু সহধর্মিণী নয়, কল্যাণী প্রিয়া কিন্তু মানসী নয়। কল্যাণী অনেকখানি তবু সবটা নয়। কল্যাণীকে পাইলে জীবন সার্থক হয়—কিন্তু তাহার জন্য তপস্যা করা যায় না। তাহার আত্মা যুগ যুগ ধরিয়া যাহার পদধ্বনি গণিয়াছে সে আর কেহ—কল্যাণী নয়।

তবু দিন কাটে। সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের মত সংসার করিতে হয়। বংলা দেশের অধিকাংশ ইস্কুল-মাস্টারের মতই প্রায় অর্ধাশনে শিক্ষকতা করে ভূপেন। মহেশবাবু তাঁহার কথা রাখিয়াছেন—নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাইয়া কমিটির বিরোধিতা সত্ত্বেও ভূপেনের পাঁচ টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিয়াছেন। যেখানে মোট আয় ছিল প'য়তাল্লিশ টাকা—সেখানে পাঁচ টাকা বৃদ্ধি পাওয়াতে সুবিধা হয় বৈ কি। মহেশবাবুর প্রতি দিনদিনই সে আকৃষ্ট হইতেছে। বেশ মানুষটি। সব চেয়ে যেটা তাঁহার বড় গুণ, তিনি মোটেই কানপাতলা নন্। ইস্কুল হইতে তাহার ঈর্ষাতুর সহযোগীরা অনেক কথাই মহেশবাবুর কানে তোলেন, তাহা সে প্রতিনিয়তই টের পায়, কিন্তু মহেশবাবু সে সব অভিযোগের সত্য-মিথ্যা এক দিনও যাচাই করেন না, নিজের মানুষ চিনিবার ক্ষমতায় অটল হইয়া বসিয়া থাকেন।

আর বিস্মিত হয় সে ললিতবাবুকে দেখিয়া। নিয়মাবলীর বাহিরে তিনি এক পা-ও বাড়াইবেন না, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকিলেও না। সেক্রেটারী কোন কথা বলিলেও তিনি বলেন, আপনি লিখিত অর্ডার দিন—নইলে পারব না। তাঁহার মূল কর্তব্য যে ছেলেদের শিক্ষাদান কবা এবং শিক্ষালাভের উপায়টাকে অব্যাহত রাখা, এ-কথা তিনি কিছুতেই মানেন না—অফিসের কাজ চালানোকেই তিনি তাঁহার সব চেয়ে বড় কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। এ কথা লইয়া প্রায়ই ভূপেনের সহিত তাঁহার ঠোকাঠুকি বাধে। তবে ভদ্রলোকের একটা গুণ আছে যে, তিনি ভূপেন সম্বন্ধে অন্য শিক্ষকদের মতই ঈর্ষিত হইলেও—অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করেন না।

ললিতবাবুর এই অদ্ভুত মনোভাবের যে একটা ইতিহাস আছে ভূপেন তাহা বোঝে—কিন্তু কোন মতেই আসল কারণটা তাঁহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারে না। শিক্ষকদের কর্তব্যবোধের কথা উঠিলেই তিনি বিরক্ত হন কেন, এ

কৌতূহল তাহার দিন দিন বাড়িয়াই যায়। অবশেষে একদিন কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভূপেন সে-দিন তাঁহার ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, দেখুন আপনি ত আমার সব কথাকেই বাড়াবাড়ি মনে করেন—কিন্তু ক্লাসে বসে শিক্ষকদের সিগারেট খাওয়া এবং থিয়েটারের গান গাওয়াটাও কি আপনি অনুমোদন করতে বলেন?

একটু বাঁকা হাসিয়া ললিতবাবু প্রশ্ন করিলেন, লোকটি কে?

ভূপেন মুহূর্ত কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, নামটা তো আমার করা উচিত নয়, এ-সব আপনারই দেখবার কথা। তবু আমিই বলছি—সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই ক্লাসে বসে তামাক খেতেন, আমরা বলাতেই তিনি বন্ধ করেছেন · কিন্তু অধর সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে রাজী নয়। সেটা যদি বা সহ্য করেছিলুম—যে সব গানের নমুনা পাচ্ছি ছাত্রদের মারফৎ—তার পরেও যদি চুপ ক'রে থাকি ত অপরাধ হবে।

অধর মহেশবাবুর দূর-সম্পর্কের ভাগিনেয়—আই-এ ফেল করিয়া মাস্টারীতে ঢুকিয়াছে। গান-বাজনায় অত্যন্ত ঝোঁক, অবসর পাইলেই বাড়ি গিয়া তবলা ঠোকে।

ললিতবাবু জবাব দিলেন, ক্লাসে বসে সিগারেট খাওয়ায় দোষটা কি মশাই? আমাদের আইনে ত কোথাও বাধা নেই। ছাত্ররা ত আর গুরুজন নয়।

—গুরুজনদের সামনে খেলে আমি কিছুই বলতাম না, কারণ তাঁদের আর চরিত্র গঠন করবার সময় নেই, তাঁদের যা হবার তা হয়েই গেছে। কিন্তু ওরা ছেলে-মানুষ, শিক্ষকদের ওরা আদর্শ বলে মনে করে, তিনি যদি ওদের সামনে বসেই বিড়ি খান আর প্রেমের গান ভাঁজেন ত সেটা ওরা অন্যায় বলে ভাববার অবসরই যে পাবে না। এর পর মুখে ওদের অন্যায় বললে শুনবে কেন? ভাববে একটা মজার জিনিস থেকে নিতান্ত স্বার্থপরের মত আমরা ওদের বঞ্চিত করতে চাইছি। আমার ত মনে হয় যে প্রত্যেক লোকেরই, যারা ছেলেদের মানুষ করতে চায়, গুরুজনদের সমীহ না ক'রে ছেলে-মেয়েদেরই সমীহ করা উচিত, অন্যায় কাজের জন্য তাদের কাছেই বেশী লজ্জাবোধ করা উচিত।

ললিতবাবু এবারেও বিদ্রূপের সুরে কহিলেন, যাদের জন্য আপনার অত মাথা-ব্যথা তাদের মধ্যে শতকরা সত্তরটা ছেলেই বাড়িতে তামাক ধরেছে কি না সেটা আগে খবর নিন।

ভূপেন শান্তভাবেই জবাব দিল, হয়ত তাই, হয়ত বা আরও বেশী—খুব সম্ভব শতকরা নব্বই জনই খায়। কিন্তু যে দশজন এখনও ধরে নি আমরা কি তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করব না? যে দশজনের এখনও কিছু হবার আশা আছে তাদের জন্যই ত আমাদের আরও সতর্ক হওয়া দরকার।

—বিড়ি-সিগারেট ত আজকাল সবাই খাচ্ছে—এমন কি অনিষ্ট হচ্ছে তাদের? কলকাতার সব ছেলেরাই প্রায় খায়। এদেরও বাপ-দাদা ছেলেবেলা থেকে তামাক খেয়ে আসছে, তারা ত আর মরে যায় নি।

—ও। যায় নি বটে—তবু সেটা না খেলে যে ওরা আরও সুস্থ থাকত এটা

বোধ করি আপনিও মানবেন। তা ছাড়া ওটা একটা symbol—ঐ বাধাটা ভাঙলে কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে। ঐ বাধাটুকুতেই অনেক কিছু ঠেকিয়ে রাখা হয়।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতবাবু প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, আপনি কি সত্যি-সত্যিই মনে করেন যে ওদের কারুর কিছু হবে?

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কী! সে কথা মনে না করলে এ ভূতের বেগার দিচ্ছি কার জন্য বলুন? ঐ একমাত্র আশাতেই ত সব কিছু সহ্য করছি মাস্টারমশাই।

অকস্মাৎ কথাগুলিতে অতিরিক্ত জোর দিয়া বিষাক্ত কণ্ঠে ললিতবাবু কহিলেন, তাহ'লে সে আশা বিসর্জন দিয়ে পুকুরের জলে ডুবে মরুন গে। বাংলা দেশের লোক! হুঁ···কিচ্ছু হবে না—কিচ্ছু না—কোন আশা রাখবেন না। যে ক'টা দিন পরমায়ু আছে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে যান। যাদের জন্য আপনার এত মাথা-ব্যথা তারা সবাই জাতসাপের বাচ্ছা, তা ভুলবেন না—সব ক্ষুদে শয়তান।

—কেন বলুন তো আপনার এত পেসিমিজম?

—পেসিমিজম! বলেন কি মশাই? কি-ই বা আপনার বয়স, জানেনই বা কি? কী জ্বালায় জ্বলেছি তা যদি জানতেন। আমিও মশাই আপনারই মত আদর্শবাদী ছিলুম, তাই এই লাইনে আজও পচছি; নইলে হয়ত চেষ্টা-চরিত্র ক'রে সরকারী চাকরি একটা বাগাতে পারতুম। এম-এ পাস করার পর সবাই বলেছিল সেই চেষ্টাই করতে, তখন কারুর কথা শুনি নি—দেশে গিয়ে বসলুম গ্রামের উন্নতি করব বলে।···গ্রামের ইস্কুলটা বহু কালের কিন্তু দলাদলিতে তখন প্রায় উঠে যাবার দাখিল হয়েছিল। হেডমাস্টার নেই, বাইরে থেকে ভাল লোক এনে তার মাইনে দিতে পারে এমন সঙ্গতিও নেই। বন্ধুরা বললেন, এত কালের ইস্কুল, তোর বাপ-দাদা এইখানে পড়েছে, উঠে যাবে? তার চেয়ে তুই ভার নে।···নিলুম ভার, আপনারই মত উৎসাহ তখন, দিনরাত খাটি আর কিসে ছেলেদের ভাল হবে, কিসে ইস্কুলের উন্নতি হবে ভাবি। উন্নতি হয়েও ছিল, ছেলে বাড়ল, আয় বাড়ল—একটা সরকারী সাহায্য পাবারও আশা হ'ল—কিন্তু যাঁরা ইস্কুল নিয়ে দলাদলি করছিলেন তাঁরা গেলেন বিষম চটে, বিশেষত গ্রামের জমিদার,—আমাদের কোন কোন রাজনৈতিক নেতাদের মত তাঁরও ধারণা ছিল যে, গ্রামের উন্নতি যদি তাঁর সাহায্যে ও যথেচ্ছাচারিতায় আসে ত আসুক—নইলে এসে দরকার নেই। নেতাদেরও যেমন ব্যক্তিগত হাততালি পাওনাটা আগে, দেশের স্বাধীনতা পরে, তাঁরও তাই। তাঁর মনে হ'ল ইস্কুলটা বাঁচাবার সমস্ত বাহাদুরিটা ঐ ছোঁড়া পাবে, জেলার হাকিম থেকে শুরু ক'রে সমস্ত কর্তারা জানবেন যে, যা কিছু করেছে ঐ ছোঁড়া—এ ত তাঁরই অপমান। ব্যস! তিনি আদা-জল খেয়ে লাগলেন আমার পেছনে। প্রথমে ইস্কুলের টাকা তছরুপের দায়ে জড়াতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না; ইস্কুলের ছেলেদের গোপনে রাজদ্রোহ শেখাচ্ছি এমন সুনামও দিলেন—আর তাতে প্রায় সফলও হয়েছিলেন, কারণ হাকিমরা এইটেই বিশ্বাস করতে চান—তবু শেষ পর্যন্ত সে ধাক্কাও কাটিয়ে উঠলুম;

ইতিমধ্যে মজা হ'ল, যাঁরা ইস্কুল নিয়ে এর আগে দলাদলি করেছিলেন হঠাৎ দেখি সেই দু'পক্ষই আমার বিরুদ্ধে এক হয়ে গেছেন। তাঁদের সকলেরই ধারণা যে তাঁরা থাকতে ইস্কুলটাকে বাঁচিয়ে আমি খুব অন্যায় করছি। ফলে শেষ পর্যন্ত আমার মায়ের বয়সী এক বিধবার ঘরে জোর ক'রে ঢোকা ও অসদুদ্দেশ্যে তাঁর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে ধরা পড়লুম। আমার তখন তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স মশাই—মনে কত আদর্শ ও আশা—ও সব কথা তখন ভাবতেও পারতুম না। তখন যে কী করব তাই ভেবে পাই না, এমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। আরও অবাক হবেন শুনলে, সাক্ষীদের মধ্যে ইস্কুলের দু'টি ছাত্রও ছিল। সব চেয়ে দুঃখের কথা এই, এমনই সাক্ষ্য-প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে যে, নিজের মা-সুদ্ধ ছেলের চরিত্রে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। নেহাৎ বরাত জোর—বামুনের ছেলে, উকীলের পরামর্শ-মত আদালতে পৈতে বার ক'রে সেই মেয়ে-ছেলেটিকে শাসাতে সে ভয় পেয়ে মকদ্দমা কাঁচিয়ে ফেললে।...এর পরেও বলেন এ দেশ সম্বন্ধে আশা রাখতে ?

ভূপেন স্তম্ভিত ভাবে, হতভম্বের মত তাঁহার কথা শুনিতেছিল—এখন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নড়িয়া-চাড়িয়া বসিল...এক রকম যেন জোর করিয়াই—নিজের হতচেতন মনকে ধাক্কা মারিবার জন্যই বলিল, হ্যাঁ, তবুও আশা রাখতে হবে। বরং এই জন্যই ত আরও আমাদের চেষ্টা করা উচিত মাস্টারমশাই। এই কাজ যাঁরা করলেন, কুশিক্ষা ও অশিক্ষাতেই তাঁরা এটা করতে পেরেছেন। ছেলেবেলা থেকে মানুষ করবার চেষ্টা না করলে তারা এর পর ভাল নাগরিক হবে এটাই কি আশা করেন ? আমাদের মতই আমাদের পূর্বাচার্যরা নিজেদের কর্তব্যের অবহেলা করেছেন বলে এটা সম্ভব হয়েছে—আর যাতে এ রকম না হয়, আপনার মত আর কেউ না বিড়ম্বিত হন, সে চেষ্টা করা কি উচিত নয় ?

মুখখানা বিকৃত করিয়া ললিতবাবু বলিলেন, পারেন করুন গে বান। আমার অত উদ্যম বা উৎসাহ নেই। অধর ত শুনেছি মহেশবাবুর আত্মীয়, আর মহেশ-বাবুও আপনার হাতের লোক, তাঁকেই বলুন গে।

এক মাস দুই মাস করিয়া ভূপেন বিবাহিত জীবনের পুরা একটি বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে ভূপেনের দুর্ভাবনা এবং দায়িত্ব আরও বাড়িয়াছে—কল্যাণী অন্তঃসত্ত্বা। কথাটা মনে পড়িলেই দুশ্চিন্তায় ভূপেনের রক্ত জল হইয়া যায়। অর্থবল নাই—লোকবল নাই। বাড়িতে সে দুই-একখানা চিঠি লিখিয়া ছিল কিন্তু সেখানকার অবস্থা পূর্ববৎ—শান্তির নাকি বিবাহের ভাল সম্বন্ধ আসিয়া-ছিল, অর্থাভাবে হয় নাই। এসব খবর সে বিশুর মারফৎ পায়। কিছু টাকা ভূপেন দিতে পারে—বিশু এরকম আভাসও দিয়াছিল কিন্তু উপেনবাবু সে কথা কানে তোলেন নাই, বলিয়াছেন—তার আগে মেয়ের গলা টিপে মেরে ফেলব। ভূপেনের মা গোপনে আশীর্বাদ জানাইয়াছেন—বোন শান্তি বৌদিদির জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এ-সময়ে স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে পাঠাইতে পারিলে কিংবা মা-বোন কাহাকেও এখানে আনাইতে পারিলে সে বাঁচিয়া যাইত

কিন্তু সে সম্ভাবনা মোটেই নাই। বন্ধুদের সঙ্গে বহু কালই ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে—এক বিশু এখনও চিঠি দেয় বছরে দুই-তিনখানা, তবে সেও বিবাহ করিয়াছে, সামান্য মাহিনার চাকরি করে—নিজের জীবন লইয়া সে-ও বিব্রত। তাহার কাছে কোন আশা রাখাই বিড়ম্বনা।

এক আছে সন্ধ্যা—কিন্তু তাহারও চিঠির সংখ্যা খুব কমিয়া আসিয়াছে। ভূপেনও চিঠি দিয়া আর পুরাতন স্মৃতি ঝালাইতে চায় না। যাহা হইবার নয়—যাহার চিন্তামাত্রও তিনজনের কাছেই বেদনাদায়ক, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। ভূপেন কল্যাণীর কথাই বেশী করিয়া ভাবে আজকাল—অন্তত তাহার জীবনটা যাহাতে ব্যর্থ না হয়।

চিন্তার শেষ নাই—অথচ যে কাজের মধ্যে সে চিন্তা ভুলিয়া থাকিতে পারিত সেই কাজও কম। এম-এ পরীক্ষার পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু পরীক্ষা দেওয়া বাকী। একগাদা টাকা ফী দিতে হইবে—তাহার কোন যোগাড়ই নাই। সংসারের অনটন বাড়িয়াই চলিয়াছে, আয় বাড়ে নাই। বোনের জন্য যে ক'টা টাকা রাখিয়াছে এক ভরসা সে-ই ক'টা টাকাই, কিন্তু তাহাতে হাত দিতে ইচ্ছা করে না। ওটা প্রায়শ্চিত্তের টাকা—তা ছাড়া কল্যাণীর এই অবস্থা, অসুখ-বিসুখ ত যে-কোন সময়েই হইতে পারে, তখন আর দ্বিতীয় উপায় থাকিবে না। প্রভিডেন্ট ফন্ডে আর সামান্যই পড়িয়া আছে, সেখান হইতেও ধার করিয়া সে পড়ার বই আনাইয়াছে—কোথাও কিছু নাই। শেষ পর্যন্ত হয়ত মহেশবাবুর কাছেই হাত পাতিতে হইবে।

এধারে পড়ানোর কাজও কমিয়াছে—গ্রামের কয়েকটি লোক মহেশবাবুর কাছে নালিশ করিয়াছে যে ছোকরা মাস্টারটি নাকি বেশী পড়াইয়া ছেলেদের বিগড়াইয়া দিতেছেন। ছেলেরা এভাবে পড়িলে ধর্ম-কর্ম-সংসার কিছুই মানিবে না, এখনই বাঁকা বাঁকা কথা বলে। চাষার ছেলে চাষ করিয়া খাইতে হইবে, জমিদারের রাজ্যে বাসও করিতে হইবে যখন—তখন এ-সব বাঁদরামো শিখিলে চলিবে কেন? —তাহারা নাকি এখনই বলে যে, হাত-পা থাকিলেই মানুষ হয় না—সম্পর্কে গুরুজন হইলেই প্রণাম করিবার উপযুক্ত হয় না। তাহারা বলে, বড় হইয়া চাষের কাজ ভাল করিয়া শিখিয়া নূতন ধরনে চাষ করিবে। এমন করিলে কোন্ ভরসায় ছেলেদের স্কুলে পাঠানো যায়?

অগত্যা কোচিং-ক্লাস বন্ধ করিতে হইয়াছে। অপূর্ববাবুর দল ললিতবাবুকে হাত করিয়া এধারেও পদে পদে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করেন—সর্বদা সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। এসব আর ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে মোহিতবাবুর কথা মনে করিবার চেষ্টা করে বটে—তিনি বলিতেন, 'এ দেশের লোকের যদি ভাল করতে চাও ত সব চেয়ে বড় বাধার কথাটা মনে রেখো, অকৃতজ্ঞতা। যাদের ভাল করছ তারাই তোমার সব চেয়ে বেশী অনিষ্ট করবে। কিন্তু তা বলে পেছোলে চলবে না—বাধা না থাকলে ত ভাল কাজ সবাই করতে পারতো।'…এ সবই ভাল ভাল কথা, তবু ভূপেনের সহ্যের সীমা যেন অতিক্রম করিয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে এখনও কাছে আসে শুধু পদন ও সালেক—তাহাদের লইয়াও আজকাল খাটিতে

হয় না, তাহারা অনেকটা তৈরী হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হাতে সময় বেশি—আর সে সময়টা দুশ্চিন্তাতেই ব্যয় হয়। একটা কিছু আর না করিলেই নয়, এ আয়ে ও অবস্থায় আর চলিবে না। তার মন আজকাল শহরের দিকে ঝুঁকিয়াছে। সে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া দুই-একটি করিয়া দরখাস্ত পাঠায় শহরের ইস্কুলে—অবশ্য, বলাই বাহুল্য যে কোন জবাব আসে না। শহরের ইস্কুলে গেলে কল্যাণীকে এখানেই রাখিয়া যাইতে হইবে তা সে বোঝে—সে একটা দুর্ভাবনা আছেই। তবু না গেলেও চলিবে না। রাখু একটু বড় হইয়াছে, সামনের বছরেই সে পরীক্ষা দিবে—খুব সম্ভব পাসও করিবে। তখন সে-ই দেখাশুনা করিতে পারিবে ; রাখু পাস করিলে যাহাতে এখানে সামান্য বেতনে একটা মাস্টারী পায়, সে ব্যবস্থাও সে মহেশ্বরবাবুকে বলিয়া করিয়া রাখিয়াছে—এবং সে-ক্ষেত্রে, সেই সুদূর ভবিষ্যতে, যাহাতে ঘরে পড়িয়া অন্য পরীক্ষাগুলি দিতে পারে সেজন্য এখন হইতেই ভূপেন তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া রাখিতেছে। রাখু ছেলেটি তেমন ধারালো নয়, মনে হয় তাহার বুদ্ধিবৃত্তি অতিরিক্ত দারিদ্র্যে ও দুর্ভাগ্যে ভোঁতা হইয়া গিয়াছে—তবু উন্নতি করার দিকে একটা ঝোঁক আছে, এইটুকুই যা ভরসা।

সে যা-ই হউক্—শুধু শুধু বসিয়া ভাবিলে কোন উপায় হয় না—ফী জমা দিবার আর মাত্র সাতটি দিন বাকী। অগত্যা তাহাকে মহেশবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিতে হয়। যিনি বার বার উপকার করিয়াছেন আবার তাঁহার কাছেই হাত পাতিতে লজ্জা করে। তাছাড়া—একমাত্র আশার স্থল পাছে এই-ভাবে নষ্ট হইয়া যায়—প্রীতিটা পাছে বিরক্তিতে পরিণত হয়, সে ভয় ত আছেই।

তবু যাইতে হয়।

মহেশবাবু তাহাকে দেখিয়াই কেমন যেন কষ্ট করিয়া হাসিলেন। বলিলেন, আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলুম।

তাঁহার সে হাসিমুখের দিকে চাহিয়া কে জানে কেন ভূপেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল, কেন বলুন ত? কী ব্যাপার?

—আর ব্যাপার! ম্লান ভাবে হাসিয়া মহেশবাবু কহিলেন, পণ্ডিত মশাই আর যতীনবাবু ছাড়া সমস্ত মাস্টারমশাই সই ক'রে এক দরখাস্ত পাঠিয়েছেন—ললিতবাবু সুদ্ধ যে, আপনি নাকি ছেলেদের মোরেল একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়েছেন, তারা আর ও'দের মানতে চায় না। পদে পদে ও'দের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে অপ্রিয় প্রশ্ন করে, ও'দের সঙ্গে সমানে তর্ক করে—এমন কি পড়ানোর পর্যন্ত ভুল ধরতে যায়। এ-রকম অবস্থায় এখানে চাকরি করা পোষাবে না—এই কথাই জানিয়েছেন ও'রা।

মহেশবাবু এই পর্যন্ত বলিয়া থামিলেন। ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তার মানে কি এটা আমার উপর নোটিশ হ'ল?

মহেশবাবু উত্তর দিলেন, কী হ'ল তা আমিই বুঝতে পারছি না যে! আমার অবস্থাটা কল্পনা করুন—ক'রে আপনিই উপায় বলে দিন। আমার বাপ-পিতামহ ইস্কুল ক'রে দিয়েছিলেন বটে, তবু এখন ত আমি সর্বময় কর্তা নই। কমিটি আছেন এবং তাঁরা এত ভালমন্দ কিছুতেই বুঝবেন না। একজন শিক্ষকই ঠিক—

আর এঁরা সব ভুল, একথা তাঁদের বোঝানো শক্ত হবে না কি? তাছাড়া সেখান থেকে কোন জোর না পেলে এঁরা এত দিন পরে এমন **bold step** নিতে কিছুতেই সাহস করতেন না।

—তা বটে। ভূপেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এ অবস্থায় আমারই এখন কাজে ইস্তফা দেওয়া উচিত—কিন্তু বড়ই নিরুপায়। ও'দের কাছ থেকে যদি আরও ক'টা দিন সময় নিতে পারেন ত ভাল হয়। এম-এ পরীক্ষা দিতে কলকাতায় যাবো—সেই সময় উঠে পড়ে চেষ্টা করব ওখানে যদি একটা মাস্টারী পাই। এখন আর অন্য চাকরি নিতে পারব না—যা হয় ক'রে এই লাইনেই থাকতে হবে। একটু সময় অন্তত দিন।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি কি আপনাকে এখনই চাকরি ছাড়তে বলছি। আপনি গেলে কি ক্ষতি হবে এবং আপনার দ্বারা কি উপকার হয়েছে তা আমি ভাল ক'রেই জানি ভূপেনবাবু। আমার দুঃখ আপনি বুঝে আমার ওপর অভিমান ত্যাগ করবেন, এই প্রার্থনা। তবু একটা সান্ত্বনা এই যে—আপনার দ্বারা যদি গ্রামের দু'টো ছেলেও মানুষ হয়ে থাকে, তাহ'লেও অনেকটা কাজ হয়েছে।

ভূপেন কহিল, শুধু তাই নয়—আপনি একটু নজর রাখবেন, যাতে একেবারে পুরানো প্রথায় না ফিরে যায় সব।

—সে আমার মনেই আছে। আমার চোখ আপনি খুলে দিয়েছেন—আর সহজে তা বুজবে না। আমি যত দিন আছি একেবারে জিনিসটা নষ্ট হ'তে দেবো না। আপনার পরীক্ষা কবে?

—আসছে মাসে। সেই জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি।

ভূপেন টাকাটার কথা পাড়িতেই মহেশবাবু চিন্তিত মুখে কহিলেন, তাই ত, এই সময়টা হাত একেবারে খালি। তার ওপর আশ্বিন-কিস্তি এসে পড়েছে—বড়ই দুর্ভাবনায় আছি। আপনি আমাকে দু'টো দিন সময় দিন, দেখি তার মধ্যে যদি কিছু সংগ্রহ করতে পারি। যদি নিতান্ত না হয়—ইস্কুল থেকেই **special loan** ঠিক ক'রে দেবো।

ভূপেন মহেশবাবুর বাড়ি হইতে প্রায় টলিতে টলিতেই বাড়ি ফিরিল। এ চাকরিও গেল। অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন রচিত হইয়াছিল তাহার মনে—যখন প্রথম এখানে আসে। এখন আর সে সব নাই, তবু এমন ভাবে যে এখান হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে তা কে ভাবিয়াছিল। সে যখন মানুষের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছে তখন একদিন তাহারই জয় হইবে—এমনি একটা ধারণা ছিল, পৃথিবীতে যাহা সত্য একদিন তাহারই জয় হয়—এইটাই সে জানিত, আজ সেই মূল বিশ্বাসটাতেই যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে।···

বাড়িতে ফিরিয়া দেখিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা একটা প্রকাণ্ড লেফাফা আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার নামে। এ কী ব্যাপার? এ কি ফীজের তাগাদা? দরখাস্ত করা ছিল, বোধ হয় সেই প্রসঙ্গেই তাঁহারা তাগাদা পাঠাইয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এতখানি কর্তব্য-বোধ যে একেবারে নূতন। সে সন-

কিছু ভুলিয়া তাড়াতাড়ি কৌতূহলী চিত্তে খামখানা খুলিল, দেখিল ব্যাপার মোটেই তাহা নয়। সে নাকি মণি অর্ডার যোগে ফীয়ের টাকা পাঠাইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই জানায় নাই। পত্রপাঠ তাহা না জানাইলে টাকাটার ঠিকমত ব্যবস্থা ও পরীক্ষাথীর তালিকায় নাম ওঠা সম্ভব হইবে না।

তাহার টাকা জমা পড়িয়া গিয়াছে। সে মণিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইয়াছে। কিন্তু কে এ কাজ করিল?

উত্তরটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িয়া গেল। সন্ধ্যা ছাড়া তাহার সমস্ত গতিবিধি এমন করিয়া কেহ লক্ষ্য করে না, এমন ভাবে তাহার অবস্থার কথা জানিয়া পূর্বাহ্ণেই ব্যবস্থা করাও আর কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়।

সন্ধ্যা যখন তাহাকে প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছে মনে করিয়া ভূপেন মনে মনে একটা স্বস্তি অনুভব করিতে শুরু করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই ভুলটা এমন প্রচণ্ডভাবে ভাঙিয়া গেল। ভোলে নাই—তাহার সন্ধ্যা কিছুই ভোলে নাই। দূরে থাকিয়া নিঃশব্দে এখনও তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে, এখনও তাহার উন্নতিই সন্ধ্যার একমাত্র লক্ষ্য, এমন কি বোধ হয় তপস্যা।

হয়ত এ দান না লওয়াই উচিত, হয়ত, এখনই এটা ফেরত দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু ভূপেন শেষ পর্যন্ত সে দান স্বীকার করিয়াই লইল। শুধু যে সাহায্যটা বড় অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছে তাই নয়—ভূপেনের মনে হইল সন্ধ্যার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি দারুণ গরমে এক ঝলক দক্ষিণা বাতাসের মতই তাহার ক্লান্ত মনে স্নিগ্ধ একটা প্রলেপ লাগাইয়া দিয়া গেল। আছে, এখনও তাহার কথা লইয়া চিন্তা করে—দূরে বসিয়া উদ্বেগ ও আশার আরতি-প্রদীপ জ্বালাইয়া অপেক্ষা করে—স্ত্রী ছাড়া এমন লোক একটি এখনও আছে। সব মানুষই সমান নয়—সব মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়। বাঁচিবার জন্য সাধনা করা যায়, জীবনের সে মূল্য এখনও তাহা হইলে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই।

খোলা চিঠিখানা হাতে লইয়া ভূপেন স্থির হইয়া বসিয়াই রহিল।

॥ ২৫ ॥

কল্যাণীর কাছে কথাটা পাড়া একটু কঠিন বৈকি। তবু শেষ পর্যন্ত তাহাকে সব জানাইতেই হয়। বেচারী কল্যাণী—চোখের জল কিছুতেই সামলাইতে পারে না সে, বহু চেষ্টা করিয়াও। নিজের যে সৌভাগ্য একদিন প্রত্যক্ষ করিয়াও বিশ্বাস করিতে পারে নাই—এই দীর্ঘদিন পরে সবে সেটা সে অনুভব করিতে শুরু করিয়াছিল। এখানকার চাকরি যাওয়া মানে অন্যত্র চাকরি লওয়া—অর্থাৎ বিচ্ছেদ। অন্ধ বাবা, বৃদ্ধা পিসীমা ও ছোট ছোট ভাইদের ফেলিয়া যাওয়া সম্ভব নয় কিছুতে। তাছাড়া নূতন বাসা করিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে পারে সে সঙ্গতিই বা কই ভূপেনের। স্বামীকে কতদিনের জন্য ছাড়িয়া থাকিতে হইবে তাহার কোন ঠিক নাই, হয়ত বা দীর্ঘকালের জন্যই। তাহার শরীর ভাল নয়, স্বামীর ভালবাসার প্রত্যক্ষ নিদর্শন তাহার দেহের মধ্য হইতে দেহ গঠন করিয়া আত্মপ্রকাশের অপেক্ষা আছে, তাহারই বা কি হইবে কে জানে। এ

অভিজ্ঞতা নূতন—কোন ধারণাই নাই তাহার এসব ব্যাপারে—কত কি বিপদ ঘটিতে পারে, অনেক রকম বিপদ অনেকের ঘটিয়াছে, এমনিই একটা ভাসা ভাসা কথা সে শুনিয়াছে। যদি সেরকম কিছু হয়, সে সময়ে তাহার একমাত্র অবলম্বন স্বামী কাছে থাকিবেন না—একথা মনে হইলেও শিহরিয়া ওঠে।...তার চেয়েও বড় ভয় বোধ হয় একটা মনে আছে, সে কথা সে ভাবিতে পারে না, ভাবিতে সাহস করে না, তবু মনে উঁকিঝুঁকি মারে—ভূপেন যদি কলিকাতাতেই থাকে, সন্ধ্যাও থাকিবে,—সন্ধ্যার রূপ আছে, সন্ধ্যার গুণ আছে, সন্ধ্যা ভূপেনের হৃদয়ে যে স্তরে অবস্থিত সেখানে কল্যাণী কোনদিনই পেঁছিতে পারিবে না। যদি অভাগী কল্যাণীর কথা তিনি ভুলিয়াই যান!

তবু কল্যাণী বাধা দিতে পারে না, বাধা দিবার উপায়ই বা কি! সে শুধু স্বামীর বোঝা, তাহার দিক হইতে, তাহার আত্মীয়দের দিক হইতে যখন কোন সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন কোন্ অধিকারে সে কথা কহিবে? স্বামীর দুর্দিনে বোঝা লাঘব করিতে না পারিলেও আরও বাড়াইবে না সে, এটা ঠিকই। কল্যাণী চিরকালই চুপ করিয়া থাকিয়াছে, আজও রহিল।

ভূপেন তাহার ব্যথা ও আশংকা দুই-ই বোধ হয় বোঝে—তাই যাত্রায় আগের দিনগুলি কল্যাণীর মন পরিপূর্ণ সুধায় ভরাইয়া দিতে চায়। কল্যাণীর এ যেন নূতন অভিজ্ঞতা—এত আদর, এত মাধুর্যে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে, নিজেকে যেন হারাইয়া ফেলে। ভূপেন যে কলিকাতায় গেলেই মাস্টারী পাইবে তাহার ঠিক নাই তবু ভূপেন বোঝে যে, এবারের বিচ্ছেদ দীর্ঘকালেরই হইবে। অন্তত সে তিন-চারটা টুইশন্ করিয়াও যদি নিজের খরচ চালাইতে পারে, তাহা হইলে আর মহেশবাবুকে বিব্রত করিবে না। সেই চেষ্টাই সে করিবে—প্রাণপণে...

ভূপেন কলিকাতায় গিয়া কোথায় উঠিবে সে প্রশ্ন একটা ছিল। আপাতত বিশুর বাড়িতে গিয়াই ওঠা চলিবে, কিন্তু প্রায় কুড়ি দিন জুড়িয়া পরীক্ষা, এতদিন তাহার কাছে থাকা সঙ্গত হইবে না হয়ত। তখন মেস খুঁজিতে হইবে, সেজন্যও কিছু টাকা চাই। তাছাড়া যদি চাকরির চেষ্টা করিতে হয়—। নানা রকম চিন্তায় সে হাঁপাইয়া ওঠে—কোথাও কোন দিশা খুঁজিয়া পায় না।

কিন্তু ইহারই মধ্যে একদিন পরীক্ষার তারিখ ঘনাইয়া আসে। পোস্ট-অফিস হইতেই কয়েকটি টাকা লইয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হয়। কল্যাণীদের কিছুদিনের মত ব্যবস্থা সে করিয়া দিয়াছে; ছুটি পাইয়াছে মাহিনা সুদ্ধই, সুতরাং আগামী মাসেও ভাবনা নাই। অন্য ব্যবস্থা কিছু করা হইল না—তবে প্রসবের এখনও দেরি আছে, যদি ইতিমধ্যেই কিছু হয়, রাখুকে সে মহেশবাবুরই শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছে।

দীর্ঘকাল পরে কলিকাতা। সেখানে তাহার বাপ-মা আছেন, সেখানে তাহার সন্ধ্যা আছে। তবু কোথাও যেন তাহার কোন আশ্রয় নাই। সে যেন বিদেশী, তাহার জন্মভূমিতে আজ যেন সে অপরিচিত, সর্বপ্রকার সম্পর্কহীন। সব চেয়ে এত কাছে আসিয়াও মাকে দেখিতে পাইবে না—সন্ধ্যাকে দেখিতে পাইবে না, সেই দুঃখই যেন বেশী পীড়া দিতেছে। সন্ধ্যার সহিত দেখা করার অন্য কোন

বাধা নাই কিন্তু তাহার মনে একটা বাধা আছে। প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই ভাল। সে ওখান হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াই আসিয়াছে, কিছুতে এ কাজ করিবে না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে মানুষই, তাহার শক্তির উপরে আর একটা অদৃশ্য শক্তি আছে, যাহার কাছে মানুষের সব কিছু দম্ভ একদিন চুরমার হইয়া ভাঙিয়া যায় —প্রতিজ্ঞা রাখা সম্ভব হয় না। বিশুর বাড়িতে পেঁাছিয়াই সে একখানা চিঠি পাইল, সন্ধ্যার হাতের লেখা। সে যে বিশুর বাড়িতে উঠিবে একথা সন্ধ্যার জানিবার কথা নয়, শুধুই অনুমান। আশ্চর্য, ভূপেনের সম্বন্ধে তাহার অনুমানেও কখনও ভুল হয় না।

অদ্ভুত একটা আবেশ-মিশ্রিত মনে লইয়া সে চিঠিখানা খুলিল। ছোট চিঠি। সন্ধ্যা লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু

পরীক্ষার আর দেরি নেই, বুঝতে পারছি না আপনি কোথায় এখন আছেন। তাই ওখানেও একটা চিঠি দিয়েছি, এখানেও দিলুম। দাদুর আসুখ, খুব বাড়াবাড়ি, চিঠি পেয়েই যদি সময় থাকে ত একবার চলে আসবেন। আর কিছু লিখতে পারছি না, ভাবতেও পারছি না। প্রণাম। ইতি—

এ চিঠির পর আর অপেক্ষা করা চলে না। কোনমতে স্নান ও সামান্য কিছু জলযোগ সারিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। বিশুর মাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানাইয়া গেল—যদি ফিরিতে রাত হয় ত তাঁহারা যেন অপেক্ষা না করেন।

সন্ধ্যাদের বাড়ি যখন ভূপেন পেঁাছিল তখন সারাবাড়িটা থম্‌থম্‌ করিতেছে। দাসী-চাকরদের মুখ ভার, চক্ষু আরক্ত। সকলেই পুরানো লোক—মোহিতবাবুর সহিত বহুকালের স্নেহের সম্পর্ক তাহাদের। অর্থাৎ এবারে বিপদ খুব আসন্ন, হয়ত আর তাঁহাকে রক্ষা করা যাইবে না।

বুড়া দারোয়ান তাহাকে দেখিয়াই অভ্যাসমত উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল, কিন্তু কোন কুশল প্রশ্ন করিতে পারিল না। বরং চোখাচোখি হইতে তাহার চোখের কোল বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। ভূপেনও প্রশ্ন করিল না, সোজা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

সিঁড়ির মুখেই প্রায় অন্ধকারের সহিত মিশিয়া সন্ধ্যা দাঁড়াইয়া ছিল, ভূপেন উপরে উঠিতে কাছে আসিয়া প্রণাম করিল, কোন কথা কহিতে পারিল না। তাহার রোদনারক্ত চক্ষু ও অপরিসীম শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া ভূপেনের মুখেও সহসা কোন কথা যোগাইল না, মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া কোনমতে প্রশ্ন করিল, এখন কী অবস্থা ?

সন্ধ্যা শান্ত-কণ্ঠেই উত্তর দিল। কহিল, কাল যতটা খারাপ গিয়েছিল আজ ততটা নয়, তবু আশা আর নেই। সর্বাঙ্গই প্রায় পড়ে গিয়েছে, কাল সারাদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, আজ মাঝে মাঝে জ্ঞান হচ্ছে দু-চার মিনিটের জন্য। এখনও আচ্ছন্নভাবেই পড়ে আছেন, হার্টের অবস্থা খুব খারাপ। চলুন না।

ঘরের মধ্যে একজন ডাক্তার বসিয়াই ছিলেন। ঔষধ ও চিকিৎসার নানা আয়োজন ঘরের চারিদিকে ছড়ানো। তাহারই মধ্যে মোহিতবাবুর শীর্ণ দেহ বিছানার উপর নিথর নিস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেদিকে চাহিলে এই কথাটাই সর্বাগ্রে মনে আসে যে, আশা আর নাই, এখন শুধু আর কতক্ষণ—এই অপেক্ষা।

ভূপেনও বসিয়া রহিল নিঃশব্দে। সন্ধ্যাকে কোন সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করাও বৃথা, সে প্রয়োজনও নাই। সাধারণ মেয়ের মত সে মানুষ হয় নাই, মামুলী সান্ত্বনার ঊর্ধ্বে সে। করিবারও কিছু নাই, শুধু যদি ইতিমধ্যে আর একবার সম্বিৎ ফিরিয়া আসে—শেষ দেখাটা যদি হয়।

অনেকক্ষণ পর রোগীর দেহে আর একবার প্রাণ-স্পন্দন দেখা গেল, ওষ্ঠ দুইটি বারকতক কাঁপিবার পর এক সময়ে তিনি চোখও খুলিলেন। শূন্য দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত ছাদের কড়িকাঠে ঘুরিয়া অবশেষে এক সময়ে সন্ধ্যার অবনত মুখের উপর পড়িয়া অকস্মাৎ পরিচয়ের জ্যোতি খুঁজিয়া পাইল।

কাছে যাওয়া উচিত কিনা বুঝিতে না পারিয়া ভূপেন ইতস্তত করিতেছিল। ডাক্তারবাবু ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে তাহাতে আর এমন কিছু বেশী বিপদের সম্ভাবনা নাই। তখন সে-ও কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। মোহিতবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিবার পর বোধ করি তাহাকে চিনিতে পারিলেন, তাঁহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কী একটা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিয়া ভূপেন তাহার মাথাটা মোহিত-বাবুর মুখের আরও কাছে লইয়া আসিল। বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া শুনিল, তিনি বলিতেছেন, সত্য পথে অবিচল থেকো—এই আশীর্বাদ করি। কিন্তু সত্যটা বিচার ক'রে নিও, আমার মত একটা সংস্কারকে সত্য বলে আঁকড়ে থেকো না। পুঁথির সত্য আর জীবনের সত্য এক নয়—চলার পথে সত্য তাঁর নিজের মহিমায় আপনি প্রকট হন। তাঁকে চিনতে পারার মত শক্তি আর সাহস যেন থাকে।

বলিতে বলিতেই তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। আবার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল—তেমনি নিঝঝুম হইয়া পড়িলেন।

আর তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না। শেষ রাত্রে, ঊষার আভাস জাগার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা গেলেন।

পরীক্ষার একটি দিন মাত্র বাকী, অথচ এধারে এই বিপদ। মোহিতবাবুর উইল অনুসারে ভূপেনই এখন সন্ধ্যা এবং তাহার বিপুল সম্পত্তির অভিভাবক। আইনের নানারকম গোলমাল আছে, হিসাব-নিকাশের ব্যাপার আছে, শ্রাদ্ধের আয়োজন আছে, আবার তাহার মধ্যে পরীক্ষা। সকালবেলাই এখানে আসিতে হয়, তারপর কোনমতে স্নানাহার সারিয়া পরীক্ষা দিতে ছোটে। আবার সন্ধ্যাবেলা এখানে আসিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত থাকিতে হয়। সন্ধ্যা একবার অত্যন্ত সসংকোচে এই বাড়িতেই তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু ভূপেন রাজী হয় নাই। তাহার এই অনিয়মিত যাওয়া-আসায় বিশুদের অসুবিধা হইতেছে বুঝিয়াও না।

যতদিন সন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহার এবং তাহার সম্বন্ধে সন্ধ্যার মনোভাব বুঝিতে পারে নাই ততদিন এক রকম ছিল—এখন আর এত কাছাকাছি থাকিতে সাহস হয় না। শুধু দেহে নয়, মনেও সে কল্যাণীর প্রতি অবিচার করিতে পারিবে না।

মোটামুটি পরীক্ষাগুলা শেষ হইয়া গেল পনের-ষোল দিনের মধ্যেই। ইতি-মধ্যে ভূপেন নিজের ব্যাপারটার দিকে মনোযোগ দিবার অবসর মাত্র পায় নাই। শ্রাদ্ধের বেশি দেরি নাই, মোহিতবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া কে এক ভ্রাতুষ্পুত্র শোকার্তভাবে আসিয়া হাজির হইল, সে-ই শ্রাদ্ধ করিতে চায়—তাহার বিশ্বাস ছিল শ্রাদ্ধ-কর্তারা বিষয়ের ভাগ পায়। তাহাকে যখন বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, মৃত ব্যক্তির উইলের নির্দেশ অনুসারে সন্ধ্যাই শ্রাদ্ধ করিবে এবং সমস্ত বিষয় পাইবে, শ্রাদ্ধাধিকারীর অজুহাত টিকিবে না—তখন ভাইপোটি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া গেল। শ্রাদ্ধ সম্পর্কে আর কোন কথাই উল্লেখ করিল না। এই শ্রেণীর আত্মীয় ও অভিভাবক আরও অনেকে আসিতে শুরু করিলেন। ভূপেনকে ছেলে-মানুষ দেখিয়া অনেকেই তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া সহজ হইবে ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু এত রকমের অসুবিধার মধ্যেও ভূপেন ধীরভাবে সব দিক সামলাইয়া উঠিল। অবশ্য মোহিতবাবুর সরকার এবং তাঁহার অংশীদার ভদ্রলোকটি তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিলেন। এ ছাড়া তাঁহার দুই-একজন বন্ধুও তাহার বিপদে বুক দিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সবই করে ভূপেন কিন্তু মনে মনে যেন ক্রমশ ভাঙিয়া পড়ে। বিরাট একটা সংসারের দায়িত্ব তাহার মাথার উপর, অথচ এক পয়সার সংস্থান নাই। একটা পঞ্চাশ টাকা মাহিনার চাকরি ছিল, তাহাও গিয়াছে। বলিতে গেলে সে শূন্যেই ভাসিতেছে, কোথাও এমন একটা আশ্রয় নাই, যেখানে সে দাঁড়াইতে পারে। কাজ পাওয়া সহজ নয়, বিশেষত মাস্টারী। অথচ খোঁজাখুঁজি করিবে সেরকম একটু সময়ও সে করিতে পারিতেছে না। বিশুর বাড়ি এমন করিয়া থাকা অন্যায়—যদিচ বিশুর মা যথেষ্ট আগ্রহের সহিতেই তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। তবু হয়ত এতদিনে মেস একটা খুঁজিয়া লওয়া উচিত ছিল কিন্তু মনের অবচেতনে তহবিলের দিকে চাহিয়াই বোধ হয় সেটায় সে এতটা গড়িমসি করিতেছে। এখানে আসিয়াই সে কল্যাণীকে মোহিতবাবুর খবর দিয়া চিঠি দিয়াছিল, তাহার পর আর তাহাকে চিঠি দিতে পারে নাই। কী লিখিবে তাহাকে? সে বেচারীর যে কি উদ্বেগে দিন কাটিতেছে তাহা ত সে বোঝে, কল্যাণী তাহাকে একটি প্রশ্নও করে নাই বটে বরং যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া সেখানে যে কোন অসুবিধা নাই বোঝাইবার চেষ্টা করিয়া দুই-তিনখানা চিঠি দিয়াছে, তাহাকে মিছামিছি বেশী ভাবিতে নিষেধ করিয়াছে বার বার, কোথাও কোন আশঙ্কা প্রকাশ করে নাই, এমন কি সন্ধ্যাকেও সান্ত্বনা দিয়া খুব মিষ্ট দুই-তিনখানা চিঠি দিয়াছে, তবু ভূপেন কল্যাণীর কাছে নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করে। এক-একবার মনে হয়, তাহার যেটা বৃহত্তর কর্তব্য সেটা অবহেলা করিয়া সন্ধ্যার প্রতি কর্তব্যটা মধুরতর বলিয়াই সে বাছিয়া লইয়াছে।

এমনি ভাবে মনে মনে নিদারুণ ক্লান্তি ও অশান্তি ভোগ করিতে করিতে এক

দিন কথাটা সে সন্ধ্যার কাছে বলিয়াই ফেলিল। তাহার যে ওখানকার চাকরি গিয়াছে এ সংবাদটা এতদিন সন্ধ্যা শোনে নাই, কল্পনাও করিতে পারে নাই। ভূপেন যে কতখানি ত্যাগস্বীকার করিয়া তাহার ব্যাপারে এমনভাবে দিনরাত নিজেকে জড়াইয়া রাখিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিবার সন্ধ্যার বেদনা ও অনুতাপের সীমা রহিল না। বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে বিবর্ণমুখে বসিয়া থাকিবার পর সে কহিল, তবে কি কলকাতাতেই মাস্টারী করবার ইচ্ছা আপনার

ভূপেন জবাব দিল, ইচ্ছা যে কি ছিল আর কি নেই তা ভুলেই গেছি। এখন পৃথিবীর কোথাও একটা কোন জীবিকার সন্ধান পেলে বাঁচি।

নিজের বিপুল বিত্ত যাহাকে নিবেদন করিতে পারিলে সার্থক হইত তাহারই অসহায় কথাগুলি সন্ধ্যার বুকে কাঁটার মত বিঁধিল। অথচ কিছুই করিবার নাই। দাদু বাঁচিয়া থাকিলে যদি বা কিছু সম্ভব হইত, এখন এ অর্থের এক কপর্দকও যে ভূপেন স্পর্শ করিবে না, তাহা সন্ধ্যার চেয়ে বেশী কে জানে।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া সে প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু দমন করিল। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, দাদুর বন্ধু ঐ যে পূর্ণেন্দুবাবু ডাক্তার আসেন, উনি শুনেছি কোন্ এক বড় ইস্কুলের প্রেসিডেণ্ট, ওঁকে একবার বললে কি অন্যায় হবে ?

—অন্যায় কেন হবে সন্ধ্যা, আমি ত বরং বেঁচে যাই। যদি তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়, তুমি অনায়াসে বলতে পারো। উনি ত কিছু মনে করবেন না ?

—না, না। আমাকে ছোটবেলা থেকেই উনি দেখছেন, তা ছাড়া আপনার কথাও দাদুর মুখ থেকে অনেকবার শুনেছেন। উনি অন্তত ভুল বুঝবেন না।

ভূপেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা কি আর হবে! ভাবতেও সাহসে কুলোয় না আমার।

সেই দিনই অপরাহ্নে সন্ধ্যা ডাক্তারবাবুর কাছে কথাটা পাড়িল। তিনি খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া চিন্তিত মুখে কহিলেন, তাই ত দিদি, বড় অসময়ে কথাটা বললে, লোক আমাদের একজন চাই কিন্তু সেক্রেটারীর একটি মামাতো শালা বেকার আছে অনেক দিন, তার জন্যে তিনি খুব ঘোরাঘুরি করছেন মেম্বারদের কাছে, এমন কি আমিও একরকম কথা দিয়েছি—এখন আবার নতুন লোকের জন্যে চেষ্টা করা কি—। তবে একটা কথা, সে ছোক্‌রা একবার ফেল ক'রে গত বছর কোনমতে বি. এ. পাস করেছে, আর ভূপেন ত অনার্স পাওয়া ছেলে। তা ছাড়া তোমার দাদুর মুখে যা শুনেছি, ওর পড়াশুনোও খুব। দেখি একজন মেম্বার আছেন বটে, তাঁর সঙ্গে সেক্রেটারীর অহি-নকুল সম্পর্ক, তাঁকে দিয়ে যদি কথাটা তো লাতে পারি! ওকে কালই একটা দরখাস্ত দিয়ে দিতে ব'লো। পরশু মিটিং—সেই দিনই যাকে হোক বহাল করা হবে—

পূর্ণেন্দুবাবু থাকিতে থাকিতেই ভূপেন আসিয়া পড়িল। তিনি তাহাকে সংক্ষেপে কথা কয়টা বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন, তুমি ভাই কালই ইস্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের হাতে দরখাস্তটা দিয়ে এসো। মাইনে খুবই কম, ষাট টাকায় শুরু, তবে আমাদের ইস্কুলে বড়লোকের ছেলে বিস্তর, টিউশনী জোটে মোটা মোটা।

কোচিং-এর ব্যবস্থাও আছে।

ষাট টাকা। আশা করিতেও ভয় হয় ভূপেনের। অবশ্য কলিকাতার মেসে থাকিতে হইলে ঐ বাড়তি দশ টাকার উপর আরো কিছু লাগিবে তাহার, কিন্তু তা হক, তবু ত সকলকে উপবাস করিতে হইবে না।

ইহার পরের দুইটা দিন ভূপেন একরকম কণ্টক-শয্যাতেই কাটাইল। আশা করিতেও পারে না—অথচ নিরাশ হইতেও সাহসে কুলায় না, এমনি একটা অবস্থা। অবশেষে রবিবার অপরাহ্ণেই খবর পাওয়া গেল যে, পূর্ণেন্দুবাবু অসম্ভবই সম্ভব করিয়াছেন। মামাতো শালাটির শুধু একবার নয়—ইহার পূর্বেও ইন্টারমিডিয়েট এবং ম্যাট্রিকুলেশনের সময় কয়েকবার ফেল হওয়ার ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া এমন ভাবেই তিনি কথাটা মেম্বারদের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন যে সেক্রেটারীর কোন চেষ্টাই ধোপে টিকে নাই। শালাটি নাকি লক্ষ্ণৌ হইতে গান শিখিয়াছে, তা ছাড়া সে কোন্ ঔপন্যাসিকের ভাইপো, এমনি সব প্রশংসা-পত্রও শেষ পর্যন্ত দিতে শুরু করিয়াছিলেন, তবুও জুৎ করিতে পারেন নাই। শেষের দিকে সেক্রেটারী প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন—অতি কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া মেম্বাররা একরকম প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, পরের ভেকান্সিটি নিশ্চয়ই তাঁহার ঐ বিখ্যাত শালাকে দেওয়া যাইবে।

সব কথাই গল্প করিয়া পূর্ণেন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন, দেখো হে সাবধান! সেক্রেটারী কিন্তু তোমার শত্রু হয়ে রইলেন, কমিটি মিটিংয়ের এত কথা বললুম শুধু এইজন্যই যে তুমি মানুষটিকে খানিকটা চিনে রাখতে পারবে। পরশু তোমার ইন্টারভিউ, তাও সেক্রেটারীই নেবেন, তবে সেদিকে তত ভয় নেই, কারণ, আমিও সময় ক'রে সেই সময়টা উপস্থিত থাকব'খন। উনি অবিশ্যি জানেন না যে, তুমি আমার ক্যান্ডিডেট, তবু আমি আর হেডমাস্টার উপস্থিত থাকলে উনি অতটা শয়তানী করতে পারবেন না। আর একটা কথা বলে রাখি, য়্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার হলেন সেক্রেটারীর চর—খুব সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলবে ওঁর সামনে—ইস্কুলে যা কিছু হয় উনি রোজ গিয়ে লাগিয়ে আসেন সন্ধ্যের সময়। আচ্ছা···আসি তাহ'লে।

ইহার পরেও দুইটা দিন ভূপেনের কম অশান্তিতে কাটিল না। সেক্রেটারীই ইন্টারভিউ লইবেন—অথচ তিনিই রহিলেন বিরূপ হইয়া। এ চাকরি যে হইবে সে ভরসা কিছুতেই যেন হয় না। এই দুঃসময়ে এত সহজে এবং এত অল্প সময়ে অত বড় ইস্কুলে মাস্টারীটা জুটিয়া যাইবে, তাহা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত ইন্টারভিউটাও ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল। সেক্রেটারী সাধারণ গ্র্যাজুয়েট জানিয়াই তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে সব প্রশ্নে ভূপেনের হাসি পায়। তাহার মনে হইতে লাগিল যে সালেক কি পদনকে এসব প্রশ্ন করিলে তাহারাও উত্তর দিতে পারিত। পূর্ণেন্দুবাবু ভূপেনের লেখাপড়ার খ্যাতি ইতিপূর্বে শুনিয়াছিলেন, তবু তিনিও বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। সেক্রেটারীকেও স্বীকার করিতে হইল যে প্রার্থীর বিপক্ষে কিছুই বলিবার নাই। শুধু বয়সটা কম এই যা, তা কী আর করা যাইবে।

অর্থাৎ ভূপেন আরও একটা আশ্রয় পাইল।

পরের মাসের পয়লা হইতে নূতন ইস্কুলে কাজ শুরু করার কথা। তখনও মাস কাবার হইতে চার-পাঁচ দিন বাকী, অর্থাৎ ইতিমধ্যে অনায়াসে কল্যাণীর কাছ হইতে ঘুরিয়া আসা চলিত কিন্তু খরচের কথা ভাবিয়া সে ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইল। চিঠি লিখিয়াই সে তাহাকে সুসংবাদটা দিল, আর মহেশবাবুর কাছেও পদত্যাগ-পত্রের সহিত একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখিয়া সব কথা জানাইল এবং অনুরোধ করিল যে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের যে ক'টা টাকা পাওনা হয় তার মধ্য হইতে নিজের ঋণশোধ করিয়া তিনি যেন বাকী টাকাটা তাঁহার কাছেই রাখিয়া দেন এবং কল্যাণীর আসন্ন বিপদে একটু তত্ত্বাবধান করেন। সে যতীন এবং রামকমলবাবুর কাছেও উহাদের দেখাশোনা করার অনুরোধ জানাইয়া দুইখানি চিঠি দিল।

এমনি করিয়া অতি সহজেই ওখানকার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হইয়া গেল। সম্পর্কটা কত ক্ষণস্থায়ী, তাহার অবস্থানই বা ক'টা দিনের তবু তাহারই মধ্যে আর একটা বৃহত্তর সম্পর্ক শুধু শুধু তাহার ঘাড়ে চাপিল চিরকালের মত। ফলাফল যাহাই হউক না কেন, স্বাধীনতা বলিতে আর তাহার কিছু রহিল না, কোনদিন ফিরিয়া পাওয়াও সম্ভব হইবে না জীবনে। বোঝা ও বন্ধন এখন বাড়িতেই থাকিবে দিন দিন—এই বয়সেই সে যেন পঙ্গু হইয়া পড়িল।

॥ ২৬ ॥

অনেক আশা করিয়াই এবার ভূপেন কলিকাতা আসিয়াছিল। কলিকাতা শহর জায়গা, সেখানকার লোক পৃথিবীর অগ্রগতির খবর রাখে, সেখানে তাহার চেষ্টা ও উদ্যমের মর্ম বুঝিবার লোক মিলিবে—অন্তত সে যদি সংস্কৃত বা উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে ত কেহ তাহাকে বাধা দিবে না—এই ছিল তাহার ভরসা। কিন্তু সপ্তাহ-দুই নূতন ইস্কুলে কাজ করিয়াই তাহার সে ভুল নির্মমভাবে ভাঙিয়া গেল। ইস্কুলে যে ছেলেমেয়েরা শিক্ষার জন্যই আসে, এ ধারণা মফঃস্বলে যদি বা খানিকটা আবছাভাবে ছিল, এখানে একেবারেই নাই। বিরাট ইস্কুল, প্রত্যেক ক্লাসে তিন-চারিটি করিয়া সেকশ্যান্—টাকা বা শিক্ষক কিছুরই অভাব নাই। ভাল ভাল শিক্ষকও দু'চারজন আছেন, তবে তাঁহারা সকলেই ব্যস্ত, ক্লাসে মন দিয়া পড়াইবার অবসব তাঁহাদের মেলে না একেবারেই। ইস্কুলটির নামডাক আছে খুবই। প্রতি বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল ফল হয় কিন্তু সে অন্য কারণে। বড়লোকের ছেলেরা প্রচুর বেতন দিয়া এই শিক্ষকদেরই মধ্য হইতে দুই বা ততোধিক প্রাইভেট টিউটার রাখে। মধ্যবিত্তের মধ্যে যাহারা ভাল ছেলে, তাহাদের জন্য একটা কোচিং ক্লাস আছে, সেখানে মেধাবী ছাত্র লওয়া হয়, মাসিক নামমাত্র পনেরো টাকা বেতনে তাহারা সেখানে পড়াশুনা করে। এইসব ছেলেদের মধ্য হইতেই কেহ কেহ স্কলারশিপ পায়, কেহ বা লেটার পায়—ফলে স্কুলের খ্যাতি বাড়ে। বাকী যাহারা তাহারা নিজের বাড়িতে পড়িয়া যতটা পারে করে—কেহ বা পাস করে, কেহ বা ফেল করে, সে তাহাদের ভাগ্য।

হেড্‌মাস্টার ত বিষম ব্যস্ত। তাঁহার পাঠ্যপুস্তক আছে অনেকগুলি, সে ব্যবসা তিনিই চালান। নিজের নামে ছাড়াও, অপরের নামে যেসব পাঠ্যপুস্তক বাহির হইবে (অর্থাৎ যাঁহাদের অধ্যাপক হিসাবে নাম আছে অথচ লিখিতে পারেন না) এমন বই লিখিবার জন্য প্রকাশকদের নিকট হইতে মোটা টাকা লইয়া অল্প টাকায় অন্য শিক্ষকদের দ্বারা সেই বই লিখাইয়া লইতে হয়। সে সব বন্দোবস্ত করা তো আছেই, আবার তাঁহাকেই কৌশলে সকল দিক বজায় রাখিয়া কাজটা করাইতে হয়। এ ছাড়া কিছু তেজারতি, কিছু শেয়ার কেনা-বেচা এসবও আছে। ভাইপোর নামে একটা চালের আড়ৎ এবং ভাগ্নের নামে বেনেমশলার দোকান আছে—আসলে মালিক তিনিই, সেগুলিও দেখিতে হয়। সম্প্রতি আবার জুতার একটা কারখানা খুলিয়াছেন, দোকানে দোকানে পাইকারী বিক্রীর জন্য—সুতরাং স্নানাহারেরই সময় মেলে না। ইস্কুলে যে কয় ঘণ্টা থাকেন, তাহারও অধিকাংশ এইসব কাজে চলিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ক্লাসে গিয়াই বিশ্রামের অবকাশ মেলে।

অন্য মাস্টার মহাশয়দেরও অর্থ উপার্জনের পথ একটা নয়। পাঠ্যপুস্তক আছে প্রায় সকলেরই, এ ছাড়া টিউশ্যানী—সকাল বিকাল তিনটা-চারটার কম নাই কাহারও। হেড্‌মাস্টারের মহৎ দৃষ্টান্তে অন্য ব্যবসাও অনেকে ঠোক্‌রাইতে শুরু করিয়াছেন। ফলে ক্লাসে আসেন সকলেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া; পড়ানোর ইচ্ছা, ধৈর্য বা চেষ্টা থাকা আর তখন সম্ভব নয়। অবশ্য ভাল শিক্ষক যে দুই-একজন নাই তাহা নয়—বিবেক-বুদ্ধিযুক্ত এবং যথার্থ শিক্ষাব্রতী এই ইস্কুলের মধ্যেই তিন-চারজন আছেন, কিন্তু তাঁহারা এই অশিক্ষা অমনোযোগ ও কর্তব্যবুদ্ধির অভাবের সমুদ্রে দিশাহারা। কতটুকুই বা করিতে পারেন তাঁহারা। তবু ভূপেন লক্ষ্য করিয়া দেখিল, এই কয়জনকেই ছাত্ররা ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। তাহারা হয়ত সবটা তলাইয়া বোঝে না, তবু কাহার কতটুকু মূল্য, তাহা আপনিই তাহাদের কাছে নির্ধারিত হইয়া যায়।

শিক্ষক মহাশয়দের ত ঐ অবস্থা। পড়াশুনাতেও যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাও তথৈবচ। একটি ক্লাস এইট-এর ছেলেকে সিরাজউদ্দৌলার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে 'হাঁ' করিয়া তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, অতদূর পর্যন্ত আমাদের পড়া হয় নি স্যার। ভূপেন যখন বুঝাইয়া দিল যে এ ক্লাসে না হইলেও অন্য ক্লাসে ইহার আগে পড়া হইয়াছে নিশ্চয়, সুতরাং কিছুই না বলিতে পারার কোন কারণ নাই, তখন সে সবিস্ময়ে উত্তর দিল, বা রে, তা কেমন ক'রে হবে। সব ক্লাসেই ঐ মোগল আমল পর্যন্ত এসেই থেমে গিয়েছি যে। ওটা বোধহয় ক্লাস নাইনে পড়ব একেবারে।

এমনি সব বিষয়েই। বই অনেক আছে কিন্তু পড়া হয় কতটুকু। যেটুকু হয় সেটুকুও খাপছাড়া—আগের এবং পিছনের পাঠ্য বা শিক্ষণীয় অংশের সহিত পারম্পর্য রক্ষিত হইল কিনা কে দেখে। অনেক বিষয়েরই প্রথম অংশ বাদ দিয়া পরের অংশ পড়ানো হয়, ফলে বার বার যখন প্রথম অংশের উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন ছেলের কিছুই বোঝে না। সুতরাং যাহারা পাস করিতে চায় তাহাদের মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। যেমন ভূগোল—ম্যাট্রিক ক্লাসের

পুরাতন বইগুলি (উপরের ক্লাসের জন্য লেখা বলিয়া ভাষাও শক্ত) সময়াভাবের অছিলায় ক্লাস সেভেন হইতে ধরা হয় ! ভূগোলের প্রথম অংশ কঠিন বলিয়া সেটা ক্লাস্ টেন-এর জন্য মুলতুবী রাখিয়া পরের অংশ শুরু করা হয় ক্লাস সেভেন-এ। মুখস্থ করিবার পক্ষে কোন বাধা হয় না বটে তবে যাহারা বুঝিয়া পড়িতে চায় তাহারা জলবায়ু প্রভৃতি পড়িবার সময় আগেকার নাম ও অবস্থার বিশেষ উল্লেখগুলি কিছুই বুঝিতে পারে না। এমনি গণ্ডগোল প্রায় সব বিষয়েই। এমন কি অংকও যেটা আগে পড়ানো উচিত সেটা তোলা থাকে উপরের ক্লাসের জন্য।

প্রথম কয়েকদিন চুপ করিয়া থাকিয়া ভূপেন একদিন হেড্‌মাস্টার মহাশয়ের কাছে কথাটা পাড়িতে গেল। হেড্‌মাস্টার অতুলবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, তবেই হয়েছে ভূপেনবাবু। আপনি বুঝি ঐসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চান ? হায় হায় ! পড়াবেন কাকে, পড়বেই বা কে ? হয়ত সারা ক্লাসে একটা কি দুটো ছেলে আছে যারা পড়তে চায়, তাদের জন্যে অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। নোট আছে, অঙ্কের সলিউশান আছে, কোশ্চেন-অ্যানসার আছে, মেড-ইজি সিরিজ আছে, ওআন-ডে প্রিপেয়ারেশন সিরিজ আছে—হেল্‌প্ বইয়ের অভাব কি ! সব ছেলের বাড়িই দেখুন গাদা গাদা। যাদের নেই তারাও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে চেয়ে চালায়। আমাদের কাজ হচ্ছে যে কোন্‌গুলো ইম্পর্ট্যান্ট অর্থাৎ পরীক্ষায় আসতে পারে, সেইগুলো দাগ দিয়ে দেওয়া। এইটি যে যত ভাল পারবে সে তত ভাল মাস্টার। আপনি ওদের পড়াবেন ভাল ক'রে ? ছোঃ !

ভূপেন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু ওদের যে ঐ অত হেল্‌প্ বুকের সাহায্য নিতে হয় তার জন্যে কি আমরাই দায়ী নই ? আমরা ভাল ক'রে পড়ালে ওদের ওসব হয়তো দরকারই হ'ত না।

অতুলবাবু হাসিয়া কহিলেন, ওগুলো দরকার হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ভূপেনবাবু, যেহেতু ওগুলো আমরাই লিখে থাকি। তাছাড়া দায়ী ঠিক আমরা নই। দায়ী ওদের গার্জিয়ানরা যাঁরা ওদের সিনেমা-থিয়েটার দেখা বন্ধ করতে পারেন না, বরং অনেক সময় নিজেরা সঙ্গে ক'রেই নিয়ে যান। আমাদের ইস্কুলের মাইনে যদি এক টাকা বাড়াতে যাই ত সবাই হাঁ হাঁ ক'রে উঠবেন, কিন্তু ছাত্রদের পরকাল খাবার জন্য তাদের বিলাস ও প্রমোদে অর্থব্যয় করতে তাঁরা কাতর নন। আমরা মাইনে কত পাই,—তাতে আমাদের সংসার চলে ? ওসব ত করতেই হবে আমাদের। চিরকাল না খেয়ে আমরা দেশবাসীর সন্তানদের শিক্ষা বিতরণ ক'রে যাবো, এতটা মহৎ ভাববেন না আমাদের। অভিভাবক এবং কর্তৃপক্ষ সকলকার এ কথাটা ভাবা উচিত। আপনি মফঃস্বল থেকে এসেছেন—সেখানে তবু কিছু পড়াশুনো চলে, এখানে ওসব চলবে না। নতুন এসেছেন—আর কিছু দিন দেখুন।

সত্যই ভূপেন দেখিল।

প্রথমটা সে মনে করিয়াছিল যে ওখানকার মত এখানেও সে একাই নিজের দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে। আর কেহ ছেলেদের পড়াইতে না চান সে অন্তত নিজের কর্তব্যপালনে অবহেলা করিবে না—কিন্তু কাজে লাগিয়া দেখিল যে

অব্যবস্থা এবং মূঢ়তার এই সমুদ্র দুস্তর। এমনই রীতিতে এখানকার কাজ দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছে যে, একার পক্ষে নূতন করিয়া কিছু শুরু করা অসম্ভব। সে সময়ই বা কৈ! ওখানে সকাল-বিকাল সব সময়েই ছাত্রদের সে কাছে পাইত, এখানে ইস্কুলের কয়েক ঘণ্টাও ঠিক-মত পাওয়া যায় না। কোলাহল ও স্বার্থসংঘাতে কোনপ্রকার অন্তরঙ্গতা থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া সব চেয়ে বড় বাধা ছাত্ররাই। ওখানকার ছাত্রে আর এখানকার ছাত্রে অনেক তফাৎ। শিক্ষকদের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই কাহারও—শিক্ষা সম্বন্ধেও আগ্রহের অত্যন্ত অভাব। ভূপেন নিজেও একদিন এই কলিকাতাতেই স্কুলের ছাত্র ছিল, আর সেও এমন কিছু বেশী দিনের কথা নয়, কিন্তু এবার আসিয়া দেখিল যে গত দশ বছরেই অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। হয়ত তখন এমন করিয়া নিজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন থাকা সম্ভব ছিল না, তবু যতটা মনে পড়ে—এত বাচাল, এত উদ্ধত এবং এতখানি যৌন-সচেতন তাহারা ছিল না। বাংলা চলচ্চিত্র এই অল্প সময়ের মধ্যে দেশের হাওয়া কতটা বদলাইয়া দিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সিনেমা ও ফিল্ম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তাহাদের মুখস্থ। ক্লাসে বসিয়াও তাহারা সেই আলোচনাই করে, এমন কি পড়ার ফাঁকে শিক্ষকদের সঙ্গেও অনায়াসে সে প্রসঙ্গ শুরু করিয়া দেয়। এ সম্বন্ধে ভূপেনের অজ্ঞতায় তাহারা করুণার হাসি হাসে, প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রূপ করে। এ ত গেল ক্লাসের কথা—ক্লাসের বাহিরে আনাগোনার পথে রাস্তায় চলিবার সময় যে সব কথা ও গল্পের টুকরা তাহার কানে আসে তাহাতে কানে হাত চাপা দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ক্লাস নাইন ও টেনের ছেলেরা অনেকেই বিশেষজ্ঞের মত অভিনেত্রীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া আলোচনা করে। যাহারা অতটা করে না, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন কথা বলে যা তাহাদের বয়স এবং শিক্ষার তুলনায় অত্যন্ত বিস্ময়কর। যৌনতত্ত্ব-ঘেঁষা আলাপ-আলোচনা ক্লাস এইট-এও একেবারে বিরল নয়। ইহাদের কাছে লেখাপড়ার কথা বলিতে যাওয়া অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কি। যে দুই-তিনটি ভাল ছেলে থাকে ক্লাসে, তাহারাও শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতে পারে না, ইস্কুলের পড়ার উপর নির্ভরও করিতে পারে না—যতটা পারে বাড়িতেই পড়ে কিংবা কোচিং ক্লাসে।

ভূপেনের অত্যন্ত ইচ্ছা হইল কোচিং ক্লাসের কিছু একটা ভার নেয়, কিন্তু সেখানে ইতিপূর্বে যে সব প্রবীণ শিক্ষক মহাশয়রা বসিয়া আছেন তাঁহাদের প্রাচীর নিরন্ধ্র—নবাগতের সেখানে প্রবেশের কোন আশা নাই। ভূপেন কোনমতেই সুবিধা করতে না পারিয়া শেষে তাঁহাদের কাছে প্রস্তাব পাঠাইল যে, তাঁহাদের পারিশ্রমিকের অংশে ভাগ না বসাইয়াও পরিশ্রমের ভার লাঘব করিতে রাজী আছে। তাহাতে ফল হইল আরও খারাপ। এ প্রস্তাবটাকে একদিকে অপমান-কর, অপরদিকে অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক মনে করিয়া তাঁহারা সকলে বিষম চটিয়া গেলেন, এমন কি সেক্রেটারীর কাছে নালিশও গেল।

অগত্যা ভূপেনকে কর্তব্য-পালনের ইচ্ছাটা মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে হয়। পূর্ণেন্দুবাবু ইতিমধ্যেই একটা টিউশ্যনী তাহাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

বড়লোকের ছেলে, মাহিনা বেশী, পরিশ্রম কম। ছেলেটি বুদ্ধিমান কিন্তু অত্যন্ত অমনোযোগী, দিনরাত সিনেমা ও সিনেমার কাগজ লইয়া আছে। তবু ভূপেন হাল ছাড়িল না। স্থির করিল যেমন করিয়াই হউক, এই ছেলেটিকে সে মানুষ করিয়া তুলিবে। দিনকতক পড়াইবার পরই সে একদিন সহসা তাহার ছাত্র প্রশান্তর বাবার কাছে গিয়া কথাটা পাড়িল। কহিল, দেখুন প্রশান্তকে নিয়ে আসতে ও পেঁৗছে দিতে যে গাড়ি যায় সেটা কি বন্ধ করা সম্ভব নয়?

প্রশান্তর বাবা মোটা বেতনের সরকারী কর্মচারী, মেজাজটা সেই রকমই কড়া। বিরক্তিতে তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু পূর্ণেন্দুবাবু এই ছেলেটির বিদ্যানুরাগ এবং নিষ্ঠার যে ফিরিস্তি দিয়াছিলেন সেটা স্মরণ হওয়ায় বিরক্তি চাপিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন বলুন ত? আপনি কি কম্যুনিস্ট?

ভূপেন ধীরভাবেই জবাব দিল, তার জন্যে নয়। আমি দরিদ্র, কোন ইজম্ নিয়ে মাতামাতি করার সময় আমার নেই। আমি ছেলেটির ভবিষ্যৎই ভাবছি। এখানে কোনরকম ব্যায়ামের ব্যবস্থা নেই, স্কুলে যা সামান্য খেলাধুলোর ব্যবস্থা আছে সেখানে যেতে দেন না। একটু হেঁটে অন্তত বাড়ি ফেরে যদি ত স্বাস্থ্যটা ভাল থাকে। এখনই যা মোটা হয়ে গেছে, এর পর বড় কষ্ট পাবে। তাছাড়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে-মিশে বাড়ি ফিরতে পারলে মনের স্বাস্থ্যটাও ভাল থাকে।

—ভাল থাকে। বলেন কি? বন্ধু-বান্ধব মানে ত যত রাজ্যের বকা ছেলে।

ভূপেন হাসিয়া জবাব দিল, ঐ সব বকা ছেলেদের সঙ্গেই ত দিনের মধ্যে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা কাটাতে হয়। ক্লাসে ত আপনি পাহারা দিতে যান না। আর পনেরো মিনিট বেশিতে কি আসে যায়?

—কিন্তু ক্লাসে ধরুন টিচাররা থাকেন ত।

—তাঁদের সাধ্য আছে অতগুলো ছেলের দিকে নজর দেন? ক্লাসে টিচারদের সামনেই যা সব কাণ্ড হয় তা উল্লেখ না করাই ভালো। তাছাড়া এমনিও যথেষ্ট ফাঁক পায় ওরা। আর ধরুন এই যে গাড়ি যায়—দু-তিনজন বন্ধু হয়ত কাঁধ ধরাধরি ক'রে ইস্কুল থেকে বেরোল, প্রশান্ত এসে চড়ল গাড়িতে, তারা একবার সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে পাশের ফুটপাথ ধরল, এতে মনে মনে—একই দেশের একই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হতে থাকে ঐ শিশুকাল থেকে, ওটা ভাল নয়। আপনি বকা ছেলেদের সঙ্গে মেশার আশঙ্কা করছেন। তা থেকে বাঁচিয়ে ওকে দিচ্ছেন কি? সারা বিকেলটা চুপ ক'রে বাড়িতে বসে থাকতে হয় বলে যত বাজে কাগজ আর ডিটেক্‌টিভ গল্পের বই পড়ে এবং সপ্তাহে দু-তিন দিন সিনেমায় যায়। এই ত? তাতেই কি ওর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় থাকে? তার চেয়ে ওর সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গ ঢের ভাল জানবেন। আর কিছু না হোক্, অন্তত এই বয়সে বুড়োটে হতে পারে না।

প্রশান্তর বাবা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তাই ত, আপনি ভাবিয়ে দিলেন দেখছি। আমার যদি বা আপত্তি না থাকে ওর মাকে রাজী করানো খুব কঠিন হবে। তাঁর বিশ্বাস তাঁর ছেলের জন্য যত রাজ্যের অ্যাক্সিডেণ্ট ওৎ পেতে

আছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর একটু বড়মানুষি—মানে প্রেস্টিজেও আঘাত লাগবে। আচ্ছা দেখি একবার কথা কয়ে।

প্রশান্ত এই কয়দিনেই ভূপেনের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভূপেন তাহাকেও উসকাইয়া দিল। দরিদ্র বন্ধু-বান্ধবদের সামনে গাড়ি চড়ায় যে কোন সংকোচের কারণ থাকিতে পারে—সে শিক্ষা সে পায় নাই। তবে এমনিই তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া বাড়ির খাঁচায় আসিয়া ঢোকাতে আপত্তি তাহার বরাবরই ছিল। সে মাকে পীড়াপীড়ি করায় অবশেষে তিনি একটা আপস রফা করিলেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়াই যাইবে—কিন্তু ফিরিবার সময় সে হাঁটিয়া ফিরিবে।

এমনি করিয়া ধীরে ধীরে সে প্রশান্তকে বশ করিয়া ফেলিল। নানা ভাল ভাল বইয়ের গল্প বলিয়া, পাঠ্যকে নানাভাবে লোভনীয় করিয়া তুলিয়া লেখাপড়া ও ভাল বই-এর দিকে তাহার মনকে আকৃষ্ট করিল। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতে বন্ধ করিতে পারিল না, সেটা সিনেমা যাওয়া। নেশাটা এমনই বদ্ধমূল হইয়া গেছে যে তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা কঠিন। তবু ভূপেন হাল ছাড়িল না। সময় লাগিবে—কিন্তু অসম্ভব হইবে না, এটুকু বিশ্বাস তাহার নিজের উপর ছিল।

প্রশান্তদের বাড়িতে আর একটি ছাত্রী তাহার জুটিল—ফাউ স্বরূপ। সেটি প্রশান্তর বোন লিলি। সে কোন্ এক মেয়ে-ইস্কুলে পড়ে। একজন শিক্ষয়িত্রী তাহাকে বাড়িতেও পড়াইয়া যান, কিন্তু একদিন এমনিই তাহার বিদ্যা নাড়াচাড়া করিতে গিয়া ভূপেন দেখিল যে সে প্রায় কিছুই জানে না। সে যে ক্লাসে পড়ে, সে ক্লাসের যে কোন খারাপ ছেলেও তাহার চেয়ে ভাল লেখাপড়া জানে। অথচ লিলি ভালভাবেই পাস করে। প্রোগ্রেস রিপোর্ট চাহিয়া লইয়া দেখিল যে কোন বিষয়েই ষাটের নীচে নম্বর থাকে না। মেয়ে-ইস্কুলের নমুনা সে যে ইতিপূর্বে না পাইয়াছিল তা নয়, তবে সেগুলি ছোট এবং ভুঁইফোড় ইস্কুলে, কোন কোনটা সকালে অল্প সময়ের জন্য বসে, কোন-কোনটা বা ছয় বৎসরে দশ বৎসরের কোর্স শেষ করে। সুতরাং ভাল করিয়া পড়ানো সেখানে সম্ভব নয়, এই ছিল তাহার সান্ত্বনা—কিন্তু এ কি, বড় ইস্কুল, নামডাকও কম নয়—অথচ এত অবহেলা। পড়াশুনার পদ্ধতি ত ভাল নয়ই, তা ছাড়া যাঁহারা পড়ান তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার যে সব নমুনা ছাত্রী মারফৎ পাইল তাহাও নৈরাশ্যজনক। পাঠ্যপুস্তকের বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁহারা ত একটি কথাও বলেন না, পাঠ্যপুস্তকগুলাও ভাল করিয়া পড়াইবার অবসর নাই তাঁহাদের। অথচ এমনি চাকচিক্যের অবধি নাই। জুলুমও ঢের। একবার হেডমিস্ট্রেসের খেয়াল হইয়াছিল যে, এক এক ক্লাসের মেয়েদের সকলকে একরকম পোশাক পরিয়া আসিতে হইবে। যাহারা ধনীদুহিতা তাহাদের অসুবিধা হয় নাই, কিন্তু মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র ঘরের যে সব মেয়েরা পড়িত, তাহাদের দুর্দশার অন্ত রহিল না। সেজন্য অনেক অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। জরিমানা প্রভৃতি কত কি। বহু লেখালেখির পর এখন সেটা বন্ধ আছে। বর্তমানে লিলিদের যিনি ক্লাস-টিচার তাঁহার হুকুম হইয়াছে যে, কোন মেয়ে চুল এলাইয়া ক্লাসে আসিবে না। প্রত্যেককে মাথা বাঁধিয়া আসিতে হইবে। সকালে

স্নান করিয়া ঐ সময়ের মধ্যে চুল শুকানো অসম্ভব, তবু প্রত্যেক মেয়েকেই ভিজা চুল জড়াইয়া খোঁপা বাঁধিতে হয়। উপায় কি! এমন অস্বাস্থ্যকর প্রস্তাব যে স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছ হইতে আসিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ না দেখিলে ভূপেন হয়ত বিশ্বাসই করিতে পারিত না।

সতরাং লিলির ভারও ভূপেনের হাতে আসিয়া পড়ে। এ ভার লয় সে অবশ্য স্বেচ্ছাতেই। তাহার পড়ানোর পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হইয়া লিলি রোজই আসিয়া বসিয়া থাকিত, ক্রমশ ভূপেন তাহাকেও পড়াইতে শুরু করিল। প্রশান্তের বাবা কথাটা শুনিয়া একদিন আসিয়া মৃদু ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং পরের মাস হইতে কিছু বেশী মাহিনা দিবারও ইঙ্গিত দিলেন, কিন্তু ভূপেন বিনীতভাবে অস্বীকার করিয়া কহিল, ঐটি মাপ করবেন। ওকে আমি ত নিয়মিত পড়াতে পারি না, যেটুকু পড়াই সেটুকু ভাল লাগে বলেই পড়াই। তার জন্যে কোন পারিশ্রমিক নিতে পারব না। তবে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ এই যে, আপনারা এমনভাবে ছেলেমেয়েদের জন্যে ইস্কুল আর মাস্টার ঠিক করে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন না। একটু একটু দেখবেন যে সেখানে কি হয় না হয়।

তিনি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন, প্রোগ্রেস রিপোর্ট ত দেখি।

—প্রোগ্রেস রিপোর্ট। ভূপেন হাসিয়া বলিল, অন্তত মেয়ে ইস্কুলের প্রোগ্রেস রিপোর্টের ওপর আমার আর আস্থা রইল না।

প্রশান্তর বাবা কহিলেন, আমাদের ব্যাকওয়ার্ড দেশ, বুঝলেন না। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে একটু লিনিয়েন্ট না হ'লে চলে না।

ভূপেন মাথা হেঁট করিয়া কহিল, তা বটে। কিন্তু সে প্রয়োজন কি এখনও আছে ?

তিনি আর কোন জবাব দিলেন না।

পরীক্ষা দিয়া ভূপেন নিশ্চিন্তই ছিল, সহসা বিশু একদিন তাহাকে প্রশ্ন করিল, কি হে, রেজাল্টের কি করছ ? তদ্বির-তদারক করো।

—তদ্বির ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তদ্বির। নাইন্‌থ পেপার কথাটা শোন নি ? এই ক'বছর পাড়াগাঁয়ে থেকে দেখছি শহরের সব হাল-চাল ভুলে গেলে। এখানে এম. এ. পরীক্ষার ফলাফল তদ্বিরের ওপরই নির্ভর করে। দেখো গে, ফার্স্ট ক্লাস পাবার জন্যে ছেলেমেয়েরা একজামিনারদের বাড়ির মাটি রাখছে না। তোমার ত আরও বেশী ক'রে তদ্বির করা উচিত, কেন-না প্রোফেসাররা প্রাইভেট ক্যাণ্ডিডেটদের কিছুতেই ফার্স্ট ক্লাস দিতে চান না, এমনও একটা দুর্নাম আছে। যাও যাও একজামিনারদের লিস্ট্ নিয়ে কাল থেকেই ঘোরাঘুরি শুরু ক'রে দাও।

ঠিক তদ্বির করার ইচ্ছা ভূপেনের না থাকিলেও কতকটা ফলাফল জানার জন্যও বটে এবং কতকটা বিশুর কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্যও, সে পরীক্ষকদের লিস্ট সংগ্রহ করিতে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল। যাওয়াটাই হয়ত মূর্খতা—কারণ সেখানে পরিচিত লোকদের সুপ্যারিশ ধরিলে সব রকম বে-আইনী ব্যাপারই

চলে কিন্তু অপরিচিত লোকের কোন সুবিধা নাই। শুধু শুধু হয়রান হইয়া ফিরিয়া আসিল, তবে একটা অভিজ্ঞতা তাহার হইল—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ব্যর্থতার সব চেয়ে বড় প্রমাণ সেখানকার অফিসেই আছে—দূরে খুঁজিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। এত বিশৃঙ্খলা এবং অব্যবস্থা কল্পনা করাও কঠিন।

অবশ্য পরীক্ষকদের তালিকা পাওয়া গেল অনায়াসেই, হেডমাস্টার অতুলবাবু একবার টেলিফোন করিয়াই জানিয়া দিলেন। কিন্তু নাম পাইলেও অন্য অসুবিধা ঢের ছিল, পরিচিত কোন লোকের সুপারিশ না থাকিলে আমল পাওয়া শক্ত। পরীক্ষকদেরও কোন দোষ নাই, তদ্বিরকারীদের যা ভিড় তাহাতে মাথা ঠিক রাখা শক্ত। বিশেষ করিয়া ছাত্রীদের ভিড় বেশী, যাহারা পাস করিবে নিশ্চিত জানে তাহারাও কোন্ ক্লাস সেটা জানিতে চায় এবং ফার্স্ট ক্লাস পাইতে চায়। এতকাল কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িলেও সর্বোচ্চ ধাপে যে এমন নির্লজ্জ ধরাধরি চলে তাহা ভূপেনেরও জানা ছিল না। এতটা নীচে নামাও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়ত পূর্ণেন্দুবাবুকে ধরিলে সুপারিশের অভাব হইত না কিন্তু সে প্রবৃত্তিও তাহার হইল না। নিজেকে পরীক্ষকদের স্থলে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের বিব্রত অবস্থা চিন্তা করিতেই সে লজ্জিত বোধ করিল।

অগত্যা ফলাফলটা সরকারীভাবে ঘোষিত হওয়া পর্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। যথাসময়ে দেখা গেল যে সে ফার্স্ট ক্লাসই পাইয়াছে বটে তবে তাহার নামটা সে তালিকায় আছে সবশেষে। তাহার ধারণা ছিল যে সে উত্তর-পত্র খুবই ভাল লিখিয়াছে, সুতরাং মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইল। অবশ্য বিস্মিত হইল না একেবারেই, সেকেন্ড ক্লাস পাইলেও হয়ত বিস্মিত হইত না। দুঃখ সন্ধ্যা বেচারীর জন্য—অনেক আশা ছিল তাহার—কিন্তু কী আর করা যাইবে।

ইউনিভার্সিটি পোস্ট অফিসে দাঁড়াইয়াই সে মহেশবাবু ও কল্যাণীকে দুই-খানা চিঠি লিখিয়া দিল, তারপর অনেকদিন পরে ক্লান্ত পা দুইটাকে টানিয়া লইয়া চলিল সন্ধ্যাদের বাড়ির উদ্দেশে।

॥ ২৭ ॥

মোহিতবাবু ভূপেনকে যতগুলি মন্ত্র দিয়াছিলেন জীবনের তপস্যায় সিদ্ধিলাভের জন্য—তাহার মধ্যে সব চেয়ে কাজে লাগিল আশাবাদের মন্ত্রটাই। তিনি বারবারই বলিতেন, 'বাবা, হার মেনো না কখনও জীবনে। যখন মনে হবে এইবার ভেঙ্গে পড়ছি তখনই মনে মনে এই কথাটা জপ করবে যে,—সমস্ত দুস্তর রাত্রিই একদিন কেটে যায়, আমার এ রাত্রিও কাটবে। আমি হার মানব না, হার মানব না!'

এ প্রসঙ্গে কথা উঠিলে ভূপেন বলিত, বাইরের দুঃখ মানুষকে কঠিন করে, দুঃখ সইবার, আঘাত সইবার ক্ষমতা তার আরও বাড়ে কিন্তু মনের দুঃখটাই যে বড়—অন্তর যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, ভেঙ্গে পড়তে চায় তখন যে কোন আশাবাদই কাজ করে না। না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করে কটা লোক, তার চেয়ে ঢের বেশী লোক করে মানসিক দ্বন্দ্বে ক্লান্ত, পরাজিত হয়ে। তার কি মন্ত্র বলুন?

মোহিতবাবু কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া বলিতেন, 'তার মন্ত্র হ'ল পৌরুষের মন্ত্র।

মনে সেই জোর রাখতে হবে যে, আমি অপরাজেয়, আমি হার মানব না। আমি ক্লান্ত হব না। আর ঐ যে বললুম, আশাটাই হ'ল বড় কথা, সে-ই মনে জোর আনে, পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করে।'

কথাগুলি তখন শুনিয়াই গিয়াছিল, কিন্তু চরম দুঃখের দিনে এমন ভাবে কাজে লাগিবে তাহা কে জানিত ?

বাস্তবিক কলিকাতায় আসিবার পর দুই-তিনটি বৎসর কাটিল তাহার যেন একটা একটানা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়াই। পথ কোথাও নাই—সর্বত্র বাধা, সর্বত্র পরাজয়। আশা রহিল না, আদর্শ চুর্ণ হইয়া গেল, তবু বাঁচিতে হইবে, তবু পথ চলিতে হইবে। এক এক সময় একটা মানসিক অবসাদ আসে, মনে হয় যে এমন করিয়া বাঁচিয়া লাভ নাই, এ জীবনের যবনিকা এইখানেই টানিয়া দেওয়া ভাল, এমন ভাবে আর পারা যায় না—তখন সে প্রাণপণে ঐ মন্ত্রই জপ করে—'আমি অপরাজেয়, আমি হার মানব না কিছুতেই।'

ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে সব চেয়ে যেটা বড় ঘটনা, সেটা হইতেছে তাহার পুত্রসন্তান লাভ। তাহার ছেলে হইয়াছে—ছেলে! বংশধর, উত্তরাধিকারী, তাহার আশা ও আদর্শের উত্তর-সাধক। কথাটা সে বিশ্বাসই করিতে পারে নাই বহুদিন,—এখনও মনে হইলে, ভাল করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা করিলে কেমন একটা রোমাঞ্চ হয়। সব চেয়ে বিস্ময় বোধ হয় তাহার এত কম, এই বয়সে সে ছেলের বাবা হইয়া বসিবে এমন কথা কে ভাবিয়াছিল! ছেলে-বেলায় সে বিবাহ করিবার কথা ভাবিতেই পারিত না। সেটা একটা সুদূর ব্যাপার, যখন হোক হইবে'খন। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পর, আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর হইবার পর অনেক বেশী বয়সে কথাটা চিন্তা করা যাইবে—এই ছিল তখন-কার মনের ভাব। তারপর সন্ধ্যার সংস্পর্শে আসিবার ফলে জীবনের আদর্শ যখন গেল বদলাইয়া তখন শুধু ভাবিত এই উৎসর্গীকৃত জীবনে কর্মপথে যদি কখনও তেমন সঙ্গিনী, সহকর্মিণী পাই তবেই দেখা যাইবে। আর, হয়ত এমন একজন সঙ্গিনীর কথা মনের অবচেতনে ভাবিত যাহার সহিত সন্ধ্যার কতকটা মিল আছে।

কিন্তু এ যেন কোথা দিয়া কি হইয়া গেল? একটা বিপুল ওলট-পালটের মধ্যে সহসা সে আবিষ্কার করিল যে, সে পুত্রের পিতা। বিশেষ একটা গুরুদায়িত্ব তাহার মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

ছেলে হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পরেও কিছুদিন সে ওখানে যাইতে পারে নাই —নূতন কাজ, ছুটি পাওয়া কঠিন। তাহার উপর খরচের টানাটানি—প্রথম সন্তানের মুখ দেখিবে, সোনা না দিয়া দেখার কথা ভাবিতেও পারা যায় না। তবে সংবাদ পাইয়া, তাহাকে না জানাইয়া সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছিল দাসী-চাকর সঙ্গে লইয়া—সোনার হার দিয়া ছেলের মুখ দেখিয়া আসিয়াছে, প্রসূতির জন্য ফল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য-ঔষধও দিয়া আসিয়াছে বিস্তর।

অবশেষে কী একটা ছুটিতে ভূপেনও গেল, বিশুর কাছ হইতেই কিছু টাকা ধার করিয়া পাত্‌লা সোনার পাতের একজোড়া বালা গড়াইয়া লইয়া।

ছেলেটি নাকি তাহার মতই দেখিতে হইয়াছে। অন্তত কল্যাণীর তাই অভিমত। কে জানে। ভূপেন বুঝিতে পারে না। এখন ত একটা মাংসপিণ্ড মাত্র। তবে রংটা হইয়াছে কল্যাণীর চেয়ে দুই-এক পোঁছ উজ্জ্বল, কতকটা ভূপেনেরই মত। মাংসের ডেলাটাকে ধরিতে ভয় করে, মনে হয় বুঝি ভাঙিয়া যাইবে। তবু কেমন এক প্রকারের স্নেহ উদ্বেল হইয়া ওঠে সেদিকে চাহিয়াই—কৌতুক ও কৌতূহলের অবধি থাকে না। এ যেন এক বিস্ময়কর ঘটনা—এক পরমাশ্চর্য আবির্ভাব।

কিন্তু দুইদিন পরেই ফিরিয়া আসিতে হয়। ছুটি নাই—ইস্কুলের যদি-বা আছে—নূতন টিউশ্যনী, কামাই করিতে ভয় করে। ভবে তাহার মনটা উদ্বিগ্ন হইয়াই রহিল; কল্যাণীর শরীর খারাপ, তাহার উপর এখনই সংসারের কাজ শুরু করিতে হইয়াছে। একটা দাসী রাখিয়া দিল ভূপেন একরকম জোর করিয়া। মহেশবাবুরা সেই কয়দিন যথেষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাই বা আর কত দেখেন?

এখানে ফিরিয়া আসিয়া ভূপেন যত বিলাতী মাতৃমঙ্গল বই খুলিয়া পড়িতে বসে। যে সব উপদেশ তাহাদের মধ্যে আছে অধিকাংশই ব্যয়বহুল, তাহারই ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি নির্দেশ—যাহাতে পয়সা খরচ নাই, শুধুই সতর্ক হইয়া চলিবার ব্যবস্থা—তর্জমা করিয়া লিখিয়া পাঠায় কল্যাণীকে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের একটা সহজাত উপেক্ষা আছে, সেটা অশিক্ষারই ফল। গর্ভবতী বা প্রসূতির আহারের উপর, তাহাদের জীবনযাত্রার উপর যে সন্তানের স্বাস্থ্য নির্ভর করে তাহা এখনও অনেকেই জানে না, বলিলেও বিশ্বাস করে না। অথচ তাহারাই কষ্ট পায় সেজন্য। যদি কোন উপযুক্ত গৃহিণী থাকিতেন, তাহা হইলে ভূপেনকে এসব চিন্তা করিতে হইত না, কিন্তু এক্ষেত্রে উপায় কি? তাহার অত্যন্ত দুর্ভাবনা—সন্তান না চিরকাল রুগ্ন অকর্মণ্য হইয়া থাকে।

ছেলে যদি তাহার চোখের সামনে থাকিত তাহা হইলে সে অত ভাবিত না। তাহা ত নাই-ই, মধ্যে মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিবে এমন সম্ভাবনাও নাই। ব্যয় বাড়িয়াছে—আয় ত সমানই আছে। ষাট টাকা মাহিনা আর চল্লিশ টাকার টিউশ্যনী এই ত ভরসা। এখানে মেসের খরচা দিয়া নিজের কাপড়-জামা ধোপা-নাপিত ট্রাম-বাস প্রভৃতি চালাইতে খুব কম করিয়াও চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা পড়ে, বাকি টাকা হইতে কল্যাণীদের চল্লিশ টাকা পাঠাইতে হয়—ইস্কুলের দশ টাকা পেন্‌সন্‌ এই ত ভরসা সেখানে, এ টাকার কম কুলায় না। কল্যাণীর জন্য এক পোয়া দুধেরও বরাদ্দ করিতে হইয়াছে—নহিলে ছেলেটা বাঁচে না। এটুকুও যথেষ্ট নয় তাহা সে জানে—চিকিৎসকরা অন্তত এক সের দুধের উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু কোথা হইতে কি হয়? তা-ই ঐ কটা টাকায় যে কী ভাবে চলিতেছে তাহা একমাত্র কল্যাণীই জানে। রাখু পাস করিয়াছে বটে, সে ইস্কুলে ঢুকেবে এমনিই কথা ছিল, কিন্তু মহেশবাবু তাহার জন্য কোন্‌ মফঃস্বলের কলেজে বিনা বেতনে পড়া ও একটি ভদ্রলোকের বাড়ি গৃহশিক্ষকরূপে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া যখন তাহার মত জানিতে চাহিলেন, তখন আর সে 'না' বলিতে পারিল না। এখন উপার্জ্জন

করিতে শুরু করিলে তাহার সামান্যই উপকার হইত কিন্তু রাখুর নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট হইয়া যাইত একেবারেই। তার চেয়ে সে-ই না হয় আর কিছুদিন কষ্ট করিবে। তা-ও তাহার দুই-একখানা বই কিনিয়া দিতে হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে হাতখরচের জন্য দু-একটা টাকাও পাঠাইতে হয়।

ইহার মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল শান্তির বিবাহ।

এ পাত্রটিকে ভূপেনই ঠিক করিয়া দিয়াছে। ছেলেটি তাহার মেসেই থাকে, প্রিয়দর্শন মিষ্ট-স্বভাবের ছেলে, আই-এস-সি পাস করিয়া চাকরিতে ঢুকিয়াছিল—কোন এক কেমিক্যাল কোম্পানীর ঔষধ ও প্রসাধন-সামগ্রী লইয়া দুই-তিন বৎসর উত্তর-বিহারে প্রচার ও বিক্রয় করিয়াছে, সম্প্রতি আর এক বিলাতী কোম্পানীতে কাজ লইয়া এখানে আসিয়া বসিয়াছে। এখন আর ঘোরাঘুরি করিতে হইবে না, মাহিনাও মন্দ নয়, আশি টাকা। দেশে সামান্য কিছু জমি-জায়গা আছে, মাথার উপর বাপ-মাও আছেন। বাবা গ্রামের ইস্কুলের শিক্ষক। বড় ভাই বোম্বেতে কী চাকরি করেন—ইত্যাদি। অর্থাৎ এক কথায় সৎপাত্র। ছেলেটিকে প্রথম হইতেই তাহার ভাল লাগে, আর তখনই শান্তির কথা মনে হয় সজাতি বলিয়া। আশ্চর্য, সে যে এমন মনের মধ্যে অভিসন্ধি পোষণ করিয়া কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে এবং শেষ পর্যন্ত তাহার পিছনে লাগিয়া তাহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া লইতে পারিবে—তাহা কে জানিত। কিন্তু শেষ অবধি তাহাই করিল সে, বন্ধুত্বের সুযোগ লইয়া তাহার কাছে কথার ছলে নিজের ভগ্নীর অপরিসীম গুণ ও কমদক্ষতার বর্ণনা করিতে করিতে এক সময়ে শঙ্করকে সে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাহার পর বিশুর সাহায্যে বাড়িতে পাঠাইয়া পাত্রী দেখানো ও পাত্রের বাপের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে বেশী সময় লাগিল না। ঘটকালির কাজটা সে নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন করিল।

এই উপলক্ষে আর একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল অকস্মাৎ।

বিবাহের দিন অবধি ধার্য হইয়া গেলেও ভূপেন একবারও বাড়িতে যায় নাই। উপেনবাবুর প্রতিজ্ঞা তখনও পর্যন্ত অটল আছে—তিনি ছেলের মুখ দেখিবেন না বা তাহার নিকট হইতে অর্থসাহায্য লইবেন না। তাহাদের মনোমালিন্যের ইতিহাস সে শঙ্করের কাছে ইহার আগেই খুলিয়া বলিয়াছিল—সুতরাং সে অনুরোধ করাতে বরাভরণের দাবিটা শঙ্কর বাবাকে দিয়া নাকচ করাইয়া দিয়াছিল। তাহার বদলে ভূপেনই নিজের অতি-কষ্টে সঞ্চিত টাকা হইতে ভগ্নিপতির আংটি বোতাম ও ঘড়ি কিনিয়া দিল। এ ছলনাটুকু যে উপেনবাবুর কানে ওঠে নাই তাহা নয় কিন্তু তিনিও আর বেশী বাড়াবাড়ি না করিয়া কথাটা চাপিয়া গেলেন।

এইভাবে ভূপেনকে বাদ দিয়াই বিবাহের আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, তখন সন্ধ্যা একদিন আইবুড়ো-ভাত দিবার নাম করিয়া শান্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল এবং নিজে গাড়ি পাঠাইয়া আরও দুটি বোন-সুদ্ধ শান্তিকে নিজের বাড়িতে আনিয়া লইল। উপেনবাবু সন্ধ্যাকে শাসাইয়া দিয়াছিলেন যে সে যেন এই উপলক্ষে ভ্রাতা ভগ্নীর মিলনের চেষ্টা না করে। সন্ধ্যা তাহা করেও নাই, কিন্তু ভূপেন আজও সন্দেহ করে যে ব্যাপারটার মধ্যে সন্ধ্যারই কিছু হাত আছে। কারণ বিবাহের

যখন ঠিক দুইদিন বাকি, তখন শান্তি বলিয়া বসিল যে দাদা-বৌদি যদি তাহার বিবাহে না আসে তাহা হইলে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না এবং মুখে অন্নজলও দিবে না। প্রথমটা উপেনবাবু তাহার কথা বিশেষ গ্রাহ্য করেন নাই কিন্তু সারা দিন এবং রাত দশটা পর্যন্ত যখন সে একেবারে নিরম্বু কাটাইয়া দিল এবং মেয়েরা একযোগে এই ব্যাপার লইয়া চেঁচামেচি ও কান্নাকাটি শুরু করিল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রথমটা খুব তর্জন-গর্জন করিলেন—মেয়েদের, ছেলেকে ও ছেলের মাকে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া গালি দিলেন, একবার সিঁড়ির রেলিং-এ মাথাও খুঁড়িলেন কিন্তু এ-পক্ষ যখন তাহাতেও অবিচলিত রহিল, তখন রাত বারোটার সময় শিবুকে ডাকিতে পাঠাইলেন। শান্তির এই সত্যাগ্রহের পিছনে যে একটা চক্রান্ত আছে তাহা উপেনবাবু ধরিতে পারিয়াছিলেন ঠিকই—তিনি য়্যাটর্নীর নাতনীর উদ্দেশ্যেও কতকগুলি কটূক্তি করিলেন। কিন্তু সে নিজে হইতে যাচিয়া সব চেয়ে ভারী অলঙ্কারখানি পূর্বাহ্ণেই পেঁছাইয়া দিয়াছিল বলিয়া মনের মধ্যে একটু স্নেহবোধও ছিল—বেশী কিছু বলিলেন না।

প্রথমটা ভূপেন রাজী হয় নাই কিন্তু শান্তি সারাদিন অনাহারে আছে শুনিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। তা-ছাড়া বিবাহটার মধ্য হইতে এমন ভাবে বঞ্চিত থাকিতে তাহারও ভাল লাগিতেছিল না। সে তখনই বিশুর সহিত বাহির হইয়া পড়িল। কি করিয়া যে বাবা-মা'র সামনে দাঁড়াইবে তাহা জানে না—কী করিবেন তাঁহারা, কি বলিবেন, তাহার ঠিক কি। সে যে অপরাধী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শেষ পর্যন্ত একসময়ে যখন সেই অতিপরিচিত গলির মধ্যে পড়িল এবং তাহাদের পুরাতন জরাজীর্ণ সদরও পার হইল তখন অদ্ভুত একটা দুর্বলতা অনুভব করিতে লাগিল মনে মনে। বিশু তাহাকে একপ্রকার টানিয়াই লইয়া গেল উপেনবাবুর সামনে—তা-ও সে কোনমতে প্রণামটা সারিয়া মাথা হেঁট করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। বাবার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

উপেনবাবুও অপাঙ্গে একবার ছেলের মুখের দিকে চাহিলেন মাত্র। তিনি নাটকটা এড়াইবার জন্য বোধ হয় প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন—একেবারে একটা দশ টাকার নোট ছেলের হাতে দিয়া বলিলেন, কালই ভোরের ট্রেনে রওনা হয়ে বিকেলের মধ্যে বৌমাকে নিয়ে এস। আর (গলাটা একবার কাশিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন) বেয়াই মশাইকে, ছেলেমেয়েদের সব আমার নাম ক'রেই নিমন্ত্রণ জানিও, যদি আসতে চান ত নিয়ে এস।

তাহার পর, উপেনবাবুর পালা শেষ করিয়া রান্নাঘরে মা'র সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই সে এক বিপর্যয় কাণ্ড শুরু হইয়া গেল। মা তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পাগলের মত একবার হাসিতে ও একবার কাঁদিতে লাগিলেন। বোনেরা অভিমান করিয়া থাকিবে ভাবিয়াছিল কিন্তু উল্লাসের স্রোতে তাহাদেরও অভিমান ধুইয়া মুছিয়া ভাসিয়া গেল। সকলে মিলিয়া চেঁচাইয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া হাট বাধাইয়া তুলিল। সে-রাত্রে কেহ ঘুমাইল না—ভূপেনকেও ঘুমাইতে দিল না।

পরের দিন ভোরের ট্রেনেই ভূপেন রওনা হইয়া গেল। কল্যাণী অপ্রত্যাশিত

ভাবে তাহাকে দেখিয়া খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু আগমনের কারণটা শুনিয়া বিবর্ণ হইয়া গেল। শ্বশুরবাড়ি হইতে বঞ্চিত থাকিবার অগৌরবটা তাহাকে প্রতিনিয়ত বিঁধিত এটা ঠিক—কিন্তু এখন অন্য নানা রকমের দুশ্চিন্তা তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। প্রথমত তাহার ন্যায় রূপহীনা ও বিত্তহীনা বধূ দেখিয়া তাঁহারা কি বলিবেন ঠিক কি, তারপর এইভাবে তাঁহাদের ছেলেকে সর্ব প্রকার সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত করিবার অপরাধ কি ক্ষমা করিতে পারিবেন? ছেলেকে পর করিয়া দেওয়ার জন্য যে বিদ্বেষ তাহা কি আর এত সহজে মুছিবে? আর যদি বা তাঁহারা ক্ষমা করেন, সে ত আর এক দুর্ভাবনা। এতদিন পরে বধূ ও পৌত্রের সহিত মিলিত হইয়া যদি আর না ছাড়িতে চান? কীই বা বলিবার আছে তাহার, যাহা স্বাভাবিক, যাহা তাহার পক্ষে সুখের ও গৌরবের, তাহাতে 'না' বলিবে কেমন করিয়া? অথচ এখানে অন্ধ বাবা ও মৃতকল্প পিসীমা—তাঁহাদের কি গতি হইবে?

তাহার মুখের এই অপরিসীম পাণ্ডুরতা দেখিয়াই ভূপেন অবশ্য কারণটা বুঝিল। সে সস্নেহে তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, তুমি কি তাঁদের কাছে লাঞ্ছনার ভয় করছ? না হয় কিছু সইতে হ'লই, আমার জন্যে পারবে না সইতে?

লজ্জিত হইয়া কল্যাণী তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না না, তা মোটেই ভাবছি না। যদি আর তাঁরা আসতে না দেন—এঁদের কি হবে তাই ভাবছি।

—ছি! ভূপেন অনুযোগের সুরে বলিল, আমি কি এতই অবিবেচক? আমি সে ব্যবস্থা ক'রে দেব। যতদিন না রাখুর বিয়ে হয়, ততদিন তোমাকে বাবার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে দেব না।

সে যে মুহূর্তের জন্যও তাহার এমন স্বামীকে অবিশ্বাস করিতে পারিয়াছে তাহারই লজ্জায় কল্যাণী আর মাথা তুলিতে পারিল না, ভূপেনের কোলের মধ্যে মুখটা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

বিজয়বাবু অবশ্য যাত্রাকালে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, আশীর্বাদ করি মা—মনের সুখে চিরকাল সেই ঘরই করো। আমাদের জন্যে ভেবো না, তাঁরা যদি পায়ে ঠাঁই দেন ত ফিরে আসবার দরকার নেই। আমাদের যেমন ক'রেই হোক দিন কাটবে। ভেবে দ্যাখ্ যদি অপর কোন জায়গায় বিয়ে হ'ত—আর বিয়ে ত দিতেই হ'ত যেমন ক'রে হোক—তা'হলে কি আর আমাদের মুখ চেয়ে তারা ফেলে রাখত?

তারপর একটুখানি ইতস্তত করিয়া ভূপেনকে কহিলেন, বাবা ভূপেন, তুমি ত শুধু আমার জামাই নও—আমার বড় ছেলের কাজই করছ। সবই যখন তোমার কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হচ্ছে তখন তোমাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি। বলতে গেলে মেয়ে আমার এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, অনেক কিছুই আমার দেওয়া উচিত ছিল—কিছুই ত দিতে পারলুম না, আমার জন্যে তোমাকে কত অপ্রতিভ হ'তে হবে, কিন্তু তোমার বোনের বিয়েতে অন্তত একখানা কাপড়ও যদি না দিতে পারি—

কথা শেষ করিতে পারিলেন না। ছোট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, নারায়ণ! নারায়ণ!

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া ভূপেন কহিল, সেজন্য আপনি ভাববেন না। কাপড় একটা কিনে রাখতে বলে এসেছি বিশুকে। মিষ্টিটা এখান থেকেই নিয়ে যাবো।...

গাড়ি যতই কলিকাতার কাছাকাছি পেঁাছিতে লাগিল, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কল্যাণীর মুখ ততই বিবর্ণ হইতে বিবর্ণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। উপেনবাবু ও ভূপেনের মায়ের চিঠি সে দেখিয়াছে, কী পরিমাণ বিদ্বেষ তাঁহাদের মনে আরও এতদিনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। একেই ত শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের কত কাহিনী সে শুনিয়াছে সকলের মুখে।

কিন্তু ভয় যতই থাক্—প্রথম পর্বটা কাটিয়া গেল নির্বিবাদেই।

উপরে উঠিয়া প্রথমেই তাহারা পড়িল উপেনবাবুর সামনে। কল্যাণী কী এক প্রকার অবোধ ভয়ে দিশাহারা হইয়া কোনমতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ছেলেটাকে একেবারে শ্বশুরের পায়ের কাছে সেই চলনের উপরই শোয়াইয়া দিল।

উপেনবাবু 'হাঁ-হাঁ—কর কি, কর কি' বলিতে বলিতে অস্ফুটকণ্ঠে কল্যাণীকে কী একটু আশীর্বাদ করিয়াই রোরুদ্যমান পৌত্রকে কোলে তুলিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। ব্যস্। তাহাতেই কাজ হইল, তাঁহার এতদিনের সমস্ত অভিমান, সমস্ত বেদনা গলিয়া জল হইয়া অশ্রুর আকারে বাহির হইয়া আসিল। তিনি পৌত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে আদর করিতে করিতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নানারূপ মিষ্ট গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পৌত্রও অদন্তমুখে হাসিয়া তাহার জবাব দিল।

ভূপেনের মা বধূকে বরণ করিয়া লইয়া গেলেন। শান্তি ও উৎপলা জড়াইয়া ধরিল। ছোট বোনটি নাচিতে লাগিল। এক কথায় প্রথম ফাঁড়াটা নির্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল।

অবশ্য তাই বলিয়া কল্যাণীর আশঙ্কা একেবারেই অমূলক রহিল না। শ্বশুর ও শাশুড়ী তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অনেক বাঁকা বাঁকা কথাই বলিলেন কুটুম্ব এবং আত্মীয়দের উপলক্ষ করিয়া। এমন কি কল্যাণীর বাবা ও স্বর্গতা মাও সে আক্রমণ হইতে রেহাই পাইলেন না। প্রথম প্রথম এসব কথায় কল্যাণীর চোখে জল আসিত কিন্তু ভূপেন তাহাকে বুঝাইয়া দিল ইহাই স্বাভাবিক। কল্যাণী নিজেকে একবার শাশুড়ীর স্থলে কল্পনা করুক না! তাহারও ত সন্তান হইয়াছে। বিশেষত প্রথম সন্তান যে কি জিনিস সে-ও বুঝিতে পারিতেছে। তা ছাড়া এই এদেশের অধিকাংশ বধূর প্রাপ্য—এটা পুরুষানুক্রমেই চলিয়া আসিতেছে। তাহার মা, ঠাকুমা সকলেই এ লাঞ্ছনা অল্পবিস্তর সহিয়াছেন। বরং অনেককেই ইহার চেয়ে অনেক বেশী সহিতে হয়। সেদিক দিয়া ত কল্যাণীর ভাগ্য অনেকটা ভাল।

বিবাহের রাত্রে সন্ধ্যা আসিয়াছিল। সেও ইহাদের কথার আঁচে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া কল্যাণীকে আড়ালে অনেক বুঝাইয়া গেল। যদিও তাহার

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই এসব ব্যাপারে, তবু সে অনেক পড়িয়াছে এবং শুনিয়াছে। এসব আক্রমণ যেন কল্যাণী না গায়ে মাখে—বরং ইহার চেয়ে বেশী আক্রমণের জন্যই প্রস্তুত হয়—এই কথাই বার বার বলিয়া গেল সে।

সেদিন অত ব্যস্ততার মধ্যেও একটা ব্যাপার কিন্তু ভূপেনের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সেটা ভূপেনের সন্তান সম্বন্ধে সন্ধ্যার ঔদাসীন্য। একবার মাত্র উহাকে কোলে করিয়াই সে উৎপলার কোলে ফিরাইয়া দিল এবং আর কোলে করিবার চেষ্টাও করিল না। শুধু গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময়, বিদায় লইতে গিয়াও, কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ঘুমন্ত খোকাকে একটা চুম্বন করিতে গেল। সে বিছানার উপর হেঁট হইয়া চুমা খাইতেছিল, মুখ তুলিয়া পিছন ফিরিয়াই বাহির হইয়া গেল কিন্তু উৎসব-বাড়ির জোর আলোতে তাহারই মধ্যে ভূপেনের চোখে পড়িল, খোকার গালের উপর এক ফোঁটা জল। ভূপেন কাহাকেও কিছু বলিল না, বরং সকলের অলক্ষ্যে সে জলটা মুছিয়া লইল। সন্ধ্যার মনের ভাবটা বুঝিতে পারিয়া তাহার চোখের শিরা-দুটাও তখন টনটন্ করিতেছে।

একটা বড় রকমের গোলমাল বাধিল শান্তির বিবাহ মিটিয়া গেলে কল্যাণীর পিত্রালয়ে ফিরিবার সময়ে। ভূপেনের বাবা ও মা পৌত্রের স্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা আর ছাড়িতে প্রস্তুত নন। কল্যাণী ঠিক এই আশঙ্কাই করিয়াছিল, সে কিছু বলিতে পারিল না। তবে ভূপেন তাহার পূর্ব প্রতিজ্ঞায় অটল রহিল। সে প্রথমটা উপেনবাবুকে সব কথা বুঝাইয়া রাজী করাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু তিনি কোন যুক্তিই শুনিলেন না। বলিলেন, মেয়ে মরে গেলে ওদের চলবে কি ক'রে? মনে করুক মেয়ে মরেই গেছে।

ভূপেন বলিল, বেঁচে থাকতে সেটা মনে করা যায় কি ক'রে বলুন? আপনারাই মনে করুন না যে বৌ মারা গেছে।

কিন্তু উপেনবাবু তাহাতেও দমিলেন না। বলিলেন, তা হ'লে ত বাঁচি—ছেলের আর একটা ভাল দেখে বিয়ে দিই।

অগত্যা ভূপেনকে বুঝাইয়া দিতে হইল যে, সে কথা দিয়া আসিয়াছে। এখন অন্তত কল্যাণীকে পাঠাইতে হইবে। উপেনবাবু এতদিনে ছেলেকে চিনিয়াছিলেন, তিনি আর কিছু বলিলেন না। শুধু বধূ ও বধূর পিতাকে নানারূপ গালি দিয়া মনের জ্বালা মিটাইলেন।

মা বলিলেন, সেখানে একটা রাঁধুনী রেখে দে না।

—প্রথমত সেখানে তা পাওয়া শক্ত, তা ছাড়া গরিবের সংসার কি রাঁধুনীর হাতে চলে?

—তোমাদের সব তাইতে বাড়াবাড়ি। রাক্কুসি! রাক্কুসি আমাদের সব দিক দিয়ে বঞ্চিত করলে। আমার সোনার চাঁদ ছেলেকে ভুলিয়ে কি আঁস্তাকুড়ে নিয়ে গিয়েই ফেললে! ঐ ত রূপ, বাপ একটা কানা-কড়িও দেয় নি, উল্‌টে আমার ছেলের যথা-সর্বস্ব শুষে নিচ্ছে—তার ওপর আবার নাতিটা থেকেও বঞ্চিত করলে হতভাগী। এমন শত্তুর কোথায় বসে আমার জন্যে তপস্যা কচ্ছিল রে! ওরে

আমার সাতজন্মের শত্তুর রে।···ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভূপেন ধীরভাবে এ সবই সহ্য করিল, কল্যাণীর ত সহ্য না করিয়া উপায় নাই। এ সবই সত্য, এ সবই তাহার প্রাপ্য। তাহার অবনত মস্তক আরও নত হইয়া পড়িল শুধু।

বোনেদেরও মুখ ভার। তাহাদের উপলক্ষ করিয়া বাপ-মাকে শোনাইয়া ভূপেন সান্ত্বনা দিয়া গেল, ভয় নেই, মাঝে মাঝে সুবিধে পেলেই নিয়ে আসব। আর, খোকা একটু বড় হ'লে এখানেই রাখব।

ওখান হইতে ফিরিয়া ভূপেন মেস ছাড়িয়া সেই পুরাতন টালির ঘরে আসিয়া উঠিল। ইহাতে খরচটা ওদিক দিয়া বাঁচিল বটে কিন্তু বাড়িতে আরও বেশী খরচ না করিয়া উপায় রহিল না। আয় ও ব্যয়ের এই অসামঞ্জস্যকে মিলাইতে তাহার প্রাণান্ত হইতে লাগিল।

॥ ২৮ ॥

এদিকে এই কয় বৎসর বাহিরের পৃথিবীতেও নানা বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। সারা পৃথিবী জুড়িয়া বিরাট যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে, সে যুদ্ধের ঢেউ এখানে, এত দূরেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

প্রথম গেল বোমার হিড়িক। জাপান পার্ল হারবার ধ্বংস করিল। তারপর সিঙ্গাপুর মালয়, শেষে বর্মা পর্যন্ত পৌঁছিল। আর রক্ষা নাই, পালা, পালা। যাহাদের পয়সা ছিল তাহারা পলাইল। যাহাদের কোন সঙ্গতি নাই তাহারা যায় কোথায়? ভূপেন একবার ভাবিয়াছিল মা ও বোনেদের বিজয়বাবুর ওখানেই পাঠায় কিন্তু খরচের অংকটা অনুমান করিয়া চুপ করিয়া গেল। অবশ্য তাহাদের মত অবস্থার লোকও অনেকে যথাসর্বস্ব, মায় ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়া যে যায় নাই তাহা নয়, তাই দেখিয়া উপেনবাবুও একবার নাচিয়া উঠিয়াছিলেন—কিন্তু ভূপেন অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিল। ইতিমধ্যেই স্কুল ছাত্রশূন্য হইয়া গিয়াছে। স্কুলের চাকরি আর কতদিন থাকে তাহার ঠিক কি? ভরসার মধ্যে ছিল প্রশান্তরা, তাহারা সর্বাগ্রে চলিয়া গেল। প্রশান্ত অবশ্য তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য খুব জিদ্ করিয়াছিল কিন্তু বাপ-মা-বোনের কথাটা মনে করাইয়া দিতে চুপ করিয়া গেল।

যাই হোক্ ক্রমে ক্রমে সে হিড়িক কাটিল। কিন্তু এই ক-মাসেই তাহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল মাহিনা দিয়াছে নামমাত্র, ফলে চারিদিকেই দেনা—ছোট বড় মাঝারি। শহরে আবার জনসমাগম হইতে ভূপেনকে দুইটা টিউশ্যানি লইতে হইল। তাহাতেও দেনা শোধ হয় না—খরচ কিছু কিছু বাড়িয়াই চলিয়াছে। শান্তি সন্তান-সম্ভবা, তাহার নানারকম তত্বতাবাস আছে, উৎপলারও বিবাহ আর না দিলে নয়। উপেনবাবু এখন একেবারেই গা এলাইয়া দিয়াছেন। মাহিনা যা পান তাহার হাতে দিয়া খালাস।

এমনি করিয়া ঘরে বাহিরে নিজের সমস্যা লইয়াই সে বিব্রত, তাহার উপর আর একটা সমস্যাও পাষাণ-ভারের মত ঘাড়ে চাপিয়া রহিয়াছে। সে সমস্যা সন্ধ্যার। মোহিতবাবুর অনেকগুলি বন্ধু আছেন—বিষয়-কর্মের ব্যাপারে তাঁহারা

যথেষ্ট সাহায্য করেন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সে-ই অভিভাবক। সন্ধ্যার একুশ বৎসর পূর্ণ হইতে দেরি নাই, তাহার পর সে স্বাধীন, ভূপেনেরও দায়িত্ব শেষ হওয়ার কথা—কিন্তু সে দায়িত্ব শুধু আইনের। আইনের চেয়ে ঢের বড় দায়িত্ব যে একটা আছে সে কথা অস্বীকার করে কি করিয়া? কোথাও একটা ভাল পাত্র দেখিয়া সন্ধ্যার বিবাহ দিতে পারিলে সে সত্যকার নিশ্চিন্ত হয়—কিন্তু কথাটা তুলিতেই তাহার ভরসা হয় না, কোথায় যেন সংকোচে বাধে। অথচ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়াও তাহার যে দিন কাটে না, তাও সে লক্ষ্য করে। ভূপেন আসিবার বিশেষ সময় পায় না—যদি বা পায়, ভয়ে ভয়ে এড়াইয়া চলে। এ ভয় তাহার নিজের জন্য। এ আশংকা—সে অস্বীকার করুক না করুক—তাহার নিজের অন্তরকে। সন্ধ্যা তাহার দারিদ্র্যে কষ্ট পায় কিন্তু প্রতিকার করিতে পারে না—তার সে যন্ত্রণা ভূপেন বোঝে তবু কোথায় একটা সূক্ষ্ম আত্ম-সম্মানবোধ কিছুতেই তাহাকে একটি পয়সাও গ্রহণ করিতে দেয় না। শুধু আত্ম-সম্মানবোধও নয়—পাছে সন্ধ্যার মনে ভূপেনের যে স্থানটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাহা কোনদিন এই প্রকার সাহায্য গ্রহণের ফলে এতটুকু নামিয়া আসে—বোধ করি এমন আশংকাও একটা ছিল, তাই সে সন্ধ্যার কাছে ঋণগ্রহণেও কুণ্ঠিত।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা একটা পাগলামি করিতে গিয়াছিল। কোন্ এক মফঃস্বল কলেজে চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল যে, সে যদি খুব মোটা একটা টাকার অংক দিয়া সাহায্য করে তাহা হইলে তাঁহারা সন্ধ্যার নির্বাচিত কোন লোককে অধ্যাপকের চাকরি দিতে রাজী আছেন কিনা? অবশ্য যোগ্যতার অভাব হইবে না। বলা বাহুল্য তাঁহারা রাজীই ছিলেন কিন্তু গোলমাল বাধিল টাকাটা তুলিবার সময়, এখনও ভূপেনের সই না থাকিলে টাকা তোলা যায় না। মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস সন্ধ্যার বিশেষ নাই, সে ধরা পড়িয়া গেল সহজেই—এক-একটি করিয়া ভূপেন সব কথা জানিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল আর কখনও এমন কাজ সে করিতে চেষ্টা করিবে না।

সে বলিল, ছি ছি—কী করতে যাচ্ছিলে বল দিকি! এ টাকাগুলো ত যেতই, অথচ আমি জানতে পারলে কখনই ও কাজ নিতুম না। অবশ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তুমি সাহায্য করতে চাও এমনি করো, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে ক'রো না কখনও। এখনও যা ক'রে খাচ্ছি এ ত তোমারই দয়ায় সন্ধ্যা, আর ঋণ তুমি বাড়াবার চেষ্টা ক'রো না। বলো, আমাকে কথা দাও যে এমন চেষ্টা আর কখনও করবে না? নইলে আমি একেবারে এ বাড়ি আসা বন্ধ করব তা বলে দিচ্ছি।

অগত্যা সন্ধ্যাকে কথা দিতে হইল। তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল অভিমানে ও অক্ষমতায়, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় সেটা দমন করিয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

ইহার শোধ সে তুলিল দিনকতক পরে—ভূপেন অনেক দিন ধরিয়া বলি-বলি করিতে করিতে একসময় যখন কথাটা বলিয়াই ফেলিল, তখন সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না মাস্টার মশাই, আমি আপনার সব কথাই সব সময়ে শুনেছি, আপনি আমার এই কথাটি শুনুন, ঐ চেষ্টাটা করবেন না। বিয়ে আমি করব না

এমন কথা বলতে চাই না, যদি কখনও আমার সময় আসে, ভাল বুঝি ত নিজেই করব।

ভূপেন বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আমার একটা দায়িত্ব আছে—সেটা যে আমায় বড় পীড়ন করছে সন্ধ্যা।

—সে দায়িত্ব ত আর মাত্র দু-মাসের।

—আমি যে দায়িত্বের কথা বলছি সে ত দু'মাস পরে ফুরোবে না—যতক্ষণ না তোমাকে কোন সত্যিকার অভিভাবকের হাতে তুলে দিতে পারছি ততক্ষণ আমার একটা দায়িত্ব থাকবেই।

অকস্মাৎ সন্ধ্যা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে একটু তীক্ষ্ন কণ্ঠেই কহিল, সে রকমের দায়িত্ব কি শুধু আপনারই আছে মাস্টার মশাই, আমার নেই? বেশ, আপনি যখন যার সঙ্গে বলবেন আমি বিয়ে করতে রাজি আছি, কিন্তু আপনি কথা দিন যে আমার কাছ থেকে আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে আমি যত টাকা দেব, নেবেন। বলুন।

—সে সম্ভব নয়।

—তা'হলে স্মরণ রাখবেন, আমারও কতকগুলো সম্ভব-অসম্ভব আছে। চিরকাল আপনার সমস্ত জুলুম যে আমাকে মানতে হবে তার কি মানে?

সে আর কোনপ্রকার বাদানুবাদের অবসর না দিয়াই উঠিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা চিরকালই শান্ত, ভদ্র। এ ধরনের কথাবার্তাও আর কোনদিন ভূপেন শোনে নাই—এমন নাটকীয়পনাও দেখে নাই। কতখানি বেদনায় এটা সম্ভবপর হইয়াছে অনুমান করিয়া ভূপেন চুপ করিয়া গেল। মনে মনে দুঃখিত হইল সে মোহিতবাবুর জন্য, ভদ্রলোক সন্ধ্যাকে স্নেহ করিতেন সমস্ত অন্তর দিয়া, তেমনি ভূপেনেরও তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, অথচ দুজনেরই শুভ কামনায় এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিলেন যাহা না করিলে হয়ত উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইত। সন্ধ্যা ত সুখী হইতই, আর,—হয়ত ভূপেনের জীবনও পরিণতির পথ খুঁজিয়া পাইত।

এক-একবার তাহার মনে হয় ভুল সে-ও করিতেছে না ত? মোহিতবাবুর কথাগুলি বিক্ষিপ্তভাবে মনে আসে—'মিথ্যা মোহকে, সম্মানবোধকে আঁকড়ে ধরে না থাকলেই হ'ত। প্রতিজ্ঞা বা শপথ প্রাণপণে রক্ষা করাই শুধু বীরত্ব নয়—অনেক সময় তাকে লঙ্ঘন করা আরও সৎসাহসের কাজ।' কিংবা মৃত্যুশয্যার কথাগুলো—'সত্যটা বিচার ক'রে নিও, আমার মত একটা সংস্কারকে সত্য বলে আঁকড়ে থেকো না। পুঁথির সত্য আর জীবনের সত্য এক নয়—চলার পথে সত্য তাঁর নিজের মহিমায় আপনি প্রকট হন।'…কী ক্ষতি হয় সন্ধ্যার কাছ হইতে কিছু টাকা লইলে? তাহার জীবনের যা আদর্শ তাহা সে অনায়াসে অনুসরণ করিতে পারে। একটি সত্যকার বিদ্যায়তন গড়িয়া তোলা তাহার পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব হয় না—যদি হাতে টাকা থাকে।…হয়ত তাহাতে সন্ধ্যাও শেষ পর্যন্ত সুখী হয়—নিশ্চিন্ত হয় তাহার কথামত চাই কি এই শর্তে বিবাহও দেওয়া যায় ভাল একটি পাত্র দেখিয়া।

ভাল একটি পাত্র ?

ভাবিতে ভাবিতেই ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া আসে ভূপেনের। এমন পাত্র কোথায় আছে, যাহার হাতে সন্ধ্যার মত মেয়েকে তুলিয়া দেওয়া যায় ?

নিজের স্বার্থপরতায় এ কথাটা তাহার একবারও মনে আসিল না, সে-ও এমন কিছু অসাধারণ নয়, অথচ সন্ধ্যা তাহাকেই পূজা করে মনে মনে। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া যায় সে। না, সন্ধ্যার টাকা লইতে তাহার সাহসে কুলাইবে না—সাধারণ মানুষের অপেক্ষা বেশী সৎসাহস তাহার নাই, লোকনিন্দা ও লোকলজ্জাকে সে এখনও ভয় করে। মোহিতবাবু তাঁহার অত ধনী বন্ধু থাকা সত্ত্বেও নিঃস্ব ভূপেনকে এতবড় ঐশ্বর্যের ভার দিয়া যে বিশ্বাস ও সম্মান দেখাইয়াছেন—সেটা সে খোয়াইতে রাজী নয়।

অথচ এধারে তাহার শিক্ষকের জীবনও ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে বৈকি।

পদন ও সালেক দুজনেই ভালভাবে পাস করিয়াছে (ওখানকার স্কুলের ইতিহাসে এই প্রথম), স্কলারশিপও পাইয়াছে দুজনেই। পদন নাকি বর্ধমান রাজ কলেজে পড়িতে গিয়াছে, সালেক কলিকাতাতেই আসিবে এমন কথা ছিল। এখানে আসিল দেখা করিত নিশ্চয়ই, তাহার বর্তমান স্কুলের কথা ওখানে অনেকেই জানে—কল্যাণীদের বাড়ি আসিয়া সে নিজেও জানিয়াছে। পাস করিবার পর সেলাম জানাইয়া একটা চিঠিও দিয়াছিল। সুতরাং মনে হয়—হয়ত পড়াশুনা আর করিতে পারিল না বেচারী।

তবু ঐ ছেলে দুইটি তাহার জীবনের সান্ত্বনা। তেমন একটা ছেলেও ত এখানে পাইল না। ভাল ছেলে আছে দু-একজন। তাহাদের যতটা পারে সে যাচিয়া সাহায্য করে, কিন্তু শিক্ষার সম্যক মূল্য বুঝিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করিবে এমন ছেলে কই? অবশ্য এখানে সেরকম ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগও নাই। গ্রামের অবসর শহরে দুর্লভ। এক ভরসা ছিল প্রশান্ত, জ্ঞান-লাভের ইচ্ছাটা সে ইদানীং তাহার মধ্যে জাগাইতেও পারিয়াছে, কিন্তু সে অত্যন্ত আরামপ্রিয়—যথেষ্ট বড় হইবার মত নিষ্ঠা বা অধ্যবসায় তাহার নাই, যদিচ সে সুযোগ আছে। সে ধনীর সন্তান, পদন ও সালেকের পক্ষে যেটা অসম্ভব হইল, তাহার পক্ষে তা না-ও হইতে পারে।

আর একটি ছাত্র তাহার জুটিয়াছে—সম্প্রতি—সে-ও ভাল ছেলে, আর্থিক অবস্থা তাহারও ভাল। লেখাপড়াতে তাহার একটা সহজাত অনুরাগ আছে। বাহিরের বই পড়ে সে প্রচুর কিন্তু সমস্ত ঝোঁকটা তাহার রাজনীতিতে, বিশেষ করিয়া কম্যুনিজ্‌মের দিকে। সে সম্বন্ধ ভূপেনের কিছু বক্তব্য থাকিলে মন দিয়া শোনে, অন্য প্রসঙ্গ উঠিলে অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। কম্যুনিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে ভূপেনের শ্রদ্ধা আছে কিন্তু ঠিক একই ছাঁচ যে এদেশের মাটিতেও সার্থক হইয়া উঠিবে তাহা সে বিশ্বাস করে না। তাহার বিশ্বাস এখনও ও মতবাদ সম্বন্ধে ভাবিবার বা বিচার করিবার অনেক কিছু আছে। ইহারা অন্ধভাবে রাশিয়ার অনুসৃত সমস্তটাই এখানে প্রয়োগ ও অনুসরণ করিতে চায়, তাহা এদেশের মাটিতে শেষ পর্যন্ত কল্যাণকর হইবে কিনা সন্দেহ। এমন কি রাশিয়াতেও কতটা থাকে ও কতটা

যায়, শেষ অবধি ব্যাপারটা কী রূপ নেয় সে বিষয়েও একটা সংশয় আছে তাহার মনে। সব চেয়ে ভয় করে সে ইহাদের পরমতসহিষ্ণুতার অভাবকে—এ বিষয়ে ফ্যাসিস্টদের সহিত ইহাদের অল্পই পার্থক্য। এ কী ব্যক্তি-স্বাধীনতা তাহা সে বোঝে না—যদি সাহিত্য পর্যন্ত রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে লিখিত হয়। এসব কথা আলোচনা করিয়া দেখিবার লোকও নাই—কারণ এখানে যাহারা এই মতাবলম্বী আছেন তাঁহাদের এটা এখনও নূতন নেশা—এখনও জিনিসটা নিজেদের নির্মল বিচার-বুদ্ধিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

অর্থাৎ এখন শিক্ষকতা তাহার কাছেও হইয়া পড়িয়াছে আর পাঁচজনের মতই জীবিকা মাত্র। অনন্যোপায় হইয়া এদেশে যে জীবিকা লোক গ্রহণ করে। একটা মাস্টারী ও দুইটা টিউশ্যানি—শুধু অর্থ-পুস্তক কিংবা পাঠ্যপুস্তক লেখাটা বাকী আছে। দুই একটা কলেজেও সে ইতিমধ্যে প্রোফেসরীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছে কিন্তু সফল হয় নাই। সে লেখপেড়া বেশী জানে কিনা সেটা ঘনিষ্ঠতা না হইলে কাহাকেও জানানো সম্ভব নয়—বাজার দর হিসাবে সাধারণ ফার্স্ট ক্লাস এম. এ.। কীই বা তাহার মূল্য। তার পরিচিত এবং সহকর্মীদের মধ্যে এম. এ. পাস অনেকে আছেন। এক ভদ্রলোক ইকনমিকস্-এ এম. এ. পাস, তিনি অশোক ও আকবরের বাবার নাম বলিতে পারেন নাই একদিন। আর একটি ভদ্রলোক ইতিহাসে এম. এ. তিনি একমাত্র ইংলণ্ড ছাড়া কোন দেশেরই রাজধানীর নামটা ঠিক অবগত নন! ফ্রান্সেরটা অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, আমেরিকারটা ভুল বলিলেন—আর সে ভুলটা অনেকেরই আছে, 'নিউইয়র্ক''। এছাড়া বাংলার এম. এ. একজন তাহাদের ইস্কুলে আছেন যিনি এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়েন নাই। এই নমুনাই ত সর্বত্র ছড়ানো। দুই একটি কলেজ হইতে আহ্বান আসিয়াছিল—মফঃস্বলের কলেজ—কিন্তু বেতন এত কম যে বর্তমানে সে বেতনে তাহার সংসার চালানো সম্ভব নয়। এতদিন তাহার ধারণা ছিল যে অন্তত কলিকাতার কলেজে অধ্যাপকের আয় অনেক শিক্ষকদের চেয়ে ভাল কিন্তু সেদিকেও সে হতাশ হইল—দেখিল এমন কলেজ কলিকাতায় এখনও আছে—বেশ নামকরা কলেজ—যেখানে পুরাতন প্রফেসারও আশি টাকা বেতন পান।

না—কলেজের প্রতি এমন মোহ তাহার নাই যে না খাইয়া পড়াইতে যাইবে। বিশেষত মফঃস্বলের কলেজ—সেখানে টিউশ্যানিও জুটিবে না। ইস্কুলের ছেলেদের বিদ্যানুরাগের যা নমুনা, কলেজে ইহার চেয়ে বেশী কিছু সে আশা করে না। সেদিক দিয়াও কোন লাভ আর নাই, বিশেষত নিজের কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা ত আছেই।

হঠাৎ পূজার সময় একটা বিপুল ঝড় বাংলাদেশ বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আগস্ট আন্দোলন উপলক্ষে একেই পুলিসের অত্যাচারে জেলাটি লন্ডভন্ড হইয়া গিয়াছিল তাহার উপর প্রকৃতির এই অত্যাচার। সমুদ্রের লোনা জল ঢুকিয়া ঘর-বাড়ি ত ভাসাইয়া দিলই—ক্ষেতখামার কতক চিরকালের মত নষ্ট করিয়া দিয়া গেল।

কলিকাতায় সাহায্য দানের কিছু কিছু উদ্যোগ-আয়োজন চলিল। কলেজের ছেলেরাও শোভাযাত্রা, ভিক্ষা-সংগ্রহ প্রভৃতি শুরু করিয়া দিল। এ সমস্ত মনোভাবই প্রশংসনীয় কিন্তু ভূপেনের মন-খুঁতখুঁতানি কিছুতেই যায় না। মনে হয় এ সবই ইহাদের হৃদয়-বিলাস, ফ্যাশন মাত্র। বুভুক্ষু লোকের দুঃখ-দুর্দশায় হৃদয়-বিগলিতকারী বক্তৃতা দিয়াই ইহারা নিশ্চিন্ত মনে সিনেমায় চলিয়া যায়, রেস্তোরাঁতে ঢুকিয়া ধূমায়িত পেয়ালা ও সিগারেট হাতে করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেয়ে, মুখে স্নো ও পাউডারের এতটুকু ত্রুটি ঘটে না কোথাও। বিশেষত এই ত আগষ্ট আন্দোলন হইয়া গেল, সর্বজনপূজ্য নেতারা কারাগারে পচিতেছেন। ভারতের ন্যূনতম দাবীও মেটে নাই—সে কথা এই সব ছাত্রদের, যাহারা রাজনীতি সচেতন বলিয়া গর্ব করে, তাহাদের দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই একটুও। দিনকতক ট্রাম পুড়াইয়া ও ঢিল ছুঁড়িয়া শহরের ছেলেরা সব ব্যাপারটা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। এ যুদ্ধ আমরা চাই নাই—এ যুদ্ধ আমাদের নয়। তবু যদি ইহাতে অংশগ্রহণ করিতে হয় ত স্বাধীনভাবেই করিব—এই ছিল নেতাদের দাবী। মহাত্মাজী বার বার বলিয়াছিলেন, কেহ যেন এ যুদ্ধে সাহায্য করিতে না যায়। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে দাসজাতির করণীয় কিছুই নাই। অন্তত কয়েকটা দিনও যদি সমরোপকরণ প্রস্তুত বন্ধ থাকিত, যদি সামান্য মাহিনার লোভে ব্রণগন্ধলোভী মক্ষিকার মত নির্লজ্জ দেশবাসী ঐ সব কারখানায় ঝাঁপাইয়া না পড়িত, তাহা হইলে ইংরেজ সরকার একটা রফা করিতে, এমন কি ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু কিছুই হইল না—যে দুই একজনের চক্ষুলজ্জা বোধ হইতে পারিত তাহাদের বিবেককে জনযুদ্ধের ধুয়া তুলিয়া চুনকাম করিয়া দেওয়া হইল। দেশে যে দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা দেখে আর ভূপেন শিহরিয়া ওঠে—সমস্ত জাতিটা দুর্নীতি ও অনাচারের যে গভীর পঙ্কে নামিয়া যাইবে, সে দুর্দশা হইতে কোনদিন কি আর ওঠা সম্ভব হইবে, কে জানে।

ইতিমধ্যে একদিন সন্ধ্যা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। পূর্ণেন্দুবাবুর ছোট ছেলে ও অপর কয়েকটি ছাত্র একটি ছোট রিলিফ ইউনিট গঠন করিয়াছে, সন্ধ্যা তাহাদের সঙ্গে মেদিনীপুরে সেবা-কার্যে যাইতে চায়—ভূপেনের কি মত?

এই ছেলেটিকে ভূপেনের ভাল লাগে না—দিনকতক ধরিয়া সে এ বাড়িতে আনাগোনাও খুব বাড়াইয়া দিয়াছে। ভূপেন আপত্তি করিতে পারে না—প্রশ্ন ওঠে, তাহার কী অধিকার আছে আপত্তি করার। বিশেষত কিছুই যখন ছেলেটির বিরুদ্ধে স্পষ্ট করিয়া বলার নাই। তাছাড়া পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে তাহার নিজের ঋণও কম নয়।

ভূপেন চুপ করিয়া সব শুনিল। কহিল, আমার মতামতের ওপর তোমার আর জোর দেবার আবশ্যক নেই—আইনসঙ্গতভাবে। তবু যদি জানতে চাও ত বলছি। প্রথম কথা—ঠিক এভাবে আমাদের মেয়েরা যে ভাল কাজ করতে পারে সে বিশ্বাস আমার নেই। কারণ ওর শিক্ষা-দীক্ষা আলাদা। তাছাড়া যেতে হ'লে কোন মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাওয়াই তোমার উচিত। কারণ

ঠিক সেভাবে ত তুমি মানুষ হও নি—ইস্কুল-কলেজেও যাও নি—ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্ভীকতা তোমার চরিত্রে পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি। এই পর্যন্ত গেল তোমার কথা, তারপর একটা স্বতন্ত্র রিলিফ ইউনিট নিয়ে যাওয়ার কোন সার্থকতা আছে কি? কারণ পুলিস সমস্ত মেদিনীপুর এখনও বেড়া দিয়ে রেখেছে, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ—এঁদের মত নামকরা সেবা-প্রতিষ্ঠানই সেখানে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারছেন না, চাল কাপড় নিয়ে যথাস্থানে পেঁছতে পারছেন না, তোমাদের মত অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ত সে অনুমতি পাবেই না। কারণ এই সব ছেলেদের ওপরই পুলিসের সন্দেহ বেশী।

সন্ধ্যাও স্থির হইয়া সব শুনিল। তারপর কহিল, আপনি ও খোঁচাটা না দিলেও পারতেন মাস্টার মশাই, আমি ত আপনার মত না নিয়ে এখনও কিছু করি নি।

ভূপেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সত্যই প্রথম কথাটার কোন সার্থকতা ছিল না। মনের যে তিক্ততা হইতে কথাটার উদ্ভব, যেটা সহসা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সেটার চেহারা তার নিজের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিল—সেজন্য লজ্জাটা আরও বেশী। পূর্ণেন্দুবাবুর এই ছোট ছেলেটি মোটের উপর মন্দ নয়, একবার ইংরাজীতে এম. এ. দিয়া সেকেন্ড ক্লাস পাইয়াছিল—বছর দুই বসিয়া থাকিবার পর আবার ইউনিভার্সিটিতে ঢুকিয়াছে, এবার বাংলায় এম. এ. দিবে। অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস তাহার চাই-ই। ছেলেটি বকে খুব বেশী, পান খায় আরও বেশী। সিনেমা বোধ হয় প্রতিদিনই দেখে। এক কথায় বড়লোকের ছেলের ছোটখাটো বদভ্যাস সব-গুলিই তাহার আছে। তবু—সন্ধ্যা যদি তাহার সাহচর্য পছন্দই করে ত কি বলিবার আছে? বিশেষত এমনি ছেলেটিকে সচ্চরিত্র বলিয়াই সে জানে—তা ছাড়া পূর্ণেন্দুবাবুর আশ্রয় সন্ধ্যার পক্ষে ভালই। এই বন্ধুত্ব যদি একদিন অন্য কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেই পরিণত হয় ত—আপত্তি করিবার কিছুই নাই, বরং তাহার নিশ্চিন্ত হইবারই কথা। অথচ আজ সে আবিষ্কার করিল যে এই ছেলেটি এখানে আসা-যাওয়াতে সে মনে মনে একটু বিরক্তই হইয়াছিল। কোথায় যেন সে একটু বিদ্বেষও পোষণ করে ছেলেটি সম্বন্ধে।

এই সমস্ত ঈর্ষা-বিদ্বেষের ব্যাপারটা মনের মধ্যে অবচেতন অবস্থাতেই এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, সে বুঝিতেও পারে নাই। আজ এই মুহূর্তে কার্যকারণটা বুঝিয়া নিজেই বিস্মিত হইল। মানুষের আদর্শবাদ যত বড়ই হউক না কেন, লেখাপড়ার মধ্যে নিজেকে সে যতই ডুবাইয়া রাখুক না কেন—যেখানে সাধারণ হৃদয়বৃত্তির কথা আসে সেখানে সাধারণ মানুষের স্তর হইতে উর্ধ্বে উঠিতে বহু বিলম্ব হয়। এখানে তাহার যে একাধিপত্য, যে প্রতিষ্ঠা ছিল তাহারই বিন্দুমাত্র বিচ্যুতির সম্ভাবনায় সে সহসা এতটা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা বুঝিয়া লজ্জা তাহার আরও বাড়িয়া গেল। একটু বেশী অপ্রতিভভাবেই বলিয়া ফেলিল, আমাকে মাপ করো সন্ধ্যা, কথাটা বলা ঠিক হয় নি আমার।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী সন্ধ্যা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, এখন সহসা অকারণে রাঙা হইয়া উঠিল। বোধ হয় ভূপেনের এই লজ্জার ইতিহাসটা তাহার

কাছেও অজানা রহিল না। সে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িল—একটা কথা আপনাকে অনেকদিন থেকেই বলব মনে করছি মাস্টার মশাই, আপনি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শুনুন।

এমন ভূমিকা করিয়া কথা সে কদাচিৎ বলে, সুতরাং ভূপেন বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, যেন একটু শঙ্কিতও হইল মনে মনে।

সন্ধ্যা কহিল, আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে অনেক ভেবে দেখেছি—একটা কিছু কাজ ছাড়া আমি এভাবে থাকতে পারব না। বিয়ে করার ইচ্ছা এখন আমার নেই—কখনও হবে কিনা তাও জানি না। সুতরাং কাজ চাই—ভাল আর বড় কাজ। অবশ্য এ সম্বন্ধে আমি যা-ই ভাবি না কেন, সে আপনারই ভাবা হবে বলতে গেলে, কারণ আমার শিক্ষা-দীক্ষা যা কিছু আপনার কাছ থেকেই ত পাওয়া। যে পথ বেছে নেব আমি, সে আপনারই পথ। কাজেই বড় কাজের কথা ভাবতে গেলে দেশের অশিক্ষা দূর করার কথাটাই আগে মনে আসে। তাই ভাবছিলাম যে কোথাও যদি একটা এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেত—যেখানে মনের মত ক'রে কতকগুলি ছেলেমেয়েকে শেখান সম্ভব, যেখানে আমরা কোন বাঁধা সিলেবাস মানব না, যাতে সত্যকার শিক্ষা হয়, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে সেই চেষ্টাই যেখানে থাকবে মূল উদ্দেশ্য—তাহ'লে কেমন হয়? আমরা মাইনে নেব না, অন্য কোন খরচাও না—তাতে আমরা মনের মত ছেলেমেয়ে বেছে নিতে পারব। কি বলেন?

ভূপেনের দৃষ্টিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, এই স্বপ্নই ত সে কতদিন দেখিয়াছে, বরং বলা যায়, ভাল করিয়া দেখিতে সাহস করে নাই। তবু সে বলিল, ওখানে তুমি ত সিলেবাসের বাইরে মনের মত ক'রে পড়াবে, তারপর? ভবিষ্যতে ওরা করবে কি?

সন্ধ্যা উত্তর দিল, আমরা ওদের চোদ্দ-পনের বছর বয়স অবধি আটকে রাখব—ধরুন, ক্লাস এইটের স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত। তারপর ওরা অনায়াসে কোন হাই-স্কুলে ভর্তি হয়ে ম্যাট্রিক পাস করতে পারবে। বনেদ যদি ওদের পাকা হয়ে যায় ত ভাবি না—যেখানেই যাক মানুষের মত মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারবে—চাই কি যথার্থ বিদ্বান বলেও একদিন পরিচয় দিতে পারবে। আর যাদের মধ্যে সে প্রতিভা দেখব তাদের আমরা চেষ্টা করব বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে রেখে যতদূর সম্ভব মানুষ ক'রে তোলবার—যথার্থ পণ্ডিত করবার। কি বলুন?

জবাব দিতে গিয়া ভূপেনের গলা আবেগে কাঁপিয়া উঠিল, কহিল, তা যদি পারো সন্ধ্যা, তাহলে বুঝব এ দেশের, এ জাতির এখনও কিছু আশা আছে। অর্থের এর চেয়ে সদ্ব্যয়ের কথা আমি ভাবতেই পারি না।

—আমারও তাই বিশ্বাস। দাদুর টাকার এর চেয়ে ভাল সদ্গতি আর কি হ'তে পারে? তাই মনে হয় ঈশ্বর এমন ভাবে আমাকে এতগুলো টাকার মালিক ক'রে দিয়েছেন এইজন্যেই। আসুন মাস্টার মশাই, আমরা এখন থেকেই এটা শুরু ক'রে দিই। আমি একা কতটুকু পারব বলুন, আপনাকে এতে লাগতে হবে ... কাছে আমাদের সাতাত্তর বিঘে জমি আছে, ... জায়গা, সঙ্গে সঙ্গে

এগ্রিকালচারও কিছু শেখানো চলবে—সেইখানেই আমরা এই নতুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করব। সব বিষয়ের ভাল ভাল শিক্ষক বেশী মাইনে দিয়ে খুঁজে নিয়ে আসতে হবে। আমরা সেখানে স্বাবলম্বী, পরিশ্রমী, অনুসন্ধিৎসু, পরিচ্ছন্ন, মর্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন, জ্ঞানানুরাগী ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তুলব। এই হবে আমাদের জীবনের সার্থকতা।

অবেগে, আনন্দে, আশায়, কল্পনায় সন্ধ্যার কণ্ঠস্বরও কাঁপিতেছে, সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আর তাহার সেই চোখ দুটি, আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখের দৃষ্টিতে মিনতি ও স্বপ্ন ঝরিয়া পড়িতেছে। সে দৃষ্টিতে সুদূর কল্পনার অতীত এক বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

লোভ হয় বৈকি।

জীবনের পরিপূর্ণতা, সার্থকতা, এমন ভাবে এত দুঃখের পর যদি যাচিয়া সামনে উপস্থিত হয়, যদি অমৃতের পাত্র এমন করিয়া ওষ্ঠের কাছে আগাইয়া আসে ত কার না বুক প্রলোভনে দুলিয়া ওঠে, কার না শিরায় রক্ত নাচিতে থাকে। তাহার আদর্শ শুধু সফল হইবে না, স্বপ্নও—সন্ধ্যাকে সহকর্মিণীরূপে কাছে পাইবে। তাহার আত্মার আনন্দ, মানসলোকের সৃষ্টি, স্বপ্ন-কল্পনা।

যেন কোন্ দূর হইতে সন্ধ্যা বলিতেছে,—কি বলুন মাস্টার মশাই, তাহ'লে কথা পাকা রইল ত?

একটা উত্তাল উদ্দাম আনন্দের বিপুল ঘূর্ণি যেন কী একটা ব্যবধান রচনা করিয়াছে তাহার চারিপাশে, সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন তার ফলে অসাড়, অবশ হইয়া পড়িয়াছে, বুদ্ধিও তাহার কাজ করিতে পারিতেছে না। এ কি সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর? এ কি তাহারই কথা? সে কি সামনে বসিয়া?

না, না, এ কী করিতেছে সে।

ওরে অবোধ, ওরে মূঢ়—এ পরিণতি, এ সার্থকতা তোর জন্য নয়। এ শুধুই অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতম পরিহাস। ভূপেন জোর করিয়া তাহার আচ্ছন্ন চৈতন্যকে নাড়া দিল। আর সময় নাই, এ স্বপ্ন এখনই ভাঙিতে হইবে। ম্লান হাসিয়া বলিল, এর মধ্যে আর আমাকে টেনো না সন্ধ্যা—আমাকে মাপ করো।

—আপনি আসবেন না? খুব শান্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল সন্ধ্যা, খুব চুপি চুপি। তবু ভূপেনের মনে হইল, প্রশ্নের সঙ্গে যেন একটা আর্তনাদ জড়ানো আছে।

সে জোর করিয়া সোজা হইয়া বসিল। কহিল,—না, আমার আসা সম্ভব নয়। এ যে আমার স্বপ্ন, তা তুমিই ত সব চেয়ে ভাল জানো। যদি এতে আমার সাহায্য করা সম্ভব হ'ত, যদি এতে আমার সারাজীবন সঁপে দিতে পারতুম—তাহ'লে আমার জন্ম সার্থক হ'ত। কিন্তু আমার ভাগ্যে এত সুখ, এত গৌরব নেই। আমার অন্য দায়িত্ব আছে—তাও ত তুমি জানো। আমি গরিব, আমাকে এসব স্বপ্ন দেখতে নেই।

সন্ধ্যাও হয়ত কথাটা বোঝে। তবু আজ তাহার ভাঙিয়া পড়িলে চলিবে না: সে প্রাণপণে গলায় স্বর টানিয়া আনে,—আপনি ওখান থেকেও আপনার মাইনে

নিতে পারতেন, বৌদিকেও নিয়ে গিয়ে রাখতেন না হয়।

—তা হয় না সন্ধ্যা। মানুষ বড় দুর্বল। এত ভরসা আমার নিজের ওপর নেই। তুমি দুঃখ ক'রো না, এ আমারই ললাট-লিপি, তুমি কি করবে? তা নইলে যা আমার কাছে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে হবার কথা, আজ তা নিষ্ঠুর পরিহাস হয়ে উঠবে কেন?

দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল বহুক্ষণ। অপরাহ্ণ চলিয়া গিয়া ক্রমে সন্ধ্যা নামিল, ঘরের ভিতরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, তবু উঠিয়া আলোর সুইচটা নামাইয়া দিবার কথা কাহারও মনে আসিল না। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে সন্ধ্যাই কথা কহিল। সে এতক্ষণ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইতে দেয় নাই, প্রাণপণ শক্তিতে বুকেই চাপিয়া রাখিয়াছিল। এতটুকু দুর্বলতা সে প্রকাশ পাইতে দিবে না—সেটা ভিক্ষা চাওয়ার মতই দেখাইবে। এখনও নির্মমভাবে কণ্ঠস্বর হইতে কান্নার সুর দূর করিয়া দিল—হয়ত একটু বিকৃত শোনাইল তবু তাহাতে জড়তা কোথাও নাই—তাহ'লে আমায় অনুমতি দিন, আমি একাই এ কাজ আরম্ভ করি।

—পারবে?

—চেষ্টা করব। ছেলেদের সেক্‌শান এখন থাক। মেয়েদের মধ্যেই ত অশিক্ষা ও কুশিক্ষা বেশী ক'রে বাসা বেঁধেছে, তাদের নিয়েই শুরু করি।

—কিন্তু এর ভেতরে টেক্‌নিক্যাল খুঁটিনাটি অনেক আছে। নানা রকমের রূঢ় বাস্তবের সামনে দাঁড়াতে হবে—নানা রকমের জবাবদিহি চাইবে সবাই। তাছাড়া এতগুলি মেয়েকে চরানো—সেও কঠিন ব্যাপার বৈকি। তুমি নিজে কখনও ইস্কুলে পড় নি—সে অভিজ্ঞতাও ত নেই। তাই ভাবছি—

—এটুকু সাহায্যও কি আপনার কাছে থেকে পাবো না? নির্দেশ দেওয়া, নিয়মকানুনগুলো তৈরী ক'রে দেওয়া—এটা ত আপনি দূর থেকেও করতে পারেন?

সন্ধ্যার কণ্ঠস্বরে এবার আর হতাশা বুঝি চাপা থাকে না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভূপেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, নিজেকে যেন একটু অপরাধীও মনে হইতেছে,—তবে তুমি পূর্ণেন্দুবাবুকে কথাটা ব'লো—উনি অনেক বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন—এটা ও'র ভাল লাগে বলেই। কাজেই ও'র কাছ থেকেও অনেকটা সাহায্য পাবে।

সে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল, দরজার দিকে পা বাড়াইয়া কহিল—ও'র সঙ্গে ভাল করে পরামর্শ ক'রো—এ সম্বন্ধে যখন যা দরকার হবে ব'লে পাঠালে আমিও যতটা পারি জানাব নিশ্চয়ই! তোমার মনটা তৈরী হোক—আর একদিন এসে ভাল ক'রে প্ল্যান করা যাবে।

তাহার পর সে আর সন্ধ্যার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল। আরও কয়েকবার এখান হইতে এমনি করিয়াই পলায়ন করিতে হইয়াছে। কী বলিবে, কী করিবে—নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর যেন এই মুহূর্তে আর তাহার আস্থা নাই। তাহার নিজের দুঃখের চেয়েও সন্ধ্যা যে

আঘাত পাইয়াছে এই কথাটাই বড়, তাহার এই আশা-ভঙ্গের বেদনা যে কতখানি তা ভূপেন ছাড়া আর কে জানে? অথচ উপায় নাই—যাহাকে এতটুকু আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, তাহাকে এত বড় দুঃখ হইতে বাঁচাইবার কোন উপায় আজও কোথাও নাই।

লোভ বড় দুর্জয়, মন বড় দুর্বল।

সে কল্যাণীকে মনে করিবার চেষ্টা করে। বেচারী কল্যাণী! সে ত নিঃশব্দেই থাকে, তাহার কোন অপরাধ নাই, অথচ সকলের কাছেই সে থাকে অত্যন্ত সংকোচে—অপরাধিনীর মতই মাথা হেঁট করিয়া।

ভূপেনও কি তাহাকে মধ্যে মধ্যে অপরাধিনী মনে করে না?

হয়ত করে। হয়ত তাকে জীবনের বিড়ম্বনা, একটা বোঝা বলিয়া মনে করে। মাঝে মাঝে মনে হয় বৈকি যে, যদি এমন ভাবে বিজয়বাবুদের সহিত নিজেকে না জড়াইত, কিংবা সন্ধ্যা যদি আগে হইতেই একটা অকারণ ঈর্ষায় অমন অভিমান করিয়া বসিয়া না থাকিত—তাহাদের অসংখ্য দানের মধ্যে ইহাদের জন্যও কিছু একটা নির্দিষ্ট করিয়া দিত, এমন কি সেও যদি বৃথা আত্মমর্যাদার অহংকারে স্ফীত না হইয়া সোজাসুজি তাহার কাছে চাহিয়াই লইত, তাহা হইলে আজ এমন করিয়া সমস্ত দিক দিয়া ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যকে বরণ করিতে হইত না। আজও তাহার সামনে বিপুল সম্ভাবনা, চরম সার্থকতা পড়িয়া থাকিত। এই ত, এইমাত্র তাহাকে নিজ হাতে যে সে-সমস্ত আশাকে চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল, তাহার জন্য কি মনের অবচেতনে কল্যাণীর বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ দেখা দেয় নাই।

না, না, ছিঃ! বেচারী কল্যাণী, বিনাদোষে সে-ই সকলের বিদ্বেষের, উপেক্ষার ও লাঞ্ছনার পাত্রী হয়। অথচ এ ঘটনায় সকলেই সমান দোষী ছিল।

সন্ধ্যাকে সে চেনে নাই। তাহার সূক্ষ্ম ও চাপা অভিমানের সঙ্গে পরিচয় ছিল না বলিয়াই সে তাহার তখনকার নীরবতাকে ভুল বুঝিয়াছিল। দোষী সে-ই—আর তার শাস্তি তাহাকেই চিরকাল বহন করিতে হইবে। সন্ধ্যা বরাবরই শান্ত, বরাবরই মনের ভাব সে সংযত করিয়া রাখে—অভিমান বা বেদনা প্রকাশ করিতে দেয় না। এই ত এখনই, কত বড় আশা তাহার ভাঙিয়া গেল, তবু সে এতটুক বিচলিত হইল না। ভূপেনই বরং হৃদয়াবেগ সম্বরণের চেষ্টায় কী সব খাপছাড়া কথা বলিয়া আসিল।

এমনি এলোমেলো পরস্পরবিরোধী নানা চিন্তার ঘূর্ণাবর্তে বহু রাত্রি পর্যন্ত সেদিন ভূপেন পথে পথে ঘুরিল। অবশেষে স্থির করিল কল্যাণীর কাছে একবার যাওয়া দরকার, বহুদিন যায় নাই। তাহার স্নিগ্ধ সেবা, নিরভিমান প্রেমই বর্তমান মনোভাবের একমাত্র ঔষধ।

পরের দিনই ছুটি লইয়া সে কল্যাণীর কাছে চলিয়া গেল।

॥ ২৯ ॥

দিন পাঁচ-ছয় পরে সন্ধ্যা নিজেই তাহাদের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এলাহাবাদে পূর্ণেন্দুবাবুর কে একজন আত্মীয় থাকেন, ওখানকার এক স্কুলের হেডমাস্টার, তিনি নাকি একটি এম-ই স্কুলের হেডমাস্টাররূপে প্রথম এলাহাবাদে গিয়েছিলেন, পরে তাহাকে হাইস্কুলে পরিণত করিয়াছেন। শীঘ্রই সেখানে কলেজ হইবে। সে ভদ্রলোকও শিক্ষা-পাগল, তিনি অনেক রকম নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিসে স্কুলের উন্নতি হইবে এবং ছেলেদের কল্যাণ হইবে—এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা তাঁহার নাই। পূর্ণেন্দুবাবু পরামর্শ দিয়াছেন যে তাহারা দুইজনেই অর্থাৎ সন্ধ্যা ও ভূপেন যদি একবার এলাহাবাদ ঘুরিয়া আসে ত তাঁহার নিকট হইতে অনেক মূল্যবান উপদেশ ত পাইবেই—এ সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিবারও প্রেরণা পাইবে। ভূপেন যাইতে পারিবে কি ?

প্রস্তাবটা এতই নির্দোষ অথচ লোভনীয় যে সে না বলিতে পারিল না। কিন্তু পূজার ছুটির পর সবে ইস্কুল খুলিয়াছে—সামনেই পরীক্ষা। এ অবস্থায় ইস্কুল কামাই করা—কিংবা তার চেয়ে যেটা বড় প্রশ্ন—টিউশ্যানি কামাই করা সম্ভব কিনা ? এই কয়দিন কাটাইয়া পরীক্ষার পর গেলে কেমন হয় ?

সন্ধ্যা বলিল, কিন্তু ইস্কুল চলতে চলতে না গেলে ঠিক কি ভাবে কাজ হয় সেটা ত দেখা যাবে না—

—ও, তা যাওয়া যাবে অনায়াসে। আমাদের ষোলই-সতেরোই প্রমোশন হয়, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব। ওদের ত আর এটা বছরের শেষ নয়, ওদের সিজ্‌ন্‌ আরম্ভ হয় জুলাইতে, গরমের ছুটির আগে বাৎসরিক পরীক্ষা হয়। তুমি পূর্ণেন্দুবাবুকে বলে দাও সেই-মত চিঠি লিখে দিতে, বুঝলে।

এত সহজে ভূপেন রাজী হইবে সন্ধ্যা তাহা ভাবে নাই। সে খুশী হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ভূপেন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। এমন ভাবে সন্ধ্যার সহিত বিদেশ যাত্রার আরও যে নানারূপ কদর্থ হইতে পারে সে-কথাটা সে লজ্জায় সন্ধ্যাকে বলিতে পারিল না। অথচ তাহার নিজের মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। কল্যাণী কি মনে করিবে সেটা বড় কথা নয়—সব চেয়ে বড় বিপদ অন্য লোককে লইয়া। সে লক্ষ্য করিয়াছে যে সন্ধ্যার সহিত ঘনিষ্ঠতায় তাহার বাবা ও মায়ের উৎসাহ এখনও কমে নাই—বরং এই শ্রেণীর আসা-যাওয়াতে তাঁহারা অহেতুক একপ্রকার আশান্বিত হইয়া ওঠেন। এই আশা ও উৎসাহের পিছনে যে একটা কদর্য ইঙ্গিত আছে সেইটাতেই সে বিরত বোধ করে সবচেয়ে বেশী, অথচ এ ধরনের কথা লইয়া আলোচনা করিতেও তার ভদ্রতায় বাধে।

তবু শেষ পর্যন্ত যাইতেই হয়।

তবে এলাহাবাদে পোঁছিয়া দেখিল যে সে ঠকে নাই। এখনও যে এ ধরনের শিক্ষাব্রতী আমাদের দেশে সত্যই কোথাও আছে তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। চৌধুরী মশাইয়ের মাস্টারীটা পেশা নয়—নেশা। বৃত্তির খাতিরে লন নাই—মাস্টারী না করিয়া থাকিতে পারেন না বলিয়াই লইয়াছেন। দিনরাতই তাঁহার ইস্কুলের কথা—যখন যে প্রসঙ্গই পাড়া হউক না কেন, তিনি ঠিক আলোচনার ধারাটিকে নিজের বিশেষ প্রসঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইবেন। তেমনি স্কুলের বাহিরের আর কোন কথা তিনি জানেন না—নিজের জামা-কাপড় এমন

কি ক্ষুধাতৃষ্ণার সংবাদও রাখেন স্ত্রী। সে ভদ্রমহিলা এক এক সময় বিরক্ত হইয়া ওঠেন—জানো ভাই, ঐ ইস্কুলটাই হ'ল আমার সতীন। মহাপাপ না থাকলে কেউ ইস্কুল-মাস্টারের বউ হয় না। ছি, ছি, মানুষ না যন্তর, এক এক সময়ে তাই ভাবি।

আবার একটা সস্নেহ গর্ববোধও আছে স্বামী সম্বন্ধে—ঐ ত মানুষ, নিজের নাকে চশমা থাকলে খুঁজে পান না, একপাটি ব্রাউন রঙের জুতোর সঙ্গে আর এক পাটি কালো পরে চলে যান, ফরসা পোশাক বার ক'রে রাখলেও ময়লা পোশাক পরে বেরিয়ে পড়েন। কিংবা ময়লা পায়জামার সঙ্গে অনায়াসে ধোপদস্ত কোট পরে বসে থাকেন—কিন্তু ইস্কুলের অত খুঁটিনাটি নাড়িনক্ষত্রের হিসেব কী ক'রে মনে রাখেন তাই ভাবি! চারদিকে চোখ—একা মানুষ অতগুলো সব দেখেন ত! তাই ভাবি এক এক সময়, দিনরাত ঐসব চিন্তা মাথায় ঘোরে বলেই ঘর-সংসারের কথা মনে রাখতে পারেন না। ওঁর ওপর রাগ করা বৃথা।

চৌধুরী মশাই ঘরে অতি নিরীহ, স্ত্রীর শাসন ও ধমক বেমালুম হজম করেন ভালমানুষের মত, অথচ স্কুলে আর এক চেহারা। কাহারও বিন্দুমাত্র ত্রুটি সহ্য করেন না। প্রত্যেক শিক্ষকের উপর নজর রাখেন, প্রত্যেক ক্লাসে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হন কিংবা আড়াল হইতে শোনেন। সব ক্লাসেরই সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতা হঠাৎ চাহিয়া লইয়া দু-চারখানা করিয়া দেখেন। তাহাতে কেমন পড়াশুনা হইয়াছে এবং শিক্ষক কেমন পরীক্ষা করিয়াছেন, দুইটাই দেখা হয়। চেষ্টা করিয়া নিজে সব বিষয়ই আয়ত্ত করিয়াছেন, কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকিলে নিজে তাঁহার ক্লাস লন। ফলে ছাত্ররা যেমন ভয় করে তেমনি ভালবাসে তাঁহাকে।

প্রতি সপ্তাহে তিনি শিক্ষকদের এক সভা আহ্বান করিয়া পড়াশুনার পদ্ধতি, তাহার দোষগুণ বিচার করেন, শিক্ষকতা সম্বন্ধে নূতন কোন তথ্য, নূতন কোন আলোচনা কোন বইতে বা কাগজে বাহির হইলে দাগ দিয়া রাখিয়া দেন, তাহাও ঐ সভাতে পড়িয়া শোনান। কোন ছাত্র সম্বন্ধে কোন বক্তব্য থাকিলে তাহার অভিভাবককে ডাকিয়া পাঠাইয়া খোলাখুলি আলোচনা করেন। যাহারা একটু মাথা-মোটা তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, অভিভাবকদেরও সেইরূপ নির্দেশ দিয়া দেন। শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া আছে, আমার ইস্কুলের ছাত্ররা অধিকাংশ গরিব, বাড়িতে তাদের প্রাইভেট টিউটর আছে এটা ধরে নেবেন না—বরং কারুরই নেই এইটে মনে করবেন। সেইভাবে তাদের পড়াটা যাতে ক্লাসেই তৈরী হয়ে যায় এমন ভাবে পড়াবেন। নইলে পড়া দেওয়া আর তার পরের দিন পড়াটা হ'ল কিনা দেখার জন্যে ইস্কুলে আসার দরকার কি! সেটাও ত প্রাইভেট টিউটার করতে পারেন!

চৌধুরী মশাই তাঁহার স্কুলে নিচের ক্লাসে কোন ইতিহাস ভূগোল কিংবা ব্যাকরণ অনুবাদের বই রাখিতে দেন নাই, সমস্তই শিক্ষকদের মুখে মুখে পড়াইতে হয়। সাহিত্যের বইয়ের সঙ্গেই ব্যাকরণ বা অনুবাদ শেখানো চলে। মুখস্থ-করা ও দাগ-দেওয়া যাহাতে খানিকটা বন্ধ হয় সেইজন্যই এত আয়োজন। তারপর

উপরের ক্লাসে তালিকাভুক্ত পড়াশুনা ছাড়া গানের ক্লাস, ছবি আঁকার ক্লাস, হাতের কাজ শিখিবার ক্লাস (তাহার মধ্যে কাগজের বাক্স ও টিনের কৌটা তৈয়ারী, কাঠের কাজ, দর্জির কাজ আর চামড়ার কাজ প্রধান) আছে। একখানা মাসিকপত্র আছে সেটা ছেলেরাই চালায়, একটি খাতা পেনসিল প্রভৃতির স্টোর আছে সে ভারও ছেলেদের উপর, তাহার লভ্যাংশ হইতে দরিদ্র ছেলেদের বেতন ও বইখাতা সরবরাহ হয়। তাছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে, খুব ছোট আয়তনের একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক চালাইতে হয় ছেলেদেরই। তাহার আয়-ব্যয় হাস্যকর রকমের কম ছিল প্রথম প্রথম কিন্তু এখন বেশ সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেদের শেয়ার আছে চার আনা হিসাবে। ইস্কুল ছাড়িবার আগে ঐ শেয়ার ব্যাঙ্ককেই জমা দিতে হয়, আবার নূতন ছাত্রদের মধ্যে এই শেয়ার বিক্রী হয়। এছাড়া টাইপ-রাইটিং ও শর্টহ্যাণ্ড শিখিবার একটা ব্যবস্থাও ইস্কুলের সহিত রাখা হইবে কিনা সে বিষয়েও চিন্তা করা হইতেছে।

এসব কিছুই আবশ্যিক নয়—ইচ্ছানুযায়ী, যাহার যেদিকে ঝোঁক, অতিরিক্ত পাঠ্য-হিসাবে এই সব ক্লাসে যোগ দেওয়া যায়। কাহাকেও দুইটির বেশি এই ধরনের অতিরিক্ত ক্লাস করিতে দেওয়া হয় না। তাও মাস্টার মশাই নিজে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করেন যে সে ভার তাহার মস্তিষ্ক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশি বোঝা হইয়া পড়িতেছে কিনা। সেরূপ বুঝিলে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ডিবেটিং ক্লাসের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। দুইজন শিক্ষক ও তিনজন ছাত্রের বিচারে যাহার রচনা (গল্প প্রবন্ধ বা কবিতা) শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাকে বৎসরের শেষে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়। ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু সংবাদপত্র লওয়ার ব্যবস্থা আছে—সেগুলি ছাত্রদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘরে রাখা থাকে। সেখানে বসিয়া পড়িবার ব্যবস্থা আছে। সপ্তাহে এক ঘণ্টা করিয়া উপরের চারটি ক্লাসে চলতি খবর আলোচনা হয় এবং কে কতটা খবর রাখে তাহারও একটা মোটামুটি পরীক্ষা লওয়া হয়। সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস আছে, তাহার নিয়মিত পরীক্ষা লওয়া হয়। শরীরচর্চা, খেলাধুলা ও সাঁতারের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। এইগুলি আবশ্যিক। খানিকটা ব্যায়াম যাহাতে প্রত্যেকেই করে সেদিকে হেডমাস্টার মহাশয় কড়া নজর রাখেন। টিফিন স্কুল হইতে দেওয়া হয়। কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে ছেলেদের একটি সেবাদল আছে তাহার দেখাশুনা করে, গরিব ছাত্র হইলে স্টোর ও ব্যাংক হইতে তাহার চিকিৎসার খরচ চালানো হয়।

কিন্তু শুধু ছাত্রদের দিকেই নয়, শিক্ষকদের দিকেও চৌধুরী মহাশয়ের কড়া নজর আছে। তিনি যেমন তাঁহাদের নিকট হইতে ষোল আনা কাজ চান, তেমনি তাঁহাদেরও প্রাপ্য ষোল আনা মিটাইয়া দেন। সেটা সম্ভব হয় অবশ্য এখানে বাংলাদেশের চেয়ে সরকারী সাহায্যের অঙ্ক অনেক বেশী মোটা বলিয়া। বাংলা-দেশের অনেক বড় ইস্কুলেও বার্ষিক তিন চারশ টাকা মাত্র ভাতা অথচ এখানে এই সাধারণ ইস্কুলেও মাসিক হাজার টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং বেতন এখানে অনেক বেশী। এখানকার শিক্ষকরা চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি ছাড়া টিউশ্যানি লইতে পারেন না কিংবা পাঠ্যপুস্তক লেখা প্রভৃতি বাড়তি কাজ করিতে পারেন না।

তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনবীমা আছে কিংবা তাহা হেডমাস্টারকে জানাইতে হয়। শিক্ষকদের জন্যও একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে—সেখান হইতে বাড়ি করার জন্য, কিংবা কন্যার বিবাহ প্রভৃতিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। এ ছাড়া ইস্কুল হইতেও টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এক কথায় তাঁহাদের প্রত্যেক অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি খবর রাখেন ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন।

ভূপেন এসব দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে। এ তাহাদের কল্পনারও অতীত। শিক্ষকদের জীবনও যে স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মানের সঙ্গে কাটে তাহা চোখে না দেখিলে সে বিশ্বাস করিত না। চৌধুরী মহাশয় সন্ধ্যার প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কতকগুলি ব্যবহারিক সদুপদেশও দিলেন। বলিলেন—ওখানের ব্যাপার যে কত খারাপ তা এদেশ থেকেও কিছু কিছু টের পাই বৈকি মা। এ কলঙ্কের যদি কিছুও মোচন করতে পারো ত বুঝবে যে সত্যিকার একটা বড় কাজ ক'রে গেলে। কিন্তু এ বিষম বোঝা, ইংরেজিতে যাকে বলে হারকুল্যিয়ান টাস্‌ক্‌। তুমি ছেলেমানুষ তায় মেয়েছেলে। কত দিন তোমার এ শখ আর ধৈর্য থাকবে তাও জানি না। হয়ত সংসারের ডাক আসবে, সব ফেলে চলে যেতে হবে। যদি তেমন কোন সঙ্গী পাও জীবনে, যে তোমার এ কাজে তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে তাহ'লে ভাল, নইলে সব যাবে মা। তোমার অল্প বয়স, সে সম্ভাবনা ত এখনও যায় নি।

সন্ধ্যার মুখ একেবারে আরক্ত হইয়া উঠিল। বোধ হইল সে একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাসও চাপিয়া গেল। তারপর শান্ত এবং বিনত কণ্ঠেই কহিল—দেখা যাক না কাকাবাবু, চেষ্টা করতে দোষ কি ?

—কিছু না, কিছু না। তোমার যখন নষ্ট করবার মতও যথেষ্ট টাকা আছে তখন চেষ্টা ক'রে দেখ। চাই কি, খানিকটা এগোলে উত্তর-সাধকও কাউকে পাবে। কাজ করবার লোক এগিয়ে আসতে পারে বলা যায় না। তবে একটা কাজ ক'রো। একটি প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী বেছে নাও। যিনি তোমার নির্দেশে কাজ করবেন, কিন্তু হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় কল্পনাটাকে শেষ পর্যন্ত রূপ দিতে পারবেন। তবে এটাও দেখো যে কলুর বলদের মত বাঁধা রাস্তাতেই না তিনি চলতে চান। তোমার ত সুযোগ অনেক, সিলেবাস মানতে হবে না যখন, কর্তাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না—তখন আর অসুবিধে কি ? যারা কিছু বোঝে না, এ বিষয়ে ভাবে না, তাদের কাছেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়, এই ত আমাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য।

সন্ধ্যা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—কিন্তু আপনার সাহায্যও একটু আধটু পাবো ত ?

—পাবে বৈকি মা, নিশ্চয়ই পাবে। আমি তোমাকে স্ট্যাণ্ডিং রুল্‌স কতকগুলো তৈরি ক'রে দেবো—আর প্ল্যানিং-এর খসড়া, সেগুলো তোমরা বিবেচনা ক'রে দেখতে পারবে। কাঠামো একটা তৈরী থাকলে মনের মত ক'রে প্রতিমা গড়তে কতক্ষণ লাগে ? তাছাড়া যখনই ডাকবে তখনই আমি গিয়ে দেখে আসবো। এ ত আমাদেরই কর্তব্য। জাতের এ লজ্জা কি আমাদের গায়ে লাগে না মনে করো ?

তাহার পর একটু থামিয়া কহিলেন, আমার এক বন্ধু আছেন দিল্লীতে, মোটা মাইনের চাকরি করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন, তাঁর কাছে যা শুনি তা আর লোককে বলবার মত নয়। বাঙ্গালীরা এককালে সকলের আগে ছিল··· অন্তত চাকরির ক্ষেত্রে ত বটেই। আজ সেখানেও তারা পিছিয়ে আসছে ক্রমাগত। কোন একটা ইণ্টারভিউতে তারা দাঁড়াতে পারে না। কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় মাদ্রাজীরা ত এগিয়ে গেছেই, আজ সমস্ত জাতই বাঙ্গালীকে পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। দুনিয়ার খবর রাখে না, লেখাপড়াতেও কাঁচা—খবরের কাগজটা পর্যন্ত অনেকে ভাল ক'রে পড়ে না। অফিসারদের সামনে মাথা চুলকোয়, ভাল ক'রে কথা কইতেও যেন ভুলে গেছে। অফিসের মধ্যে এসো, দেখবে অকর্মণ্যতা ও ফাঁকির পাহাড় জমে উঠেছে এক-একটা টেবিলে। সব জায়গায় তারা পেছিয়ে আসছে অথচ এখনও সেই কবেকার খাওয়া-ঘিয়ের গন্ধটুকু আছে তাদের হাতে, এখনও অহঙ্কারের অভাব নেই।

চৌধুরী মহাশয় দুই দিনের মধ্যেই একটা প্ল্যান ও নিয়ম-কানুনের খসড়া তৈয়ারী করিয়া দিলেন সন্ধ্যাকে। সেটা তাহাকে পড়িয়া বুঝাইয়া দিবার পরে সস্নেহে সন্ধ্যাকে পিঠে হাত রাখিয়া কহিলেন, যতই যা হোক মা, এ হ'ল পুরুষের কাজ। তোমাদের বাধা অনেক। তুমি সুশ্রী অল্পবয়সী মেয়ে—এইটিই হয়ত অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ ব'লে গণ্য হবে। বিনা অপরাধে দুর্নামের ভাগী হওয়াও বিচিত্র নয়। তার চেয়ে যদি তোমারই উপযুক্ত কোন জীবনের সঙ্গী বেছে নিতে পারতে ত ভাল হ'ত। নিদেন এমন কোন পুরুষ কর্মচারী যার এদিকে আন্তরিক অনুরাগ আছে। ভূপেন বাবাজীকে ত রীতিমত শিক্ষিত আর শিক্ষানুরাগী বলে মনে হ'ল—ওঁকেই টেন নাও না কেন মা। কতই বা আর বেতন পাচ্ছেন ও-ইস্কুলে, তার চেয়ে তুমি কিছু বেশী দিয়েও যদি ওঁকে তোমার কাজে লাগাতে পারো, সে-ই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হয়। কি বলো? এ বিষয়ে কি কথা কয়েছ কখনও?

সন্ধ্যা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল, তেমনি ভাবেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, শুধু চৌধুরী মহাশয়ের প্রশ্নের পর অনেকক্ষণ চলিয়া গেলে আস্তে আস্তে বলিল—সে হবার নয় কাকাবাবু, তাতে ওঁর বাধা আছে।

চৌধুরী মহাশয় সাধারণত স্কুল-সংক্রান্ত ব্যাপারের বাহিরের কোন জিনিসই লক্ষ্য করেন না, কিন্তু আজ কি জানি কেন তিনি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন কথাগুলি বলিবার সময় নতমুখী সন্ধ্যার চক্ষু হইতে দুটি ফোঁটা জল গড়াইয়া তাহার হাতের কাগজগুলোর উপর ঝরিয়া পড়িল।

অকস্মাৎ শোনা গেল কলিকাতায় বোমা পড়িয়াছে, পর পর দুই দিন।

ভূপেন ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চৌধুরী মশাই কহিলেন—কদিন থেকেই যাও বাবাজী, এখন যাওয়াও সম্ভব নয়।

ভূপেন উত্তর দিল—কিন্তু সেখানে আমার বাবা-মা-বোনেরা রয়েছে, ভুলে যাচ্ছেন কেন, কী অসহায় অবস্থা তাদের বলুন দেখি। হয়ত আমি গিয়ে কিছুই

করতে পারব না তবু তারা কতকটা ভরসা পাবে এটা ত ঠিক। বরং সন্ধ্যা থাক, গোলমাল থামলে ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।

চৌধুরী মশাই কহিলেন—সেই ভাল। সন্ধ্যা-মা এখন আমার এখানেই থাকুন।

কিন্তু সন্ধ্যা বাঁকিয়া বসিল। সে কলিকাতা যাইবেই—এখানে থাকিয়া দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে পারিবে না। যা হয় তাহার সামনেই হউক।

ভূপেন বুঝাইবার চেষ্টা করিল, এতে ক'রে তুমি আমাকে আরও বিব্রত ক'রে তুলবে সন্ধ্যা, বুঝতে পারছ না! মিছিমিছি এ বিপদের মধ্যে যাবার দরকার কি!

—আপনার বোনেরাও ত রয়েছে—

—তাদের উপায় নেই বলেই আছে। কিন্তু তুমি যখন এখানে এসে পড়েছ, বুঝতে হবে এটা ভগবানেরই নির্দেশ।

সন্ধ্যা কহিল, আপনিও ত এসে পড়েছেন, আপনিও তাহ'লে সেই নির্দেশ মেনে এখানে থেকে যান।

—আমার যে উপায় নেই। কিন্তু তুমি নিরাপদে আছ জানলে আমি কতটা নির্ভয়ে থাকতে পারি বলো দেখি। তুমি সুদ্ধ সেখানে গেলে আমার দুশ্চিন্তার শেষ থাকবে না।

সন্ধ্যা ঈষৎ তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিল, দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা সব আপনার একচেটে আর আপনাকে নির্ভাবনায় রাখবার জন্যে সবাইকে আপনার খুশিমত চলতে হবে, এটাই বা মনে করেন কেন। আপনি যদি যান ত আমি যাবই।

ভূপেন আর কথা কহিল না। চৌধুরী মহাশয়ও নিঃশব্দে তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন, কী বুঝিলেন কে জানে, তাঁহার প্রশান্ত মুখ বেদনায় ম্লান হইয়া উঠিল। ছলোছলো চোখে নীরবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

কলিকাতাগামী ট্রেনে একেবারেই ভিড় নাই। একটা ইণ্টার ক্লাস কামরায় তাহারা মাত্র দুজন। ভয় করে যাইতে। অথচ হাওড়ার দিক হইতে যে ট্রেনগুলি আসিতেছে তাহাদের দুর্দশা অবর্ণনীয়। প্রতি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে লোক যেন স্তূপীকৃত হইয়া আছে—পথের কুকুর-বিড়ালের চেয়েও খারাপ অবস্থা তাহাদের। কলিকাতার কাছাকাছি আসিতে দেখা গেল লাইনের দুধারেই পায়ে-চলা পথ ধরিয়া অসংখ্য লোক মোটঘাট গরু বাছুর লইয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে। বর্ধমান ও ব্যাণ্ডেল স্টেশনে বহু লোক তাহাদের কামরার সামনে আসিয়া সাবধান করিয়া দিয়া গেল, নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন, করছেন কি। কাল রাত্রেও বোমা পড়েছে। হাওড়া স্টেশন যেখানে ছিল সেখানটায় প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে গিয়েছে একটা, ডালহাউসি স্কোয়ারের চিহ্ন নেই। যাবেন না। মরতে যাচ্ছেন নাকি?

সন্ধ্যা ভীতকণ্ঠে কহিল, কী হবে বলুন ত। ব্যাণ্ডেলে নেমে নৈহাটি হয়ে শিয়ালদায় গিয়ে পড়লে হ'ত না? সত্যিই যদি হাওড়া স্টেশন না থাকে?

ভূপেন তেমন ভরসা পাইল না সত্য কথা, তবু কহিল—কিন্তু তাহলে রেল-কোম্পানীই ত এখানে গাড়ি থামিয়ে দিত, কিংবা অন্য কোনও ব্যবস্থা করত। দেখা যাক না গাড়ি কতদূর চলে।

ব্যাণ্ডেলে খবর পাওয়া গেল, শহরের যে কোন স্থান হইতে হাওড়া অবধি ট্যাক্সি ভাড়া লইতেছে একশত টাকা হইতে দুইশত টাকা পর্যন্ত, কুলিরা মোট পিছু সাত আট টাকা পাইতেছে। ঘোড়ার গাড়ি একশ'র কম নাই।

কিন্তু হাওড়াতে নামিয়া দেখা গেল স্টেশন ঠিকই আছে। ডালহাউসি স্কোয়ারের একটা বাড়িতে বোমা পড়িয়াছে, তাহারও সবটা উড়িয়া যায় নাই। আগের দিন হাতীবাগান বাজারে বোমা পড়িয়া নাকি দুই-একজন লোক মারা গিয়াছে।

যেহেতু তাহারা হাওড়া হইতে শহরে যাইতেছে, তাহারা খুব কম মূল্যেই ট্যাক্সি পাইল। কলিকাতা যেন এই কয় রাত্রিতেই শ্মশান হইয়া গিয়াছে। আর পলায়নের যে দৃশ্য তাহাদের চারিদিকে দেখা গেল, তাহাতে যেমন দুঃখ হয় তেমনি লজ্জাতেও মাথা কাটা যায়।

ভূপেন ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, এত বড় শহরে ক'টা লোকই বা মরেছে, তাতেই এই। মৃত্যু যেন আর কখনও কেউ দেখে নি। সেবার ভূমিকম্পে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বিহারের কত লোক গেল—এক-একটা মহামারীতে কী অসংখ্য লোক মরে। এমনি পালাতে গিয়ে য়্যাক্সিডেণ্টে আর রোগে যা মরছে তার সিকিও বোমায় মরে নি এখনও। তবু কি ভয়—একটা অবোধ অহেতুক ভয়। আর কী ভাবে এই ভয়ের সুযোগ নিচ্ছে ট্যাক্সিওলা, গাড়োয়ান আর কুলীরা, অথচ দেখ সেদিনই কাগজে পড়ছিলুম—লণ্ডনে এক এক রাত্রে কত টন ক'রে বোমা পড়েছে, তবু শহর এখনও তার কাজ-কর্ম নিয়ে অটল আছে। সেদিন একটা সুন্দর কাফিখানায় বোমা পড়ে কত লোক মারা গেল, আবার সেই জঞ্জাল-গুলো একটু সরিয়ে তার ওপর কোনমতে একটা তাঁবু খাড়া করে সেইখানেই কাফিখানা খোলা হয়েছে।

সন্ধ্যাকে তাহাদের বাড়ি পেঁছাইয়া দিয়া আসিয়া দেখিল, তাহাদের বাসারও নিচের তলা হইতে বহু ভাড়াটে সাময়িকভাবে সরিয়া পড়িতেছেন। তবে আগের বারের চেয়ে অনেক কম। অবিনাশবাবু সেবার মেয়ে-ছেলেদের দেশে পাঠাইযা বহু টাকা খরচ করিয়াছিলেন, তারপর ডাক্তারে ও চিকিৎসাতেও ঢের টাকা ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং এবার আর কোথাও পাঠাইবার চেষ্টা করেন নাই, ভয়ে কাঠ হইয়াও কোনমতে টিকিয়া আছেন। উপেনবাবুও যথেষ্ট ভয় পাইয়াছেন—কিন্তু ভয় যতই হোক, টাকাকড়ির অবস্থা আরও শোচনীয় বলিয়া সেকথা আর তুলিলেন না।

এবার আগের বৎসরের মত কলিকাতা খালি হয় নাই সত্য কথা তবু ভূপেনের বুক শুকাইয়া উঠিল। সেবার সব চেয়ে কষ্ট গিয়াছে তাহাদেরই। ছেলেরা সকলে চলিয়া গেল, যে ইস্কুলে মোট ছাত্রসংখ্যা বারোশ', সে ইস্কুলে রোজ হাজিরা পড়িতে লাগিল চল্লিশ-পঞ্চাশটি ছেলের। মাহিনা আদায় হয় না, মাস্টার মহাশয়দের মাহিনায় টান পড়িল। প্রথম মাসে সেক্রেটারী আদেশ দিলেন শতকরা পঞ্চাশ টাকা, পরের মাসে চল্লিশ, তারপর আরও কমিয়া শতকরা কুড়ি টাকায় দাঁড়াইল। অর্থাৎ ভূপেনের মাহিনা ছিল সত্তর, সে পাইতে লাগিল চোদ্দটি টাকা।

যদিও ইস্কুলের বিল্ডিং-ফণ্ডে সাতাত্তর হাজার টাকা জমা ছিল—ঐ পাড়াতে কোথাও জমি বা বাড়ি পাওয়া যায় নাই বলিয়া বাড়ি করাও হয় নাই—সে টাকাটা হইতে স্বচ্ছন্দে এই সব দুঃস্থ শিক্ষককে বাঁচানো যাইত। কিন্তু যেহেতু সে রকম কোন আইন ইতিপূর্বে প্রণয়ন করা হয় নাই, এইজন্য ইহার একটি পয়সাতেও সেক্রেটারী হাত দিতে দিলেন না। এধারে প্রশান্তরা ছিল না, টিউশ্যনির টাকাও বন্ধ। প্রশান্তর বাবা প্রথম মাসে টাকাটা বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, পরের মাসে তিনিও আর পাঠান নাই, ভূপেনও লজ্জায় চাহিতে পারে নাই। হয়ত তিনি পাঠাইলেও তাহাকে ফেরত দিতে হইত। কিন্তু চলে কিসে? বহু মাস্টার মহাশয়কে সে সময় স্ত্রীর সামান্য গহনাপত্র হইতে শুরু করিয়া ঘটিবাটি পর্যন্ত বেচিতে হইয়াছে। ভূপেনকেও উপবাস করিতে হইত, তার চেয়েও বড় কথা—ওধারে কল্যাণীরাও বোধ হয় উপবাস করিত, যদি না উপেনবাবু অফিস হইতে কিছু টাকা পাইতেন। সমস্ত লাজলজ্জার মাথা খাইয়া শেষ পর্যন্ত সেই টাকা হইতেই কল্যাণীদের খরচ চাহিয়া লইতে হইয়াছে, সেজন্য উপেনবাবু অবশ্য কম কথা শোনান নাই, কিন্তু উপায় কি? এই সম্মানটুকু বিসর্জন না দিলে শেষ অবধি হয়ত আরও সম্মান ত্যাগ করিতে হইত—সন্ধ্যার কাছে ধার চাহিতে হইত। মানুষের আদর্শবাদ, তাহার সম্মানবোধ, তাহার নীতিজ্ঞান সমস্তই ততক্ষণ বজায় থাকে যতক্ষণ না স্ত্রী-পুত্র উপবাস করে। সেটা সন্তান হইবার পর, ভূপেন ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে—বুঝিয়াছে মানুষ কী দুঃখে চুরি ডাকাতি করে।

সুতরাং দিনে পেভ্‌মেণ্টের দুধার ধরিয়া পলায়নপর জনতা এবং রাত্রের শ্মশানবৎ নিস্তব্ধ কলিকাতা শহরের দৃশ্য দেখে আর ভূপেনের বুকের রক্ত দুর্ভাবনায় জল হইয়া যায়। আবার যদি তেমন হয়? এবার উপেনবাবুর অফিসেও ধার পাইবার সম্ভাবনা নাই। সকলকে না খাইয়া মরিতে হইবে হয়ত, বিশেষ করিয়া সেই সুদূর পল্লীতে যে প্রাণীগুলি উহারই মুখ চাহিয়া আছে, তাহাদের অবস্থা কল্পনাও যায় না। তাহারা আগেই মরিবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এবারের পালা অল্পেই শেষ হইল; মধ্যবিত্তরা সেবার অহেতুক ভয়ে পলাইতে গিয়া অনেকে ধনেপ্রাণে মরিয়াছিলেন—এবার তাই বোমা খাইয়াও অনেকে রহিয়া গেলেন। ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গেল বটে, তবে সেবারের মত নয়।

ইতিমধ্যে কিন্তু আর একটি দুঃসংবাদ তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। রাখুর পরের ভাইটি টেস্টে ফেল করিয়াছিল, সহসা সে গ্রামের আর একটি ছেলের সঙ্গে কোথায় পলাইয়া গেল। রাখুর এবারই ইন্টারমিডিয়েট দিবার কথা—সংবাদটাতে তাহারও পরীক্ষার ক্ষতি হইতে পারে; তাছাড়া কল্যাণীকে কাছে আনিবার সম্ভাবনাটা যেন কেবলই পিছাইয়া যাইতেছে। রাখু যদি আই. এ.-টাও ভালভাবে পাস করে, তাহা হইলে আবার বি. এ.-পড়াইবার প্রশ্ন উঠিবে। স্বভাবতই মনে হইবে—এত কাণ্ড করিয়া সামান্য দুইটা বৎসরের জন্য সব মাটি হইবে? মেজো শালা আশুর যে বেশী লেখাপড়া হইবে না তাহা সে আগেই বুঝিয়াছিল—তাই

ইচ্ছা ছিল কোনমতে ম্যাট্রিক পাস করিলে মহেশবাবুর প্রতিশ্রুত চাকরিটা আশুকেই পাওয়াইয়া দিবে। তাহাতে খরচের দায় যেমন কতকটা কমিত, প্রয়োজন হইলে রাখুর বিবাহটাও সেই ভরসায় দেওয়া চলিতে পারিত। সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল।

যে চিঠিতে এই খবরটা কল্যাণী দিয়াছিল, সেই চিঠিরই শেষে কয়েকটি লাইন ভুপেন বার-দুই মনোযোগ দিয়া পড়িল। কল্যাণী লিখিয়াছে—

কলকাতায় বোমা পড়বার কথা শুনে ক'দিন যে কীভাবে কেটেছে তা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। চিঠি লিখে দিয়েছিলুম সঙ্গে সঙ্গেই—কিন্তু তা যে কোন-দিন পৌঁছে উত্তর আসবে এমন আশা করি নি। খবর নেবার লোক নেই, কলকাতার দিকেই কেউ যেতে চায় না। ভেবে ভেবে পাগলের মত হ'তে বসেছিলুম। তাও যদি ভাবনাটা ভাগ ক'রে নেওয়ার উপায় থাকত। বাবা ত ঐ নির্বিকার, সব কিছু ভগবানের উপর বরাত দিয়ে বসে আছেন। শেষে তিনদিন পরে মেজঠাকুরঝির চিঠি এসে পৌঁছল তবে বাঁচলুম। চিঠিখানা অবশ্য বোমা পড়বার প্রথম দিনই লেখা, তাতে ওসব খবর কিছুই ছিল না, তবু তুমি ওখানে নেই—সন্ধ্যাদির সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গিয়েছ শুনে আর অতটা ভাবনা রইল না। জানি যে এ খবর পেলে সন্ধ্যাদি তোমাকে একা ফিরতে দেবেন না, তুমিও তাঁকে এ বিপদের মধ্যে টেনে আনতে পারবে না, কাজেই অন্তত তোমাদের জন্যে আর ভয় নাই। সত্যি সন্ধ্যাদির কাছে আমার ঋণ বেড়েই যাচ্ছে। আমি অভাগী, তোমার কোন কাজে লাগলুম না, বরং শক্ত লোহার বেড়ী দিয়ে চিরকালের মত অন্ধকূপে বেঁধে রাখলুম। তোমার উন্নতির আশা রইল না, তোমার উপযুক্ত কাউকে বিয়ে করবে সে আশাও নেই। তোমার সাধনা কত বড়, কত উঁচুতে ওঠার কথা তোমার—এসব যত ভাবি ততই যেন লজ্জায় মাথা মাটির সঙ্গে মিশে যায়। দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাওয়ার কত শখ তোমার তা-ও জানি। শুধু শখই বা কেন, প্রয়োজনও ত বটে। এই বয়সে এত বড় বোঝা ঘাড়ে ক'রে খেটে খেটে তোমার শরীর আর মনের যা অবস্থা হয়েছে তা খানিকটা বুঝতে পারি। তাই সন্ধ্যাদি তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পেরেছেন শুনে শুধু যে নিশ্চিন্ত হলুম তাই নয়, বড় আনন্দও হ'ল। এই ক'টা দিন বিশ্রাম আর মনের শান্তি—এর মূল্য কি কম? খোকাটা বড্ড অবুঝ, বাবা ওকে কেবল আদর করবার সময় বলতেন কিনা "এই তোর বাবা এল বলে। ছুটি হ'লেই আসবে।" সে কেবলই তাই জিজ্ঞাসা করে "মা, বাবা এলো না? মা, বাবা?" যাই হোক—কলকাতায় আর হাঙ্গামা নেই ত? সন্ধ্যাদির শরীর বেশ ভাল আছে ত? তাঁকে আমার কথা ব'লো। ব'লো যে আমি তাঁর কাছ থেকে হাত পেতে চিরকাল নিয়েই গেলাম—কিন্তু তাঁকে শোধ দেবার ক্ষমতা নেই। হয়ত দেবার উপায় আছে এখনও। এক এক সময় মনেও হয়, কিন্তু আমি বড়ই স্বার্থপর, শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছেও করে না।

কী জানি কি লিখলুম আবোল-তাবোল—বড় ভয়, পাছে তুমি রাগ করো। তুমি রাগ ক'রো না, লক্ষ্মীটি।

ভুপেন চিঠিখানা নামাইয়া রাখিয়া আপন মনেই একটু হাসিল।

বেচারী কল্যাণী। ঈর্ষা ও অভিমান, স্ত্রীলোকের যা সহজাত, তাহাকে চাপিয়া রাখিবার কী প্রাণপণ চেষ্টাই করিয়াছে সে। যেটা সত্য তাহাকে বিশ্বাস করিবার চেষ্টাও কম করে নাই। তবু মানুষের মন—মানুষেরই মন, সে তাহার কাজ করিয়া যাইবেই।

প্যাড ও কলমটা টানিয়া লইয়া ভূপেন কল্যাণীকে খুব মিষ্ট একখানা চিঠি লিখিতে বসিল। উৎপলা ইচ্ছা করিয়াই যে অনিষ্টটি করিয়াছে, বৌদির কাছে যে বিষটি প্রেরণ করিয়াছে, তাহার জ্বালা সম্পূর্ণ না হোক, কতকটা দূর করিতে পারিবে, সে বিশ্বাস তাহার আছে।

॥ ৩০ ॥

পাইকারী পলায়নের ধাক্কাটা একটু সামলাইতে না সামলাইতে চালের দর যেভাবে বাড়িতে লাগিল তাহাতে আবার ভূপেনের বুক শুকাইয়া উঠিল। তাহার এই বয়সের মধ্যে দুর্ভিক্ষ সে দেখে নাই—মন্বন্তর কাহাকে বলে সে সম্বন্ধেও কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। আর সত্য-সত্যই যে এত বড় মন্বন্তর আসিতেছে তাহা অনেকেই বুঝিতে পারে নাই। সেজন্য নেতারাও কতকটা দায়ী—সব চেয়ে দায়ী তখনকার তথাকথিত মন্ত্রীমন্ডলী, তাঁহারা শেষ পর্যন্তও সম্ভাবনাটাকে অস্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু চালের দাম বাড়িতে বাড়িতে যখন চব্বিশ-পঁচিশ টাকায় দাঁড়াইল তখন ভূপেন বিচলিত না হইয়া পারিল না। ওধারে কল্যাণী চিঠি লিখিয়াছে যে তাহাদের দেশ হইতে চাল প্রায় অদৃশ্য হইতে বসিয়াছে—এখনও কিছু কিনিয়া রাখিলে হয়ত কিছুদিন উপবাসটা বন্ধ থাকিতে পারে। ছেলেকে কি ভাবে বাঁচাইবে তাও সে জানে না—কারণ অর্থের অভাবে সবাই গরু-বাছুর বেচিতে শুরু করিয়াছে, কিছুদিন পরে দুধও মিলিবে না।

অথচ কীই বা করা যায় ? তাহার মাহিনা ও দুইটা টিউশ্যানি মিলিয়াও পুরা দেড়শো টাকা আয় হয় না। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে এই আয়ে দুটা সংসার চালানো অসম্ভব। উপেনবাবুর মাহিনার সবটাই প্রায় অফিসের দেনাতে চলিয়া যায়, তিনি নিজের হাত-খরচ বাদে কুড়ি-পঁচিশ টাকার বেশী ছেলেকে দিতে পারেন না। এই টাকা হইতে চল্লিশটি টাকা পাঠাইতে হয় কল্যাণীদের। তাহাতেও সংসার চলিবার কথা নয়, কারণ ছেলের খরচ অনেকখানি। তবু নুন-ভাত খাইয়াও তাহারা কোনরকমে চালায়। মায়ের গায়ে গহনা কোনদিনই ছিল না, যা সামান্য দুই-এক কুঁচি সোনা ছিল তাও শান্তির বিবাহে চলিয়া গিয়াছে। তাহার ইস্কুলেও কিছু দেনা হইয়াছিল—সেটা এখনও সম্পূর্ণ শোধ হয় নাই। সুতরাং সত্তর টাকার মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ঋণের টাকা কাটিয়া সেও যা পায় তাহা ভদ্রসমাজে বলিবার মত নহে।

শেষ পর্যন্ত সে উপেনবাবুরই শরণাপন্ন হইল। অফিসের কতকটা ঋণ ত শোধ হইয়াছে—এখন আবার নতুন ঋণ খানিকটা লওয়া যায় না কি ?

উপেনবাবু তখনও মন্বন্তরের চেহারাটা বুঝিতে পারেন নাই—তাহার তখনও

আশা ছিল যে, এতটা দাম থাকিবে না, শীঘ্রই কমিবে। সুতরাং প্রথমে তিনি কথাটা গায়ে মাখেন নাই। পরে অনেক পীড়াপীড়িতে খবর লইয়া আসিয়া বলিলেন যে, অন্তত আরও দুই শত টাকা শোধ দিলে শ'পাঁচেক টাকা পাইতে পারেন।...আরও দুই শত টাকা! কোথায় পাইবে অত টাকা? সম্ভব অসম্ভব বহু জায়গার কথাই সে মনে করিল কিন্তু এতগুলি টাকা এখন ধার দিতে পারে এমন লোক কেহ নাই। অথচ তিনশ' টাকা হাতে পাইলে তবু শ-খানেক টাকা ওখানে পাঠাইয়া এখানেও মণ আষ্টেক চাল কিনিয়া রাখিতে পারে।

কিন্তু এত টাকা কে দিবে? বিশুর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তাহার সহকর্মী মাস্টার মহাশয়দের অবস্থা তো আরও খারাপ। তাহার মাথার উপরে বাবা আছেন—কিছুটা সাহায্য নিশ্চয়ই হয় কিন্তু সে সুযোগ তাহাদের অনেকেরই নাই। দুশ্চিন্তায় সকলেরই মুখ কালি, সকলেই গম্ভীর। সন্ধ্যাও এখানে নাই—সে ইতিমধ্যেই দুমকাতে তাহার নূতন পরিকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ি করিতে শুরু করিয়াছে—সরকার মশাই, দারোয়ান প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া সে নিজে গিয়াছে কনট্রাক্টরদের কাজ তদারক করিতে। থাকিলেও, তাহার কাছে চাহিতে কি জানি কেন আজও মন সরে না।

অবশেষে দু-তিন রাত্রি পর পর বিনিদ্র কাটাইয়া শেষে সে প্রশান্তরই শরণাপন্ন হইল। প্রশান্ত ছেলেটি ভাল—পদন বা সালেকদের মত শিক্ষা সম্বন্ধে সপ্রশ্ন আগ্রহ নাই সত্য কথা—এবং তাহার সিনেমাপ্রীতি, বিলাসপ্রিয়তাও সম্পূর্ণ তাড়াইতে পারা যায় নাই এ-ও ঠিক, তবু ছাত্র হিসাবে অনেকের চেয়েই ভাল। ভূপেনের প্রাণপণ চেষ্টায় সে অনেকটা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সত্যকার লেখাপড়াও শিখিয়াছে কিছু। প্রশান্তর বাবা প্রকাশ্যেই ভূপেনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন বহুবার—আমার অফিসের অনেক গ্র্যাজুয়েট কেরানীর চেয়েও বেশী শিখে ফেলেছে দেখছি শান্ত—এ আপনারই বাহাদুরি মাস্টার মশাই। বাস্তবিক, এত কখন শেখালেন? লিলিটাও যেমন পড়াশুনা করছে, তাতে মনে হয় ওরও স্কলারশিপ পাবার চান্স আছে। নাঃ, আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করলেন—আপনার কাছে আমার ঋণ ভোলবার নয়।

প্রশান্ত ম্যাট্রিক দিয়াছে—স্কলারশিপ পাইয়াই পাস করিবে আশা করা যায়। সুতরাং এ বাড়ির টিউশ্যানি যাওয়ারই কথা ছিল, কিন্তু কর্তা ছাড়েন নাই। বলিয়াছেন—আপনি লিলিকে এতকাল বিনামূল্যে পড়ালেন, এবার থেকে ওর জন্যেই আসতে হবে আপনাকে। তা ছাড়া শান্ত সায়ান্স নিলেও ওর ইংরেজী বাংলা এগুলো আপনি দেখিয়ে দেবেন। তার জন্য আপনাকে একটু বেশী টাকাও নিতে হবে—এখন থেকে বলে রাখছি। ভূপেনও অবস্থা বুঝিয়া প্রতিবাদ করে নাই। অর্থের অভাবে সে যে আগের চেয়ে কত ছোট হইয়া গিয়াছে—এইটাই তার অন্যতম প্রমাণ।

কিন্তু প্রশান্ত পদনের মত ভক্তিমান না হইলেও তাহার সহিত এমন একটা অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাতে তাহাকে বন্ধুর পর্যায়েও ফেলা যায় অনায়াসে। ভয় ও ভক্তির ভাবটা কম বলিয়াই বোধ হয় প্রীতিটা এত বেশী হইয়া

উঠিতে পারিয়াছে। সুতরাং অন্য কাহাকেও বলার চেয়ে প্রশান্তর কাছে কথাটা বলাই সহজ বলিয়া মনে হইল। সে সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিল প্রশান্তর কাছে। প্রশান্ত যদি কথাটা বাবাকে বলিয়া দিন-পনেরোর জন্য এই দু-শ'টি টাকা দিতে পারে, তাহা হইলে এতগুলি প্রাণীর জীবনরক্ষা হয়।

প্রশান্ত সব শুনিয়া কহিল, আপনাদের মাসে ক'মণ চাল লাগে মাস্টারমশাই

একটু হিসাব করিয়া ভূপেন কহিল, অন্তত মণ-দেড়েক।

—তাহ'লে আট মণে কি হবে? আপনি এক কাজ করুন বরং—এ দু-শ' টাকা ফেরত দেবার চেষ্টা করবেন না এখন, কেননা এর জন্য বাবাকে বলতে হবে না, এটা আমিই দিয়ে দেব। তিনি জানতেও পারবেন না। আমার নামে একটা ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট আছে, আমার হাত-খরচার টাকা বাবা একেবারে সেইখানেই পাঠিয়ে দেন। সত্যি, নগদ টাকা হাতে পেলে বোধ হয় সবটাই খরচ করতুম—এতে ক'রে কিন্তু প্রায় হাজার টাকা জমেছে আমার। হ্যাঁ যা বলছিলুম, আপনি এই টাকটা আপনার বাবাকে দিয়ে পাঁচশ' টাকাই বার ক'রে নিন, তারপর সব টাকাটা দিয়ে চাল কিনে ফেলুন। যেমন ভাবে ওটা শোধ হবে, তেমনি ভাবে এটাও হবে'খন পরে।

কথাটা খারাপ লাগিল না ভূপেনের। কল্যাণীদের কিছু বেশী টাকা তাহা হইলে পাঠানো যায়। ছাত্রের কাছে টাকা ধার করা খুবই লজ্জার কথা কিন্তু প্রশান্তর মধ্যে একটি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মন আছে তাহা জানে বলিয়াই সে আদৌ কথাটা পাড়িতে পারিয়াছে। দিতে দেরি হইলে সে সত্যই কিছু মনে করিবে না—তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধিও হইবে না। বরং কাহাকেও এমন কি বাবাকেও জানাইবে না সে। তাহা হইলে তিনি আবার ঐ টাকা হইতে কিছু বাজে খরচ করিয়া ফেলিবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এত টাকার প্রয়োজন হইল না। টাকাটা লইয়া বাড়ি ফিরিয়াই সে কল্যাণীর একখানা চিঠি পাইল। তাহাতে বিচিত্র একটি সংবাদ দিয়াছে সে। লিখিয়াছে—

তোমাকে চমকে দেবার মত একটা খবর আছে। হঠাৎ কাল কোথা থেকে সন্ধ্যাদি এসে হাজির। শুনলাম দুমকার কাছে কোথায় নাকি সে কী ইস্কুল করেছে, সেইখানে এসেছিল। এই পথেই যেতে হয় বলে এখানে নেমেছে। কিন্তু শুধু তাই নয়—তার সঙ্গে চার বস্তা ধান, এক বস্তা কলাই। বললে যে তার নাকি এখানে অনেকটা জমি ছিল, এতদিন প্রজারা কেউ কিছু দেয় নি। এবার এই বাড়ি করতে গিয়ে জোর করে ধান আর ডালের কলাই আদায় করেছে—তাই পথে আমাকে চারটি উপহার দিয়ে গেল। বললে—এ আমার ক্ষেতের জিনিস, এতে ত আর কোন অর্থব্যয় নেই, সুতরাং নিতে সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন? এতে মাস্টার মশাই কিচ্ছু রাগ করবেন না। সে জোর ক'রেই দিয়ে গেল একরকম। আমার যে কী করা উচিত ছিল তা বুঝতে পারছি না। অথচ যার কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই, তাকেই বা মুখের উপর 'না' বলি কি ক'রে? কিন্তু আমার বড্ড লজ্জা করছে—মনে হচ্ছে এ অঞ্চলে চালের যে রকম অবস্থা হয়েছে, সব শুনে সে হয়ত

কিনেই দিয়ে গেল এইভাবে। যাই হোক্, এখন ত আর উপায় নেই, যা করা উচিত তুমি লিখে জানাও পত্রপাঠ।

এবারও সেই সন্ধ্যা। তাহার এই চরম সংকট-মুহূর্তে শেষ পর্যন্ত সেই সন্ধ্যাই নিঃশব্দে তাহাকে সব চেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি দিয়া গেল। আজও সে এতটুকু বদলায় নাই—আজও তেমনি সে অতন্দ্র মনোযোগে তাহারই কল্যাণ চিন্তা করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন পরে স্নেহে, কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে তাহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, সন্ধ্যা তুমি সুখী হও, আমি আশীর্বাদ করছি—আমার কথা তুমি ভুলে যেতে পারো।

ভূপেন একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু সারা বাংলাদেশ জুড়িয়া যমদূতের যে নৃত্য শুরু হইল তাহা ভুলিবার নয়। দলে দলে লোক কলিকাতার দিকে আসিতে লাগিল—পথঘাট মৃতদেহ ও মুমূর্ষুতে বোঝাই হইয়া উঠিল। এক এক সময় তাহার মনে হয় এ দুর্ভিক্ষ স্বেচ্ছাকৃত—যুদ্ধের চাকরিতে খাদ্য আছে ও অর্থ আছে—মনস্তত্ত্বের এই বিশেষ মুহূর্তে সেই কথাটা স্মরণ করাইয়া যথেষ্ট লোক টানা যাইতে পারে। স্বেচ্ছাকৃত যদি না হয়, কর্তৃপক্ষের অক্ষমতার যে চূড়ান্ত নিদর্শন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সব চেয়ে অবাক হইয়া গেল সে, এ দেশের লোকের সহনশীলতা দেখিয়া। লক্ষ লক্ষ লোক ফ্যান চাহিয়া, ডাঁটার ছিবড়া চিবাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে মরিয়া গেল, তবু একটা ধনীর গৃহ লুঠ হইল না—সমস্ত শস্যভাণ্ডার অক্ষত রহিল। খাবারের দোকানে মাত্র একটি কাচের ব্যবধানে রসনা-তৃপ্তিকর অজস্র মিষ্টান্ন সাজানো, ঠিক তাহারই সামনে কত মুমূর্ষু খাদ্যাভাবে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিল, তবু সে কাচের ব্যবধান ভাঙিল না—ধনী ও অবস্থাপন্ন লোক, যাহাদের এক সম্প্রদায়ের উগ্র অর্থ-লোলুপতার ফলেই এতগুলি লোকের অকালমৃত্যু ঘটিল তাহারা ব্যাপারটা টেরও পাইল না। কে বলিবে এ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বরং যেসব লোক এক-সময়ে কালোবাজারে চাল ধরিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন, তাঁহাদের কাছে যৎসামান্য করুণাভিক্ষা করিয়া বহুস্থানে ক্ষুদ ও ডালের (বাজরা মিশ্রিত) খিচুড়ি-ভোগের 'ক্যানটিন' বা খাদ্যশালা খোলা হইল, আর সেই সামান্য অনুগ্রহের জন্যই কৃতজ্ঞতার ঢক্কানিনাদ করিয়া বেড়াইলেন নেতারা।

আরও অবাক হইয়া গেল ভূপেন ছাত্রদের ব্যাপার দেখিয়া। এই সময়ে ছাত্রদের একটা কিছু করণীয় আছে নিশ্চয়ই। তাহারা সংঘবদ্ধ হইলে দেশের এ পাপ, এ কলংক অবশ্যই কিছুটা দূর হয়। চাল একেবারে দেশ হইতে অদৃশ্য হইয়া যায় নাই, তেমন হইলে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা দর দিলে পাওয়া যায় কি করিয়া? সাত-আট টাকায় কিনিয়া যাহারা কুড়ি-পঁচিশ টাকায় বেচিয়াছে, তাহারাই আবার ফাটকার লোভে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশে কিনিয়া পঞ্চাশ-ষাটে দাম চড়াইয়া দিয়াছে। ইহাদের জব্দ করার জন্য সরকারের মুখ চাহিয়া থাকা বৃথা, কারণ এই সরকার বড়লোকেরই বশে। ওধারে বহু সরকারী শস্যের গুদামে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল ধরা আছে—আর দুদিন পরেই পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। এ অনাচারের বিরুদ্ধে

একটা সংঘবদ্ধ অভিযান নিশ্চয়ই চালানো যাইত। আর এ রকম অভিযান অন্য সব দেশে শুরু করিয়াছে ছাত্ররাই—তাহারাই চিরকাল এই সব ব্যাপারে পথ দেখাইয়াছে।

অথচ এখানে সে দেখিয়া অবাক হইল, যে-পথের দুপাশের পেভ্‌মেন্ট কংকালবিশিষ্ট মৃতদেহে ছাইয়া আছে, তাহারই উপর দিয়া দলে দলে কলেজের ছাত্র মুখে বিদেশী স্নো এবং পাউডারের প্রলেপ মাখিয়া সিগারেট হাতে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মনে রেস্তোরাঁ যাইতেছে কিংবা সিনেমার টিকিট কিনিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সমাজের এমন এক চরম দুঃসময়ে তাহাদের যে কিছু কর্তব্য আছে সেকথা বোধ করি একজনেরও মনে আসে নাই।

এই সব দেখে আর ভূপেনের মন হতাশায় ভরিয়া ওঠে। এখানে সে শিক্ষকতা করিতে চায়, এই দেশের ছেলেদের মানুষ করিতে চায়? ছিঃ! এ শুধুই সময় নষ্ট করা। এই সময়টা কেরানীগিরি করিলে সে অন্তত আর্থিক ব্যাপারে ইহার চেয়ে বেশী উন্নতি করিতে পারিত। তাহার মনে পড়ে ডাঃ দাসগুপ্তের কথা। অনেকদিন আগে, ছাত্রাবস্থায় একবার সে সংস্কৃত কলেজে গিয়াছিল বক্তৃতা শুনিতে। বিখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত তখন সেখানকার অধ্যক্ষ। আরও কে কে ছিলেন--অনেক ভাল ভাল কথা শুনিয়াছিল সেদিন—সব মনে নাই। শুধু একটি কথা সেদিন বড় খারাপ লাগিয়াছিল বলিয়াই আজও মনে আছে, ডাঃ দাসগুপ্ত ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি মানুষ? তোমাদের দেহে সব মাছের রক্ত। উপনিষদের ছাত্ররা প্রার্থনা করেছিল, 'সহ বীর্য্যং করবাবহৈ'—'তেজস্বিনা বধীতমস্তু' তোমাদের সে বীর্য কোথায়, সে তেজ কোথায়? বিদ্যা দুর্বলের নয়,—বীর্যবান, তেজস্বীদের জন্য বিদ্যা। প্রাচীনকালে ছাত্রদের বিদ্যানুরাগ কিছুই কি তোমাদের অবশিষ্ট নেই? ছাত্ররা তখন শিক্ষার জন্য কষ্টস্বীকার করত, সহিষ্ণুতার পরিচয় দিত। গুরুগৃহে দাসত্ব ক'রেও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্যা গ্রহণ করত। জ্ঞান বা শিক্ষা তোমাদের মত সর্বপ্রকার ক্লেশ-স্বীকারে পরাঙ্মুখ ছাত্রদের জন্য নয়। তোমাদের ছাত্র কল্পনা করলে শিক্ষকতার এ আচার্যপদে ধিক্কার আসে।"

কথাগুলি সেদিন খুবই খারাপ লাগিয়াছিল—আজ ভাবে, তিনি অন্যায় কিছুই বলেন নাই। এ তিরস্কার তাহাদের প্রাপ্য ছিল।

এক-একবার ভাবে, ইহাদেরই বা দোষ কি? যে অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় এই অধঃপতন সম্ভব হইয়াছে, শিক্ষা-বিতরণের নাম করিয়া সেই অপূর্ব বস্তুটি যাঁহারা পরিবেশন করিতেছেন—দোষ তাঁহাদেরই। আবার মনে হয়—তাই বা কেমন করিয়া হয়! সে শিক্ষার বিরুদ্ধেও ত ইহারা বিদ্রোহ করিতে পারে। দেশ, সমাজ ও জাতি কোথায় নামিয়া আসিয়াছে—তা এই ছাত্রদের একজনও কি উপলব্ধি করে না, চাহিয়া দেখে না?

কিন্তু কৈ, কোথাও সে সচেতনতা চোখে পড়ে না তো! যদিও থাকে সে কল্কি-অবতার ইহাদের মধ্যে, সে প্রচ্ছন্ন আছে, ভূপেন মনে মনে তাহারই আবির্ভাব প্রার্থনা করে।

বাহিরে দেখে যাহারা কয়দিন আগেই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য বিদেশী রাজশক্তির কাছে লাঞ্ছিত হইয়াছিল তাহারাই সেই রাজশক্তির সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধে চাকুরি উইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কেমন সাহেব হইয়া উঠিতেছে। কিছুদিন আগেও বিলাতী জিনিস কিনিতে সংকোচ বোধ করিত, অথচ এখন আর যেন বিলাতী জিনিস না হইলে চলে না। যত কালোবাজারে মুনাফা বাড়াইয়া বিলাতী জিনিস দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, তত এই ক্ষুদে সাহেবদের সেই জিনিসেই আসক্তি বাড়িতেছে। শুধু ইহাদের কেন—যুদ্ধের দৌলতে জনসাধারণও যেন এত দিনের এত কৃচ্ছ্রসাধন, এত ত্যাগস্বীকার সব ভুলিয়া গেল। বিলাতী জিনিস ব্যবহারই আবার একটা আভিজাত্যের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য মাহিনার কেরানীও সাহেবী পোশাক পরিয়া অফিসে যাইতে শুরু করিয়াছে। দেশীয় সামরিক কর্মচারীরা দাঁড়ানোর ভঙ্গি হইতে শুরু করিয়া টুপি পরা ও চলনে পর্যন্ত প্রাণপণে নকল করিবার চেষ্টা করিতেছে টমিদের—ওদের দেশে যাহারা নিম্নস্তরের অশিক্ষিত লোক বলিয়া অবজ্ঞাত; আর অসামরিক কেরানীরা সিগারেট খাওয়ায় ও মাথা নাড়িয়া কথা বলিবার ধরনে সাহেবী আমেজ আনিতে পারিলে নিজেদের ধন্য মনে করিতেছে।

এ সব যত ভাবে ততই ভূপেনের মন দমিয়া যায়, নিজের পথ ও আদর্শবাদ সম্বন্ধে দ্বিধা জাগে মনে।

তাহাদের বাসার অবিনাশবাবু ইতিমধ্যেই নিজের বাড়ি কিনিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের দৌলতে হঠাৎ ভদ্রলোকের কাঁচা পয়সা হইয়াছে। সিভিল সাপ্লাই বিভাগের সঙ্গে তাঁহার কী একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, মিলিটারী ঠিকাদারীতেও ঠোকর মারেন ভদ্রলোক। একটা মোটর কিনিয়াছেন, আর একটা শীঘ্রই কিনিবেন। হঠাৎ কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল, ভূপেন যেন ভাবিয়াও পায় না। অবিনাশবাবু অবশ্য বরাবরই তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাকে যাইবার সময় বার বার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, বাবাজী নেমে পড়ো, নেমে পড়ো এইবেলা, পয়সা বাতাসে উড়ছে। নইলে পস্তাবে—এর পর খেতে পাবে না। দিনকাল যা আসছে, ওসব ইস্কুল-মাস্টারি-ফাস্টারী আর চলবে না। তার চেয়ে এইতেই লেগে পড়ো। মজার কল রে বাবা—ঘুষ আর চুরি, চুরি আর ঘুষ—এইতেই সমস্ত ব্যাপারটা চলছে। সেই ওপরের অফিসার থেকে নিচের দারোয়ানটি পর্যন্ত দু-হাতে লুটছে—আমরাই বা চুপ ক'রে থাকি কেন বলো? এতগুলো লোক যদি নরকে যায়, আমরাও না হয় সে সঙ্গে গেলুম! তোফা থাকা যাবে'খন সবাই মিলে। বুদ্ধি যদি থাকে বাবাজী, লাখ লাখ টাকা কামাবে মাসে। লাখ টাকা আজকাল কিছু নয়—এই বলে দিলুম।

সত্যই যেন এই হাওয়া আসিয়াছে চারিদিকে। চুরি করা, ঘুষ খাওয়া, কালোবাজার করায় যে কোথাও লজ্জা আছে, অপমানের কথা আছে তাহা যেন এ জাতটা ভুলিতেই বসিয়াছে ক্রমশ। তাহাদের বাড়ির অপর ভাড়াটিয়ারাও প্রায় সকলেই সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিল। একটি ছেলে, সে কোন্ ঔষধের কারখানায় কাজ করে, সেদিন সগর্বে গল্প করিতেছিল কে এক মেজর সাহেবকে সামান্য কয়েক

বোতল মদ খাওয়াইয়া ও মাত্র তিন হাজার টাকা নগদ দিয়া সে জল-মিশ্রিত টিঞ্চার আইডিন ও ভেজাল ঔষধ চালাইয়াছে। এই ঔষধগুলিই নাকি একবার বাতিল হইয়াছিল ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া। শুধুমাত্র তাহারই বুদ্ধিমত্তায় এতগুলি টাকা বাহির হইয়া আসিল। সেজন্য মালিক তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ দিয়াছেন। তাহার বুদ্ধিমত্তার অহংকারে বাড়িসুদ্ধ লোক যখন চমৎকৃত হয়, তখন ভূপেন মনে মনে শিহরিয়া ওঠে, না-জানি কতগুলি লোকের মৃত্যুর ইতিহাস ঐ পাঁচ হাজার টাকার নোটে অদৃশ্য কালিতে লেখা রহিল।

এই বাড়িরই আর একটি ছেলে, সে ঔষধ এবং প্রয়োজনীয় বিলাতী পথ্যের কালোবাজারী ব্যবসায় করে, সম্প্রতি অনেক টাকা দিয়া জমি কিনিয়াছে। সেও গল্প করে, কেমন করিয়া তাহারই দরিদ্র দেশবাসী যখন মৃত্যুর আশংকায় ঔষধের জন্য পাগলের মত ছুটাছুটি করে, তখন অনায়াসে দেড় টাকা দামের য়্যাম্পিউল্ আঠারো টাকায় বিক্রী করে তাহারা।

আর একজন কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগে কাজ করে। তাহার কাছে আরও বিচিত্র ইতিহাস—প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুতে ভেজাল বাড়িয়া যাইতেছে, অধিকাংশই ঠিক বিষাক্ত না হইলেও ক্ষয়কারী ও জটিল রোগ-সৃষ্টিকারী উপাদান। তাহারা সবই জানে, সব খবরই রাখে, অথচ ঘুষের জটিল ঘূর্ণাবর্তে তাহাদের সমস্ত বিবেক কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। ঘুষ নাকি আজকাল সকলে প্রকাশ্যেই খায়। সোজা-পথে কোন কাজই হয় না—এক বাতুল ও বালক ছাড়া সে চেষ্টাও কেহ করে না। আর কথাটা যে সত্য, পথেঘাটে অহরহ ভূপেন নিজেই ত তার প্রমাণ পায়।

অথচ ইহাদের সকলেই ভদ্রসন্তান—তথাকথিত শিক্ষা অন্তত কিছু-কিছুও ইহারা পাইয়াছে। শিক্ষার সহিত পায় নাই আত্মসম্মানবোধ, পায় নাই দেশপ্রীতি —এমন কি দূরদৃষ্টিও কিছুমাত্র মিলে নাই। যে ডালে বসিয়া আছে, কালিদাসের মত সেই ডালই যে কাটিতেছে সে বোধ নাই কাহারও। যে পয়সা সে এমন অন্যায়ভাবে লইতেছে সে যে দেশেরই পয়সা, তাহাদেরই পয়সা—একদিন এই ঋণ যে কড়ায়গণ্ডায় সুদসুদ্ধ শোধ করিতে হইবে, সে জ্ঞানও তাহাদের নাই। যে বিষ তাহারা ছড়াইতেছে সে বিষে তাহাদেরও আত্মীয়স্বজন মরিতে পারে, এমন কি বোধ হয় তাহারাও, এ কথাও কেহ ভাবিয়া দেখে না।

এই দেশকে শিক্ষিত করিয়া তোলা? সে বোধ হয় হার্ক্যুলিসেরও অসাধ্য কাজ।

ভূপেন ভাবে মাঝে মাঝে—অত্যন্ত অসহায় যখন লাগে নিজেকে, যখন চরম দুঃসময়ে দেহ-মন দু-ই ভাঙিয়া পড়ে—শেষ পর্যন্ত সিভিল সাপ্লাইতেই চাকরি লইবে নাকি?

আবার মনে পড়ে মোহিতবাবুর মন্ত্র—পাগলের মত আপন মনেই আওড়ায়, আমি হার মানব না! আমি হার মানব না!

॥ ৩১ ॥

সন্ধ্যার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ পুরাদমে চলিয়াছে। শিক্ষাভবন, হোস্টেল বা

আবাসভবন নূতন প্রণালীতে প্ল্যান অনুযায়ী তৈরী করানো হইয়াছে। প্রত্যেকটি ছাত্রীর আলাদা ঘর, এমনি কয়েকটি ছোট ছোট ঘর লইয়া এক-একটি বাড়ি, তাহার সহিত একজন করিয়া শিক্ষয়িত্রী রাখিবার ব্যবস্থা। স্থির হইয়াছে এখন শুধু ছাত্রীই সংগৃহীত হইবে, মেয়েদেরই শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে প্রধানত। খুব ছোট ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, সেটার সমস্ত ভার লইবে সন্ধ্যা নিজে। এই বিদ্যায়তনটির বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যেই কাগজে কাগজে শুরু হইয়া গিয়াছে—তাহা লইয়া দেশে রীতিমত একটা আলোড়নও দেখা দিয়াছে। বাংলার বাহিরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লইয়া এই শিক্ষালয়টি গড়িয়া উঠিয়াছে, এখানে শুধু বুদ্ধিমতী মেয়েদেরই লওয়া হইবে—ক্লাস ওয়ান হইতে ক্লাস এইট পর্যন্ত তাহাদের পড়ানো হইবে। যাহাদের ভর্তি করা হইবে তাহাদের কাছে নামমাত্র খরচ লওয়া হইবে, বাকী সমস্ত ব্যয়ভার কোন একটি ধনীদুহিতা নিজে বহন করিবেন। মোট একশটি ছাত্রীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিন্তু এখন মাত্র পঞ্চাশটি লওয়া হইবে, পরে প্রতি বৎসর দশটি করিয়া একেবারে নিচের ক্লাসে ছাত্রী ভর্তি হইতে থাকিবে। এখানকার সিলেবাস আলাদা, পড়াশুনার পদ্ধতি ভিন্ন—সময়ও একসঙ্গে সবটা নয়, সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় ভাগ করা। ইহার সহিত গৃহস্থালী, রন্ধন ও বাগান-করা সবই শেখানো হইবে। ব্যায়াম আবশ্যিক। এছাড়া হাতের কাজ, গান, ছবি আঁকা—নিজেদের ইচ্ছা বা শক্তিমত। সব চেয়ে ব্যয়বহুল ইহার লাইব্রেরী। আধুনিক ধরনের স্টিল র‍্যাকে রাশি রাশি বই সাজানো হইতেছে, মেয়েরা পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে যাহাতে অপাঠ্য অর্থাৎ গল্পের বই বেশী পড়ার অভ্যাস করে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে। শিক্ষাবিষয়ক বিলাতী ডিগ্রীধারী একটি মহিলাকে পাওয়া গিয়াছে—তিনিই লেডী প্রিন্সিপ্যালরূপে কাজ করিবেন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য থাকিবেন একজন প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

এসব লোক চৌধুরী মহাশয়ই ঠিক করিয়া দিয়াছেন, আর বিজ্ঞাপনাদি প্রচার-ব্যাপারে সহায়তা করিতেছেন পূর্ণেন্দুবাবু নিজে। সন্ধ্যা যাহাতে ভাল বিবাহ করিয়া সংসারীই হয়—সেজন্য প্রথমটা বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন ভদ্রলোক কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন সন্ধ্যা নিজের সংকল্পে অটল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন—বরং এখন যতটা সম্ভব তাহার এই খেয়ালেই সাহায্য করিতেছেন। এমন আশাও দিয়াছেন যে, আরও কিছু টাকা তাঁহার ধনী মক্কেল রোগীদের কাছ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া অসম্ভব হইবে না।

শুধু কিছু করিতে পারে নাই ভূপেন। তাহার মন পড়িয়া থাকে সন্ধ্যার কাজের কাছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিয়া সন্ধ্যা কোন প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলে চিঠিতে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না সে। মন্বন্তর কাটিলেও জিনিসপত্রের দাম কমে নাই, বরং ক্রমশ চাড়তেছে। এ বাজারে যাহাদের আয় সীমাবদ্ধ নয়—বরং রণদেবতার আশীর্বাদে ও বেশী নোট ছাপার কল্যাণে দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে—তাহাদের এ ব্যাপারে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; ফলে চাষী ও ব্যবসাদারদেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, শুধু মারিতেছে তাহাদের মত বাঁধা-বেতনের নিম্নমধ্যবিত্তরা। মাস্টারীর আয় বাড়ে নাই,

কিছু মাগ্‌গীভাতার কথা আলোচনা চলিতেছে মাত্র। অন্য শিক্ষকরা টিউশ্যানির সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু ভূপেনের দুইটা টিউশ্যানি রাখিতেই প্রাণান্ত হয়। যেভাবে পড়াইলে একবেলায় একাধিক টিউশ্যানি করা যায়, সেভাবে পড়ানো তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে মনস্তত্ত্বের এই শোচনীয় মুহূর্তে একটি প্রকাশকের নিকট হইতে অর্থপুস্তক লেখার প্রস্তাবও আসিয়াছিল—পারিশ্রমিকের প্রলোভন ছিল মোটা কিন্তু ভূপেন ঠিক অতটা নিচে নামিতে পারে নাই। তাহার এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা, এতদিনের আদর্শ সবই ইহার বিরুদ্ধে। এই দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় এই কথাটা সে অনায়াসে বলিতে পারে যে—সিনেমা ও অর্থপুস্তক, ছাত্রছাত্রীদের সর্বনাশের জন্য এই দুইটিই সব চেয়ে দায়ী। প্রথমটি জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীকে বিকৃত করিয়া দেয়, দ্বিতীয়টি পড়াশুনোর পথ বন্ধ করিয়া ফাঁকি দিয়া পাশ করিতে শেখায়। অবিনাশবাবুর মতে এই বাজারে যে আদর্শ আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে, তাহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে ধরিতে হইবে—ভূপেনেরও সেই মতিচ্ছন্ন হইয়াছে বলা যায়। তাহার সংসার চলা কঠিন বৈকি।

অবশ্য তাহাকে একটা দিকে তাহার শ্যালকরা কতকটা রক্ষা করিয়াছে। আশু বোম্বেতে গিয়া কোন্ এক যুদ্ধসংক্রান্ত কারখানায় কাজ লইয়াছে। কারিগরের কাজ—তবে বেতনটা মোটা, সে প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়াই দিদির নামে ত্রিশটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর হইতে মাসে মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া পাঠাইতেছে। রাখু যদিচ ভালভাবেই আই. এ. পাস করিয়াছিল—বিনা বেতনেই বি. এ. পড়িতে পারিত, তবু ভাইয়ের অবস্থা দেখিয়া সে-ও চাকরির দিকে ঝুকিয়া পড়িল। মিলিটারী য়্যাকাউন্টস-এ সে নিজেই একটা কাজ যোগাড় করিয়া লইয়াছে, ভাল মাহিনা। রাখু মেসে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল কিন্তু উপেনবাবুর অনুমতি লইয়া ভূপেন তাহাকে কাছেই রাখিয়াছে। রাখু উপেনবাবুকে নিজের খরচবাবদ কুড়িটি টাকা দেয়—বাড়িতেও চল্লিশ টাকা পাঠায়। সুতরাং ভূপেনের আর টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয় না। দুই ভাই যা পায়, আর ইস্কুল হইতে যা পাওয়া যায় তাহাতেই কল্যাণী চালাইয়া লয়।

এখন সমস্যা কল্যাণীকে এখানে লইয়া আসে। রাখুর একটা বিবাহ না দিলে সেটা সম্ভব নয়। অথচ ভূপেনও আর পারে না। দেহেমনে সে অত্যন্ত ক্লান্ত। একটু সেবা, একটু স্নিগ্ধ সান্ত্বনা—এ না হইলে আর এই ভার বহন সম্ভব নয়। কল্যাণীকে তাহার কাছে চাই-ই। উপেনবাবু এবং তাহার মা-ও ব্যস্ত হইতেছেন। এমন করিয়া কতকাল তাঁহারা বধূ ও পৌত্রকে ফেলিয়া রাখিবেন?

ভূপেন একদিন রাখুকে কথাটা বলিয়াই ফেলিল, তোমার জন্যে এইবার মেয়ে দেখছি রাখু, তোমার বিয়ে দেব। কি বলো?

রাখু মিনিট-কতক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমাদের দু ভায়েরই তো টেম্পোরারী চাকরি, এর ওপর আবার একটা রিস্‌ক্ নেওয়া—ভয় করে।

ভূপেন একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই উত্তর দিল, কিন্তু আমি কি অবস্থায় রিস্‌ক্ নিয়েছিলুম বলো দেখি? পুরুষমানুষ, বড় হয়েছ—যেমন ক'রে হোক্ সংসার

প্রতিপালন করবে, এ ভরসা নেই? তা ছাড়া দায় তো তোমাদেরই। তোমার দিদিকে কতকাল ফেলে রাখব ওখানে—আমিও তো মানুষ? অথচ ওকে যদি নিয়ে আসি, একটা বালক আর দুটো অন্ধ, এদের কে দেখবে?

রাখু নিজের স্বার্থপরতার ইঙ্গিতে লজ্জিত হইল। ভূপেনের দিকটা তাহার আগেই ভাবা উচিত ছিল, ঋণ তাহাদের ঢের, সে ঋণ শোধ করা যদি সম্ভব না-ও হয়, অন্তত নিজেদের সমস্ত দায় নিজেদের হাতে লইয়া অনতিবিলম্বে তাহাকে মুক্তি দেওয়া উচিত। সে মাথা হেঁট করিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, আপনি যা বোঝেন করুন জামাইবাবু, আমার আর কি বলার আছে?

উপেনবাবু রাখুকে হাতের কাছে পাইয়া তাহার নম্র স্বভাবে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে একটা মতলবও স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন মনে মনে। উৎপলা আর রাখু বোধ হয় একবয়সীই হইবে কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জয়ন্তীর সহিত রাখুর বিবাহ দেওয়া যায়। কোনমতে উৎপলার একটি পাত্র ঠিক করিতে পারিলে একসঙ্গে দুটিকেই পাত্রস্থ করিতে পারেন। কিন্তু ভূপেনের কাছে একদিন কথাটা পাড়িতে সে রাজী হইল না। বাবাকে বুঝাইয়া দিল যে, কোথাও কিছু নাই—সাময়িক চাকরি ভরসা, সেখানে মেয়ে দেওয়া উচিত হইবে না। তা-ছাড়া ঐ দুটো অন্ধের ভার ছেলেমানুষ কি সামলাইতে পারে? কিন্তু তাহার আপত্তি ছিল অন্য—জয়ন্তী যতই হউক কলিকাতায় মানুষ, শহরের স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা কিছুটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেই। সেই বিজন দেশে, মাঠের মধ্যে ভাঙা কুঁড়েঘর, একটি বৃদ্ধা ও একটি অন্ধ বৃদ্ধের ভার বহন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। কাজে ত লাগিবেই না, বরং অশান্তির সৃষ্টি হইবে। সে মহেশবাবুকে ওখানকারই কোন দরিদ্র অথচ ভদ্রঘরের মেয়ে খুঁজিতে বলিয়া দিল।...

মহেশবাবু উত্তর দিলেন দিন-কতক পরেই। তাঁহারই এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের কন্যা আছে—মেয়েটি অল্পবয়সী হইলেও খুব কাজের, তিনি সে সম্বন্ধে নিজে খবর লইয়াছেন। এই মেয়েটির বড় ভাই কোন্ এক কয়লাখনিতে কাজ করে, মাহিনা ও কমিশন প্রভৃতি লইয়া শ'খানেক টাকা উপার্জন করে, দেশেও সামান্য কিছু জমিজায়গা আছে, পাত্রীর বাবা সে সব দেখেন। ভদ্রলোক ছেলেটিরও বিবাহ দিতে চান। এখন ভূপেনের যদি অমত না থাকে—তিনি চাপিয়া ধরিলে রাখুর সহিত মেয়েটির ও তার পরিবর্তেই ছেলেটির সহিত উৎপলার বিবাহ একসঙ্গেই হইয়া যাইতে পারে। তাহাতে আর কোন পক্ষেই পণ প্রভৃতির কথা উঠিবে না।

বলা বাহুল্য ভূপেন এ প্রস্তাবে যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। উৎপলার সমস্যা খুবই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে—কী করিয়া এই বোনটিকে পার করিবে ভাবিয়াই পায় না। পাত্রপক্ষ এক পয়সা নগদ না লইলেও আজকাল দুই হাজার আড়াই হাজারের কম একটা বিবাহ হয় না। বাজারে টাকার দর কমিলেও তাহাদের কাছে আজও বস্তুটি তেমনি দুষ্প্রাপ্য। ধার পাওয়ার সম্ভাবনা পর্যন্ত বিশেষ কোথাও নাই। সে সেই শনিবারেই রওনা হইয়া গেল এবং মহেশবাবুর সহিত দেখা করিল। মহেশবাবুর ঋণ বোধ করি তাহার জীবনে শোধ হইবার নয়। বাস্তবিক,

এই লোকটি না থাকিলে সে যে কী করিত তাহা বলা কঠিন। ভদ্রলোক সেদিন কিছু অসুস্থ ছিলেন তবু ভূপেনকে লইয়া সেই আত্মীয়ের বাড়ি নিজে গেলেন এবং কথাবার্তা একপ্রকার পাকা করিয়া ফেলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ছেলেটি সেদিন বাড়িতে ছিল। অল্প বয়স, স্বভাবচরিত্র মন্দ নয় বলিয়াই বোধ হইল। ভূপেনও উৎপলার একটা ছবি লইয়া গিয়াছিল, সেটা দেখিয়া মোটামুটি তাঁহারা এক প্রকার পছন্দ করিলেন—কথা রহিল পরের সপ্তাহে পাত্রের পিতা গিয়া কন্যা দেখিয়া আসিবেন। তাঁহার মেয়েটিকেও ভূপেনের পছন্দ হইল—উজ্জ্বল-শ্যামাঙ্গী, শান্ত স্বভাবের মেয়ে, কুরূপ নয়—বরং সুশ্রীই বলা চলে। স্থির হইল কোন পক্ষই নগদ পণ দিবেন না—তত্ত্ব বা গহনা নিজেদের ইচ্ছামত।

কাজটা যে এত সহজে মিটিয়া যাইবে ভূপেন ভাবে নাই। সে মহেশবাবুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। তাহার জীবনে অল্প যে কয়েকটি লোকের সাহচর্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, মহেশবাবু তাঁহাদের অন্যতম। এখানে আসিয়া এই একটি অমূল্য লাভ হইয়াছে তাহার।

অপরাহ্ণের দিকে সে ইস্কুলটা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিল। ললিতবাবু আছেন, পণ্ডিত মহাশয়ও আছেন। খালি অপূর্ববাবু ইস্কুল ছাড়িয়া মিলিটারী কনট্রাক্টরের কাজ করিতেছেন। পদন বি. এ. পাস করিয়াছে, সালেকের খবর উঁহারা কেহ জানেন না।

রবিবার শেষরাত্রের ট্রেনেই ভূপেন ফিরিল। এতদিনে দৈহিক ক্লান্তি দেখা দিয়াছে তাহার, এইবার কোথাও কয়টা দিন একটু বিশ্রাম করিবার জন্য সমস্ত মন আকুল হইয়া উঠিয়াছে। রাখুদের বিবাহ শেষ করিয়া কল্যাণীকে ও খোকাকে লইয়া সে যদি কোথাও একটু চলিয়া যাইতে পারিত, অন্তত পাঁচটা-ছ'টা দিনের জন্যও।

কথাটা মনে করার সঙ্গে সঙ্গেই ম্লান একটু বিদ্রূপ মিশানো হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। তাই বটে! অন্তত হাজার টাকা ধার করিবার জন্য এখন ছুটাছুটি করিতে হইবে তাহাকে—তারপর বিবাহ চুকিয়া গেলে আবার দেখা দিবে সেটা শোধ করিবার সমস্যা।

বিশ্রাম? হায় রে!

॥ ৩২ ॥

কলিকাতায় পেঁছিয়াই ভূপেন একটা জরুরী তার পাইল সন্ধ্যার নিকট হইতে। বিশেষ প্রয়োজন—ভূপেন যেন আগামী বুধবারের মধ্যে অবশ্যই এখানে পেঁছায়। মঙ্গলবার রাত্রে এক্সপ্রেসের সময় রামপুরহাট স্টেশনে তাহার জন্য লোক থাকিবে।

কি বিপদ!

এধারে শনিবার কুটুম্বরা আসিবেন ছেলে ও মেয়ে দেখিতে—পছন্দ হইলে এই মাসেই হয়ত দিনস্থির হইবে। টাকা কোথায় তাহার ঠিক নাই—এত বড় দায়িত্ব মাথার উপর, এমন সময়ে আবার দুই-তিনটা দিন নষ্ট করা! অথচ বিনা প্রয়োজনে সন্ধ্যা অকস্মাৎ এমন তার পাঠায় নাই এটাও সত্য। তাহার আবার

কি হইল কে জানে—কিম্বা হয়ত ওধারের কাজ মিটিয়া গিয়াছে, এখন উদ্বোধন সম্বন্ধে দিন স্থির করিতে এবং আসল কাজ আরম্ভ করার উদ্যোগ আয়োজন শেষ করিতে হইবে। যাই হোক—এ আহ্বান উপেক্ষা করার শক্তি তাহার নাই, সব কাজ ফেলিয়াও যাইতে হইবে। সে সেইদিনই হেড মাস্টার মহাশয়ের কাছে কথাটা পাড়িয়া রাখিল, বুধবার, হয়ত বৃহস্পতিবারও সে আসিতে পারিবে না।

মঙ্গলবার শেষরাত্রে ভূপেন 'মোহিতমোহন বিদ্যাশ্রমে' আসিয়া পেঁছিল। তখনও ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই, তবু তাহারই মধ্যে সে চারিদিকে মোটামুটি তাকাইয়া দেখিল—বিরাট কাণ্ডকারখানা করিয়াছে সন্ধ্যা। বাগান পুকুর গোশালা—কত কি। বাড়িও অনেকগুলি—সব কয়টি খড়ের চালা, কিন্তু পরিষ্কার ঝকঝকে। বড় বড় জানালা, চারিদিকে ফাঁকার মধ্যে, স্বাস্থ্য ও মনের বিস্তার-লাভের উপযোগী করিয়া নির্মিত।

সন্ধ্যার নিজের বাড়িটি একেবারে এক প্রান্তে—নির্জনে শাল মহুয়া ও সেগুন গাছের ছায়ায়। ছোট দুটি ঘর—একটিতে লাইব্রেরী, অপরটিতে শয়নের ব্যবস্থা।

সারারাত্রি জাগরণের ফলে ক্লান্তি যথেষ্ট থাকিলেও আসিবার পথে মুক্ত বাতাসে ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে তাহার মন প্রফুল্ল ছিল—এখানের ব্যবস্থা দেখিয়া আরও খুশী হইয়াছে। সে গাড়ি হইতে নামিয়াই সন্ধ্যাকে দেখিতে পাইয়া রসিকতা করিয়া কহিল কী গো, আশ্রমকর্ত্রী—তোমার আশ্রম-বালিকারা কৈ?

সন্ধ্যাও বোধ কার সারারাত জাগিয়াই তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার মুখ অপরিসীম শুষ্ক, চক্ষুও আরক্ত, তবু সে হাসিয়া ফেলিয়া ভূপেনকে প্রণাম করিতে করিতে বলিল—তারা আচার্যের অবসরের অপেক্ষা করছে। আদেশ পেলেই এসে হাজির হবে।

তাহার পিছু পিছু বারান্দায় উঠিয়া আসিতে আসিতে ভূপেন কহিল, তারপর জরুরী তলব কেন? কী হুকুম বলো।

কৃত্রিম কোপের সহিত সন্ধ্যা বলিল, বাপ্‌রে বাপ্‌, কৈফিয়ৎটা বুঝি রাস্তা থেকেই না নিলে আর চলছে না? আর কৈফিয়ৎই বা কিসের—এ বুঝি আমার একার দায় যে ডেকে পাঠালেই জবাবদিহি করতে হবে? আপনার কর্তব্য বুঝি কিছুই নেই?

অপ্রতিভভাবে ভূপেন জবাব দিল, কর্তব্য ত আছে—কিন্তু তা পালনের ক্ষমতা কৈ সন্ধ্যা? তুমি ত জানোই, তোমার মাস্টার মশাই কত অক্ষম।

সন্ধ্যা তাহাকে জোর করিয়া একটা নূতন আরাম-কেদারায় বসাইয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা, এখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসুন ত, তারপর সব কথা হবে।

তারপর ভূপেন ব্যাপারটা কি বুঝিবার আগেই, সে তার জুতাটা খুলিয়া লইল এবং একটা ভিজা তোয়ালে আনিয়া সযত্নে তাহার মাথা মুখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, এখন একটু বিশ্রাম করুন, আপনার জন্যে একটু চা নিয়ে আসি। যদি ঘুমোতে চান ত চোখটা একটু বুজিয়ে নিতেও পারেন।

সে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল কিন্তু ভূপেনের চোখে ঘুম আসিল না। পুব

দিকটা বেশ ফরসা হইয়া গিয়াছে—তাহার সামনেই দিগন্তজোড়া মাঠের মধ্য হইতে সেই জ্যোতির্ময় মহা আবির্ভাব হইতেছে। রাত্রিটা একটু গরম ছিল—এখন হাওয়াটাও খুব মিষ্ট, সেইখানে বসিয়া পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ভূপেনের সহসা যেন মনে হইল আজ তাহার একটা সুপ্রভাত হইতেছে, জীবন যেন এখনই তাহার নূতন কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে। এমন সময় ঘুমাইয়া নষ্ট করা যায় না—জীবনে এমন মুহূর্ত কদাচিৎ আসে। কলিকাতার সংকীর্ণতা, সেখানকার দৈন্য, জীবন-সংগ্রামের ক্লান্তি আজ সে অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে—সেখানকার কোন গ্লানি, কোন অকিঞ্চিৎকরতাই আজ আর তাহাকে যেন স্পর্শ করা সম্ভব নয়। কথাটা হয়ত অর্থহীন—শুধু এতদিন পরে বাহিরে আসার আনন্দেই, খোলা বাতাসে এমন স্বাস্থ্যকর স্থানে বেড়ানোর আনন্দেই, হয়ত আজ তাহার এ রকমটা মনে হইতেছে—তবু সেই অপূর্ব সূর্যোদয়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার বিগত বিনিদ্র রাত্রির সমস্ত শ্রান্তি, সমস্ত জড়তা নিমেষে মুছিয়া গেল, সে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরেই ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা হাতে সন্ধ্যা আবার দেখা দিয়া কহিল, এখন এই অসময়ে আর কিছু খাবার দিলুম না, শুধু একটু চা খান—কেমন? ঘুম না হবার গ্লানিটা চলে যাবে। তারপর ভাল ক'রে সকাল হোক—মুখ হাত ধুয়ে একেবারে খাবেন।

সন্ধ্যার চোখে-মুখেও কেমন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি, যেন তাহার সহিত অপূর্ব একটা স্নেহ ঝরিয়া পড়িতেছে সে দৃষ্টি হইতে। পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিয়া ভূপেন কহিল—বাঃ সন্ধ্যা—খাসা তোমার এই আশ্রমটি! এখানে থাকলে পরমায়ু আপনিই বাড়ে। আমার আর এখান ছেড়ে যেতেই ইচ্ছে করছে না, সত্যি।

সন্ধ্যার মুখ কয়েক মুহূর্তের জন্য বেদনায় ম্লান হইয়া উঠিল। সেদিকে না চাহিয়াই ভূপেন আরও কয়েক চুমুক চা পান করিয়া কহিল, এই সব জায়গায় যদি বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতুম—তা'হলে আমার আর কিছুতেই লোভ থাকত না সন্ধ্যা, তুমি বিশ্বাস করো।

মাথাটা একটু নিচু করিয়া সন্ধ্যা ধীরে ধীরে জবাব দিল, ইচ্ছে করলেই ত কাটাতে পারেন মাস্টার মশাই, আমি ত তাহ'লে বেঁচে যাই।

নিঃশব্দে বাকী চা-টা পান করিয়া লইয়া ভূপেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে পেয়ালাটা ফিরাইয়া দিয়া কহিল, না, তা আর সম্ভব নয় সন্ধ্যা। এ জীবনেই বোধ হয় আর সম্ভব হবে না! তবু ত তোমার দয়ায় একটা দিনও এমন স্থানে এমন জ্যোতির্ময় প্রভাত দেখতে পেলাম—এই আমার ঢের।

তাহার পরই কথাটা ঘুরাইয়া দিয়া কহিল, কিন্তু এমন স্বাস্থ্যকর জায়গায় তুমি এমন রোগা হয়ে গেলে কেন? খুব খাটতে হচ্ছে ব'লে কি? বড্ড ময়লা হয়ে গিয়েছ।

সন্ধ্যা হেঁট হইয়া চায়ের পেয়ালাটা এক কোণে রাখিয়া দিতে দিতে কী যেন একটা সামলাইয়া লইল। তাহার পর স্বাভাবিক কণ্ঠেই কহিল, এখানকার রোদ্দুরে

একটু কালোই হয় সবাই। ওটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। চলুন এবার আশ্রমটা একটু দেখিয়ে আনি—

—চলো।

সবটা ঘুরিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া আসিতে অনেকক্ষণ সময় লাগিল। সব দিকেই নজর আছে সন্ধ্যার, আয়োজন নিখুঁত হইয়াছে। এসব ভূপেনেরই প্ল্যান—তাহাদের বহুদিনের বহু আলোচনার ফল। তাহার এতদিনের স্বপ্ন, এতদিনের আশা সফল হইতে চলিয়াছে দেখিয়া আনন্দে বার বার ভূপেনের চোখে জল আসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সব চেয়ে বড় ব্যথাটা, তাহারই সফল স্বপ্নের মধ্যে তাহার স্থান না থাকার বেদনা, যেন আরও বেশী করিয়া বাজিল। তবু সে সমস্ত কথা সন্ধ্যার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া লইল, দু-একটি নূতন প্রস্তাবও করিল। আগামী মাসেই উদ্বোধনের আয়োজন হইয়াছে, চৌধুরী মশাই আসিবেন, পূর্ণেন্দুবাবুও। দেশের কোন বড় নেতাকে দিয়া উদ্বোধন করানো হইবে কিম্বা কোন বড় শিক্ষাব্রতীকে দিয়া। ভূপেন একজন বড় শিল্পীর নাম উল্লেখ করিল—তাঁহাকেও আনা যাইতে পারে। আসল লোক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী, তাঁহারা এখনই আসিয়া গিয়াছেন, সন্ধ্যা এখন নিজে তাঁহাদের পাঠ দিতেছে প্রত্যহ। কী ধরনের শিক্ষা সে চায়, কেমন করিয়া ছেলে-মেয়েদের সেই নূতন পদ্ধতিতে শিখাইতে হইবে—সযত্নে ও সবিনয়ে তাঁহাদের সে বুঝাইয়া দিতেছে। দেশের আদর্শ নাগরিক সে গড়িতে চায়। আত্মসম্মানবিশিষ্ট, নিরলস, নির্ভীক, নিয়মানুবর্তী, দেশপ্রেমিক ও সমাজ-সেবক—এমন মানুষ। যে কাজ করিবে কিন্তু বাহবা চাহিবে না। যে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অপরের—দেশের ও দশের সর্বনাশ করিবে না। এমন কি প্রয়োজন হইলে নিজের কোন কোন স্বার্থ ত্যাগ করিতেও পারিবে।

সব ঘুরিয়া দেখিয়া তাহারা আবার যখন বাংলোয় ফিরিল তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। মুখ হাত ধুইয়া জলযোগ শেষ করিয়া ভূপেন আবার প্রশ্ন করিল—কৈ, এত জরুরী তলবটা কি জন্যে তা বললে না ত?

সন্ধ্যা মৃদু হাসিয়া কহিল, সে ও-বেলা ধীরেসুস্থে শুনবেন'খন। আমি আজ আপনার জন্যে নিজের হাতে রান্না করব। এখন সময় হবে না সে-সব কথার। আর আপনি যখন আজ থাকছেনই—কালকের আগে যখন যাওয়াই হবে না, তখন আর তাড়াতাড়ি কি?

—ও, আমি আজ থাকছি বুঝি? ভূপেন হাসিয়া প্রশ্ন করিল, সেটা ঠিক হয়ে গেছে!

—ঠিক হয়েই আছে। এখন আপনি একটু বিশ্রাম করুন। কেমন?

সন্ধ্যা অনেক রকম রান্না করিয়াছিল। সে যে এত ভাল রাঁধিতেও জানে সে পরিচয় এতদিন পায় নাই ভূপেন। গল্প করিয়া করিয়া খাইতে বহু সময় চলিয়া গেল। তাহার খাওয়া যখন শেষ হইল তখন দুটো বাজিয়া গিয়াছে। ভূপেন আহারের পর ঘড়িটা দেখিয়া অনুতপ্ত সুরে কহিল, ইস্, অনেক বেলা হয়ে

গেল। তুমিও এই সঙ্গে খেয়ে নিলে পারতে।

—আমি তো আজ খাবো না।

—খাবে না ? কেন ?

—এ বেলা আমার একটা উপবাস আছে।

সে ভূপেনের ভুক্তাবশিষ্টগুলি সযত্নে একটা পাত্রে গুছাইয়া তুলিতেছিল। ভূপেন দেখিয়া প্রশ্ন করিল—ও কি হচ্ছে ?

—আপনার প্রসাদ ত জোটে না অদৃষ্টে, তাই রাখছি। ওবেলাই খাবো।

সন্ধ্যার এই যত্ন, সেবা—এই বসিয়া বসিয়া নানা ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়ানো—সমস্তটাতেই কী জানি কেন একটা অপূর্ব অনুভূতি বোধ হইতেছিল তাহার। সে কি পুলকের কিংবা বেদনার, তাহা বলা শক্ত—তবে এটা সে বুঝিয়াছিল যে ইহার একটা ভয়ঙ্কর মোহ আছে, তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া শক্ত।

নিজের অনুভূতিতে সে নিজের এবং কিছুটা সন্ধ্যার উপরও যেন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এখন এই প্রসাদের উল্লেখে আবারও সেই অনুভূতিটা তীব্র হইয়া উঠিল। এ অন্যায়, তবু শুনিতে ভাল লাগে—আঘাতটা বেদনাদায়ক, তবু নেশার মত আরও পাইতে ইচ্ছা করে। সে ইচ্ছা করিয়াই আর কোন কথা কহিল না, নীরবে খাটে গিয়া শুইয়া পড়িল।

দিবানিদ্রার পর ভূপেন উঠিয়া আবার বেড়াইতে বাহির হইল। একটা দিন ত মোটে ছুটি, যতটা সম্ভব এই মুক্ত বায়ু, এই অবারিত মাঠের স্পর্শ সে লইতে চায়। এ বেলা সন্ধ্যা আর সঙ্গে গেল না। কহিল, আমার একটু কাজ আছে। আপনি একাই ঘুরে আসুন—মোদ্দা সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসবেন।

তবুও ঘুরিতে ঘুরিতে দেরি হইয়া গেল ভূপেনের—যখন ফিরিল তখন রীতিমত অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। সে বাংলোর সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতেই সন্ধ্যাকে সম্বোধন করিয়া কী একটা কৈফিয়তের কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা ঘর-হইতে-আসিয়া-পড়া ক্ষীণ আলোতেই যে দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল,—বোধ করি মুগ্ধও হইল।

সন্ধ্যা সিঁড়ির সামনেই বধূ-বেশে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চন্দন-চর্চিত ললাট, লাল বেনারসী পরনে, গলায় ফুলের মালা। সেই মুহূর্তে কী অপূর্ব যে তাহাকে দেখাইতেছিল! সেদিকে চাহিলে যেন চোখ ফিরানো যায় না। এই প্রথম ভূপেন অনুভব করিল সন্ধ্যা সুন্দরী, তাহাকে পাইবার, তাহাকে কামনা করিবার এ-ও একটা কারণ ছিল।

কিছুক্ষণ সেদিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিবার পর অতিকষ্টে সে প্রশ্ন করিল, এ কী ব্যাপার সন্ধ্যা ?

শান্ত মৃদু কণ্ঠে সন্ধ্যা কহিল—আজ আমার বিয়ে।

—বিয়ে! সে কি ? কার সঙ্গে ? রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে ভূপেন।

—আমার পক্ষে যে আর কাউকে বিয়ে করা সম্ভব নয় মাস্টার মশাই, তা ত আপনি জানেন।

লজ্জায়, কুণ্ঠায়, সঙ্কোচে তাহার গলা বুজিয়া আসে—চোখের দৃষ্টি বুঝি আর কোনমতে তুলিয়া রাখা যায় না, তবু এই অদ্ভুত অভিসারের পালা সন্ধ্যাকেই শেষ করিতে হয়। কোনমতে গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলে, সেই জন্যেই ত আপনাকে আনাতে হ'ল!

তবু যেন ভূপেন কথাটা বুঝিতে পারে না। কথাটা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি আশাতীত। কল্পনা করিতে, অনুমান করিতেও ভয় হয়। ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল, লাইব্রেরী-ঘরের মেঝেতে পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ, একটি সধবা মহিলা, বোধ হয় এখানকারই কোন শিক্ষয়িত্রী হইবেন, তিনি সব গুছাইয়া রাখিতেছেন, একটি বৃদ্ধ পুরোহিত বসিয়া নির্দেশ দিতেছেন।

—এ-সব কি সন্ধ্যা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়া সিঁড়ির উপরেই তাহার পায়ে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, এইটুকু ভিক্ষা আমায় দিয়ে যান—আমি যে আর পারছি না! কী ক'রে সারা জীবন চলব বলুন ত?

—কিন্তু, কিন্তু আমার যে কোন উপায় নেই সন্ধ্যা! ভূপেন ব্যাকুলভাবে বলিয়া ওঠে—কল্যাণীর প্রতি এত বড় অবিচার আমি করতে পারব না কিছুতেই। সে বেচারীর ত কোন অপরাধ নেই। মিছিমিছি আমায় লোভ দেখিও না—মানুষ বড় দুর্বল, এ যে কত বড় প্রলোভন আমার কাছে, অথচ কত মর্মান্তিক, তা জানো না।

—আমি আজকের এই রাতটি শুধু কল্যাণীদির কাছে ভিক্ষা চেয়ে নিচ্ছি, তার ত সবই রইল—সারা জীবন। যা আমার—যা যুগ-যুগান্তর ধরে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমার,—আমার সমস্ত সত্তা, সমস্ত অস্তিত্ব যে অধিকার-বোধকে সত্য বলে জানে—তা ত আমি সমস্তই তাকে ধরে দিয়েছি। আমার দুর্ভাগ্য আমারই থাকবে—আমি তার ভাগ নিতে আর কাউকে ডাকব না। শুধু আজকের দিনটি দয়া করুন, পায়ে পড়ি আপনার। উঃ—কি নির্মম আপনি হ'তে পারেন! এতটুকু মায়া কি নেই আপনার দেহে?

ভূপেনের সমস্ত চিন্তাশক্তি, সমস্ত ধারণাশক্তি কী যেন প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তে ঘুলাইয়া গিয়াছে। সে শুধু অসহায়ভাবে কহিল, কিন্তু এ পদস্খলন কি তোমার চোখেই আমাকে নামিয়ে দেবে না সন্ধ্যা? যা কর্তব্য-পথ তা থেকে অন্তত তুমি আমাকে টেনে নামাবার চেষ্টা ক'রো না!

—না, তা করি নি, প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে সন্ধ্যা, শুধু আপনার কাছে আমার সারা জীবনের পাথেয়—পাথেয়ও নয়, একটা রক্ষা-কবচ মাত্র চাইছি। আপনি জানেন না, এদেশে অল্পবয়সী কুমারী মেয়ে—তার ওপর যদি একটু সুশ্রী হয় ত তার কত জ্বালা,—কত সন্দেহ, কত কামনার সঙ্গে তাকে অহরহ যুঝতে হয়! এখনই কত কানাকানি, কত সংশয়ের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। এর মধ্যে দিয়ে কি ক'রে কাজ করব বলুন। তাই আজ বিপদে পড়েই আপনাকে ডেকে এনেছি। আমি জানি আপনি কল্যাণীদির, তাঁরই থাকবেন চিরকাল, শত সন্ধ্যার সাধ্য নেই তাঁর কাছ থেকে আপনাকে কেড়ে

আনতে পারে। শুধু আপনি নিজে হাতে আমার কপালে একটু সিঁদুর দিয়ে যান—স্বীকার ক'রে যান যে আমি আপনার স্ত্রী। তারপর আর আপনাকে কোন-দিন ডাকব না, কোনদিন বিরক্ত করব না। নইলে আপনারই কাজ যে পণ্ড হয়! একরাত্রে আপনার এমন কিছু অপরাধ হবে না কল্যাণীদির কাছে।

মূঢ়ের মত, অভিভূতের মত ভূপেন উঠিয়া গিয়া ঘরে দাঁড়াইল। এ যেন কী স্বপ্ন দেখিতেছে সে। এক দুঃসাহসিক স্বপ্ন। সচেতন অবস্থায় যে স্বপ্ন দেখিতে সাহস করে নাই—চাঁদের চেয়েও যা ছিল দুষ্প্রাপ্য, যাহার কল্পনাতেও লজ্জিত হইত একদিন, সমস্ত দুরাশার যা ছিল শেষ কথা।

অভিভূতের মতই সে কাপড়-জামা ছাড়িয়া গরদ পরিয়া একসময় পিঁড়িতে গিয়া বসিল। তাহার প্রতিনিধি-রূপে পুরোহিতই নাকি আভ্যুদয়িক সারিয়াছেন আজ। তিনিই সম্প্রদান করিলেন সন্ধ্যাকে। স্ত্রী-আচার হইল না—কোন বাহুল্য আড়ম্বর নয়। শুধু নারায়ণ ও অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটিই মাত্র হইল। এসব আয়োজন সন্ধ্যা আগেই সারিয়া রাখিয়াছিল—পুরোহিত আসিয়াছেন কলিকাতা হইতে—তাহাদেরই কুল-পুরোহিত। তিনিই এক সময়ে ভূপেনের স্খলিত অবশ হাতের মধ্যে সন্ধ্যার স্বেদাসিক্ত কম্পিত সেই দুর্লভ হাতখানি সঁপিয়া দিলেন ; তারপর কখন সে সেই অর্ধচৈতন্যের মধ্যেই সন্ধ্যার সিঁথিতে সিঁদুর লেপিয়া দিল আর অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটি লজ্জায়, সৌভাগ্যে, আবেশে কেমন করিয়া নিমীলিত হইয়া যাইতেছে বার বার।

সহসা তাহার চমক ভাঙিল অনুষ্ঠানের শেষে পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া উঠিতে তিনি শান্তিজল দিয়া যখন আশীর্বাদ করিতেছেন। এ কী হইল তাহার? তাহার জীবনেই কি যত অঘটন ঘটে। এই বয়সে এক স্ত্রী বর্তমানেও আর এক বিবাহ করিতে হইল, আর দুটি বিবাহই কি এমনি অদ্ভুত—এমনি বিস্ময়ের মধ্য দিয়া ঘটিয়া গেল। দুটি বিবাহ—কোনটাই সাধারণভাবে সহজে হইল না।

দেবতারও কামনার বস্তু, দেব-দুর্লভ এই যে ঐশ্বর্য আবু হোসেনের বাদশাহীর মত এক রাত্রির জন্য তাহার অদৃষ্টে মিলিল—এ কি অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতম পরিহাস নয়। ইহার চেয়ে সারা জীবন না-পাওয়ার বেদনা সহিত, সে-ও ভাল ছিল।

কল্যাণীর অশ্রুভারাক্রান্ত ছলো-ছলো চোখ দুইটিও তাহার মনে পড়িল, সে মনে মনে বলিল, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো কল্যাণী। সন্ধ্যার জন্যে এটুকু করতে আমি বাধ্য।

পুরোহিত বিদায় লইতে মহিলাটি তাহাদের হাত ধরিয়া বাসর-ঘরে অর্থাৎ সন্ধ্যারই শয়নঘরে লইয়া আসিলেন। সামান্য যা আচার-অনুষ্ঠান বাকী ছিল সারিয়া, দুজনের মত জলখাবার সাজাইয়া রাখিয়া তিনিও এক সময়ে চলিয়া গেলেন।

ভূপেন যেন তখনও বুঝিতে পারিতেছে না ব্যাপারটা—বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিল সে। সকলে চলিয়া গেলে সন্ধ্যা যখন দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল

তখন খাপছাড়াভাবে সে শুধু প্রশ্ন করিল—তোমার ঝি চাকর কোথায় ?

—তাদের আগেই সরিয়ে দিয়েছি। ওদের সামনে এ বড় লজ্জার—মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয় সন্ধ্যা। হৃদয়াবেগে তাহার কণ্ঠস্বরও বুজিয়া আসিতেছিল।

ভূপেন অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—খাটটি পরিপাটি করিয়া ফুল দিয়া কে সাজাইয়াছে—আবার বিছানার পাশে টুলে আর এক জোড়া টাটকা মালা। তাহার মনে পড়িল, এটা শুধু তাহাদের বাসর-শয্যা নয়, ফুলশয্যাও বটে।

সন্ধ্যা আর একবার গলায় আঁচল দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তাহাকে প্রণাম করিল—একেবারে তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া। বোধ করি তাহার এতদিনের সমস্ত বেদনা সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের রক্তাপ্লুত ইতিহাস সে দয়িতের চরণে চিরকালের মত নিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত হইল—সেই সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎও। তারপর যখন মাথা তুলিয়া কম্পিত হস্তে একটি মালা লইয়া ভূপেনের গলায় পরাইতে গেল তখন প্রথম ভূপেন চাহিয়া দেখিল সন্ধ্যার দুটি কপোল চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। নিজের পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল পা-দুটিও ভিজা। হঠাৎ যেন মনে হইল মোহিতবাবু তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আশীর্বাদ ঝরিয়া পড়িতেছে, প্রসন্ন হাসিতে মুখটি রঞ্জিত। তাহার কানের মধ্যে বাজিতে লাগিল তাঁহার অন্তিম-শয্যার শেষ বাণী—'পুঁথির সত্য আর জীবনের সত্য এক নয়—চলার পথে সত্য তাঁর নিজের মহিমায় আপনি প্রকট হন।···আমার মত একটা সংস্কারকে সত্য ব'লে আঁকড়ে থেকো না।'

ভূপেন সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিয়া সেই মুহূর্তে নিজের অন্তরের সত্য পরিষ্কার দেখিতে পাইল। আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া লাভ নাই—এই মুহূর্তটির জন্যই তাহার এতদিনের জীবন নিরন্তর হাহাকার করিয়াছে। হউক অবিশ্বাস্য এ সৌভাগ্য, হয়ত বা আর একটু পরেই তাহার স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইবে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে, তবু এ মুহূর্তটিকে সে অবহেলায় নষ্ট হইতে দিবে না। আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, মাথা হেঁট করিয়া ম্লান-মুখে সন্ধ্যা দাঁড়াইয়া আছে। সে-ও মালাগাছি লইয়া নতমুখী, লজ্জিতা, অপরাধিনী সন্ধ্যার গলায় পরাইয়া তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

তারপর কোথা দিয়া কি হইয়া গেল সে সব তথ্য তাহাদের কাহারও মনে নাই। ভূপেনেরও চোখের জল বাধা মানিল না। দীর্ঘদিনের ইতিহাস জমা আছে তাহার বুকেও—দীর্ঘ নৈরাশ্যের ইতিহাস। যেদিন মোহিতবাবু তাহাকে নিষ্ঠুর ও রূঢ় সত্য শুনাইয়া বিদায় দিয়াছিলেন, সেদিনের সে অপরিসীম বেদনা কি আজ মুছিয়া গেল ? এতদিন যেন এক নিরন্ধ্র অন্ধকারে কাটিয়াছে—আবার এই রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে অন্ধকার শুরু হইবে তাহারও দিক দিশা নাই, তবু এই মুহূর্তটুকুই কি তাহাদের জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য নয় ? সারা জীবনব্যাপী দুর্ভোগ ও বিচ্ছেদের মূল্য কি এই একটি রাত্রেই শোধ হইবে না ?

পাগলের মত সন্ধ্যার ললাটে, কণ্ঠে, ওষ্ঠে চুম্বন করিতে করিতে ভূপেন বলিল—সন্ধ্যা, তা'হলে কি সত্যিই তোমাকে পেলাম ?

সন্ধ্যা, তাহার গালের উপর নিজের গাল সজোরে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চুপি চুপি কহিল, পাবে বৈকি। এ যে আমার জন্মজন্মান্তরের তপস্যা। কল্যাণীদির সাধ্য কি আমাকে একেবারে বঞ্চিত করে।...আমি হিন্দুর মেয়ে, জন্মান্তরে বিশ্বাস করি—আর না করতে পারলে পাগল হয়ে যেতুম—গত জন্মে কি মহাপাপ করেছিলুম কল্যাণীদির কাছে, তাই সে এমন ক'রে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারলে, তবু তোমার দেওয়া সিঁদুরই আমার এই জন্মের তপস্যার সাক্ষ্য দেবে—আমার গত জন্মের পাপ ধুইয়ে দেবে।

তাহার পর কেমন একটু অশ্রু-বিকৃত হাসি হাসিয়া কহিল, কথাগুলো নাটকের মত শোনাচ্ছে, না? কিন্তু আজ আর কিছু ব'লো না—বাধাও দিও না—আমাকে বলতে দাও। এতকাল ধরে এসব কথা বুকে জমে ছিল, বুক ফেটে যেত তবু বলতে পারি নি।

ভূপেন কহিল—কিন্তু আমাকে কেন এত ভালবাসলে সন্ধ্যা, আমার কী আছে?

—তা জানি না। সে বিচার ত কোনদিন ক'রে দেখিনি, শুধু জানি তুমি ছাড়া আমার জীবনে আর কোন কিছুর অর্থ নেই। এই যে কাজের ভার নিয়েছি—জানি এ তোমার কাজ, তাই এ সফল করব, এর মধ্যেই সারা জীবন কাটাতে পারব। আমার আর কোন ভয় নেই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভূপেন কহিল, কিন্তু সন্ধ্যা কাজটা ভাল করলে না। আমাদের এ মিলন না হওয়াই বোধ হয় ভাল ছিল। একবার এমন ক'রে পেয়ে কি আর থাকতে পারব? এরপর সইতে পারব কি আবার বিচ্ছেদ? যদি বা আমি পারি—তুমি কি পারবে?

—নিশ্চয়ই পারব, কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া বলে সন্ধ্যা, আমি জানি তুমি যেখানেই যাও আমার সমস্ত সত্তা, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত আত্মা তোমাকে ঘিরে থাকবে। সেখানে যে আমাদের নিত্যমিলন, তা থেকে কে আমাদের বঞ্চিত করতে পারে? সেজন্যে আমি একটুও ভাবি না গো!

তারপর আস্তে আস্তে নিজেকে স্বামীর বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, অনেক রাত হ'ল—তোমাকে খেতে দিই—এখন আর বেশী খেতে পারবে না ব'লে সামান্য একটু জলখাবার রেখেছি।

সে ভূপেনের পায়ের কাছে বসিয়া খাবারের রেকাবিটা হাতে লইয়া তাহাকে একটু একটু করিয়া খাওয়াইয়া দিতে লাগিল।

তাহার খাওয়া শেষ হইলে নিজের মুখেও একটুকরা মিষ্টান্ন ফেলিয়া কহিল, আমি কিন্তু তোমার পাতের ভাত এখন দুটি খাবো—তুমি কিছু ব'লো না।

—ছি ছি সন্ধ্যা—ভূপেন তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, এ কী ছেলে-মানুষি করছ? ওসব যে এতক্ষণে খারাপ হয়ে গেছে। অসুখ করবে খেলে।

—তোমার পায়ে পড়ি গো—তুমি বাধা দিও না, লক্ষ্মীটি। আচ্ছা, খুব দুটিখানি খাবো? এত কটি? আর ত এ সুযোগ জীবনে পাবো না।

ভূপেন আর বাধা দিল না। কিন্তু সামান্য একটু ভাত মুখে তুলিবার পরই

পাত্রটি জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া সেও নিজের হাতে কয়েকটি মিষ্টান্ন সন্ধ্যার মুখে তুলিয়া দিল।...

তারপর আবার তাহার হাত ধরিয়া নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

স্বামীর বাহুবন্ধনের মধ্যে নিজেকে নিবিড়ভাবে মিশাইয়া দিয়া সন্ধ্যা চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, আচ্ছা কোন রকমেই কি আজকের রাতটাকে চিরস্থায়ী করা যায় না? কিছুতেই না?

ভূপেন তাহার বিপুল রুক্ষ কেশপাশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া উত্তর দিল, তা হয় না সন্ধ্যা—আর সেইজন্যই ত এ রাত্রির এত মূল্য! এসো আমরাই একে অমর করে তুলি। এ রাতটি আমাদের অনুভূতিতে অন্তত চিরন্তন হয়ে থাক।

তবু এক সময়ে সেই পরামাশ্চর্য রাত্রিটির অবসান ঘটে। আবার পূর্বাকাশ রক্তিমায় ভরিয়া যায়। প্রভাত দেখা দেয় জীবনের সমস্ত রূঢ় সত্য ও দায়িত্ব লইয়া।

ভূপেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, তা'হলে এইবার আমাকে বিদায় দাও, সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা যেন অকস্মাৎ চমকিয়া ওঠে। এক নিমেষে তাহার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত চলিয়া যায়। কে যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছে তাহাকে—বিদ্যুতের কষার মতই তাহার তীব্রতা। সে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে, তুমি এখনই চলে যাবে? খেয়েও যাবে না?

—না। আমাকে আর লোভ দেখিও না, লক্ষ্মীটি। যখনই যাই না কেন, সমানই ব্যথা বাজবে—তার চেয়ে এখনই বিদায় দাও।

সন্ধ্যা আর কথা কহিল না। কোনমতে শিথিল দেহটাকে টানিয়া তুলিয়া সহজ কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, একটু চা-ও কি খাবো না?

—হ্যাঁ, তা খাবো। কিন্তু তার আগে স্নান করবো।

সন্ধ্যা তাহাকে নিজেই মুখ হাত ধুইবার জল আনিয়া দিল। ইচ্ছা করিয়াই সে কাল দাসী চাকরকে বিদায় দিয়াছে। পুরাণের তপস্বিনীদের মত এই একটি দিন স্বামীর সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে সে—ইহার ভাগ অপর কাহাকেও দিতে রাজী নয়। স্নানের জলও নিজেই তুলিয়া—নিজের হাতে ভূপেনের মাথায় তেল মাখাইয়া—স্নান করিতে পাঠাইল। তাহার পর চা তৈয়ারি করিয়া আনিল অত্যন্ত সহজেই। প্রথম আঘাতের তীব্রতা ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, এখন সে সহজ, শান্ত। এ সময়ের জন্য ত সে প্রস্তুতই ছিল।

একেবারে সিঁড়ির মুখে আসিয়া ভূপেন থমকিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যা আজও বহুক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল তাহাকে। তারপর শুধু একবার প্রশ্ন করিল, আর কি কোন দিন কোন কারণেই তোমার দেখা পাবো না?

—পাবে বৈকি সন্ধ্যা। যখনই ডেকে পাঠাবে আসবো।...আমি জানি যে, অকারণে তুমি আমাকে কখনও ডাকবে না।

সে আর দাঁড়াইল না। দ্রুতপদে সিঁড়ি কয়টা পার হইয়া গাড়িতে গিয়া

উঠিল। তাহার সমস্ত আশা, জীবনের সমস্ত আলো সে আজ চিরদিনের মত পিছনে ফেলিয়া চলিয়াছে, সামনে পড়িয়া আছে শুধু অনন্ত অন্ধকার রাত্রি। তবু দেরি করিলে চলিবে না, ইতস্তত করা সম্ভব নয়। তাহার স্থান সেইখানেই— যেখানে তাহার কর্তব্য আছে, তাহার কল্যাণী আছে।

গাড়িখানা একসময়ে ধুলো উড়াইয়া দূর মাঠের পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।